পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ::

ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্

বর্মণ পাবলিশিং হাউস্
৭২, হ্যারিসন রোড, : : কলিকাতা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

(১৮৮৪)

পরবর্তী অধ্যায়গুলো গ্রন্থাকারে রচনা ক'রে এক অর্থে, উইল-মাফিক কাজই সম্পাদন করা হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনা করবেন ব'লে যিনি আয়োজন করেছিলেন তিনি যে-সে লোক নন। স্বয়ং কার্ল্ মার্ক্স্ মর্গ্যানের গবেষণা-লব্ধ অবদানগুলো তার—আংশিকভাবে বলা যায় আমাদের—নিজস্ব সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে যাচাই করে এই সমস্ত অবদান বা তত্ত্বকথার পুরো রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দার্শনিক মহলে তা ইতিহাসের বাস্তব বা আর্থিক ব্যাখ্যা নামে সুপরিচিত। মার্ক্স্ ইতিহাসের বস্তু-নিষ্ঠ ধারণা আবিষ্কার করেন প্রায় ৪০ বছর পূর্বে। বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার তুলনা করতে গিয়ে মর্গ্যান আমেরিকায় প্রধানত মার্ক্সের অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। জার্মানির পেশাদার ধন-বিজ্ঞানসেবীরা যেভাবে একদিকে বহু বৎসর ধরে "ডাস ক্যাপিটাল" (পুঁজি) নামক গ্রন্থ থেকে চুরি ক'রে নিজস্ব মৌলিক তত্ত্বরূপে অনেক-কিছুই প্রচার ও মূলগ্রন্থখানা সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন দ্বারা ঐখানাকে পিষে মারতে চেষ্টা করেন, ইংলণ্ডে 'প্রাগৈতিহাসিক' বিজ্ঞানের মুখপাত্ররাও মর্গ্যানের "এনসাণ্ট সোসাইটি" (বা প্রাচীন সমাজ) † গ্রন্থখানা সম্পর্কেও সেই রূপেরই ব্যবহার করেছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সময়াভাববশত যে-কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি আমার গ্রন্থখানাকে তার অক্ষম স্থলাভিষিক্ত-রূপেই গ্রহণ করতে হবে। তবে মার্ক্স্ মর্গ্যানের কথা নিয়ে যে সব টীকা-টিপ্পনী করেন আমি সেগুলো অবিকল গ্রথিত করেছি।

বস্তুনিষ্ঠ ধারণা অনুসারে জীবনযাত্রার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রিত করে। এই উৎপাদন পুনরুৎপাদন দুই রকমে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে, জীবনধারণের উপায়সমূহ যথা, আহার্য-বস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ এবং আহার্য ও পরিচ্ছদ উৎপাদনের হাল-হাতিয়ারগুলো যে-ভাবে ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে, খোদ মানুষ-উৎপাদন অর্থাৎ বংশরক্ষাপ্রণালী দ্বারাও ইতিহাস তেমনি

(†) "এনসাণ্ট সোসাইটি" অথবা "রিসার্চেস্ ইন দি লাইন্স অব হিউমান প্রোগ্রেস ফ্রম স্যাভেজারী থ্রু বার্বারিজম টু সিভিলিজেসান"—লুই, এইচ মর্গ্যান প্রণীত, লণ্ডন, ম্যাকমিলান এণ্ড কোং, ১৮৭৭। গ্রন্থখানা আমেরিকায় মুদ্রিত হয়। লণ্ডনে ইহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। গ্রন্থকার কয়েক বৎসর আগে পরলোকগমন করেন। [এঙ্গেলসের টীকা]

নিয়ন্ত্রিত হয়।" কোনো দেশের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক যুগে জনসাধারণ যে সামাজিক অবস্থার ভেতরে বাস করতে বাধ্য হয় তা এই উভয়প্রকার উৎপাদন-প্রণালী অর্থাৎ একপক্ষে শ্রম-শক্তির হালচাল, অপরপক্ষে পারিবারিক-প্রথার প্রগতি-ধারা দ্বারা নিরূপিত হয়। শ্রম-শক্তির বিকাশ যতই নিম্নতর স্তরের আর উৎপাদন যতই সীমাবদ্ধ এবং তার ফলে সমাজের ধন-সম্পত্তি যতই সীমাবদ্ধ থাকে, সামাজিক বিন্যাস ততই যৌনসম্পর্ক-সমূহ দ্বারা অত্যধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয়। যৌন-সম্পর্ক-যুক্ত দল বা শ্রেণীসমূহের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-কাঠামোর ভেতরেই মানবীয় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বেড়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিনিময়, ধন-বৈষম্য, অপরের শ্রম-শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা, এবং এইভাবে শ্রেণী-সজ্ঘাতের ভিত্তিটাও বর্ধিত হয়, নতুন নতুন সামাজিক উপাদানও সৃষ্টি হয়। এইগুলো পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে নতুন অবস্থায় খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। ফলে যে-সমস্ত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য ঘটতে থাকে, তা শেষপর্যন্ত দারুণ বিপ্লবের সৃষ্টি করে। নব বিকাশ-প্রাপ্ত সামাজিক শ্রেণীগুলির সজ্ঘাতে যৌন-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজ ভেঙে পড়ে; তার স্থলে নতুন সমাজ রূপ পরিগ্রহ করে। এর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হয়। যৌন-সম্পর্কযুক্ত শ্রেণীসমূহের পরিবর্তে স্থানীয় বা এলাকাগত দল ও সমিতিসমূহ রাষ্ট্রের অধীনস্থ কেন্দ্রসমূহে পরিণত হয়। এই সমাজে পারিবারিক-প্রথা কেবলমাত্র ধন সম্পত্তির ধরণ-ধারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমাজ-বেষ্টনীর ভেতরেই এমন-সব শ্রেণী-বিরোধিতা ও শ্রেণী-সংগ্রাম অবাধে পুষ্ট হয় যা এখন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত **লিখিত** ইতিহাসের বিষয়-বস্তুতে পরিণত।

আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তি আবিষ্কার এবং ইতিহাসের মূল-ধারাগুলোর পুনর্গঠন আর উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের রক্তসম্পর্ক যুক্ত দল বা শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রীক, রোমান ও জার্মান ইতিহাসের এ-পর্যন্ত সমাধানের অতীত রহস্যগুলোর চাবিকাঠির সন্ধান করে মর্গ্যান অশেষ প্রশংসাভাজন হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ একদিন বা এক রাতের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু নয়, প্রায় চল্লিশ বছর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও তথ্যসমূহ ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে তবে তিনি তাঁর **উপপাদ্য** বস্তু আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থকই হয়েছে। তৎপ্রণীত গ্রন্থখানা বর্তমান যুগের অন্যতম যুগ-প্রবর্তক মহাগ্রন্থেরই মর্যাদা লাভ করেছে।

বর্তমান গ্রন্থে কোন্‌গুলো মর্গ্যানের কথা আর কতটুকুই বা আমি নিজে জুড়ে দিয়েছি পাঠকবর্গ তা অনায়াসেই ধরতে পারবেন। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোয় কেবলমাত্র মর্গ্যানের তথ্যের উপর নির্ভর না করে আমি নিজেও সাধ্যমত অনেক-কিছু জুড়ে দিয়েছি। কেল্ট ও জার্মানদের নিয়ে লিখিত অধ্যায়গুলো মোটামুটি আমার নিজের লেখা। মর্গ্যান এখানে কেবলমাত্র পরোক্ষ নজিরসমূহের উপর নির্ভর করেন। আর জার্মানদের বেলায় কলম চালাবার সময় তাসিতুস (Tacitus) লিখিত বিবরণী ছাড়া তিনি কেবলমাত্র মিঃ ফ্রিম্যান লিখিত গাঁজাখুরি একদেশদর্শী ভ্রান্তধারণাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মর্গ্যানের কেতাবে তাঁর পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন অর্থনৈতিক দিকগুলো সম্বন্ধে মাত্র ততটুকু আলোচনাই স্থান পেয়েছে। আমাদের পক্ষে এই আলোচনা যথেষ্ট নয়; কাজেই আমি নতুন করে আলোচনা চালাই। আর আমার শেষ বক্তব্য এই যে, যে-সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মর্গ্যান খোলাখুলিভাবে কোন মতামত প্রকাশ করেননি, সেই সব বিষয়ে আমি নিজে সিদ্ধান্ত যোজনা করেছি।

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

(১৮৯১)

প্রায় ছ'মাস হ'লো বর্তমান গ্রন্থের পূর্বতন বড় বড় সংস্করণগুলো নিঃশেষ হয়েছে। নতুন সংস্করণ তৈরি করার জন্য প্রকাশক কিছুকাল যাবত অনবরত চাপ দিতে শুরু করেছেন কিন্তু অধিকতর জরুরী কাজের জন্য এপর্যন্ত আমি এদিকে মন দিতে পারিনি। প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর সাত ব'ছর অতীত হয়েছে। এই সময়ের ভেতর আদিম যুগের পারিবারিক-প্রথাসমূহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। কাজেই সংশোধন ও নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশের যথেষ্ট প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। রদ-বদল ও সংশোধনের প্রয়োজন আরও বেশি এই জন্য যে, নতুন সংস্করণটা স্টিরিয়ো টাইপ করা হবে। কাজেই বহু সময় ধরে আর পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

কাজেই, সমস্ত গ্রন্থখানা আগাগোড়া পড়ে, ভ্রম সংশোধন করে অনেক নতুন তথ্য গ্রথিত করেছি। এতে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের দৌড়টা রীতিমত

যাচাই ক'রে দেখা হয়েছে বলেই আশা করি। ভূমিকায় বাথোফোনের আমল থেকে মর্গ্যানের সময় পর্যন্ত মানব পরিবারের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ-ধারার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা স্থান পেয়েছে। এরূপ করার আরও একটা কারণ রয়েছে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না ক'রে হামেশাই মর্গ্যানের আবিষ্কারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন অথচ মর্গ্যানের আবিষ্কারগুলো আদিম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-রাজ্যে যে বিপ্লব আনয়ন করে সে-সম্বন্ধে এঁরা একেবারে নীরবতা অবলম্বন ক'রে প্রকারান্তরে তা পিষে মারবারই চেষ্টা করেন। অন্যত্রও ইংলণ্ডের অনুকরণ চলেছে। এই সমস্ত কুচক্রীদের উত্তরদানের মানসেই ভূমিকায় পরিবারের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চালিয়েছি।

আমার গ্রন্থটি আরও কয়েকটা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথম ইতালিয়ান অনুবাদ গ্রন্থের নাম: L'origine della famiglia, della proprieta privata e dello stato, versione riveduta dall'autore, di Pasquale Martignetti; Benevento, 1885. অতঃপর রুমানিয়ান ভাষায়: Origina familei proprietatei private si a statului, traducere de Joan Nadejde নামক অনুবাদগ্রন্থ ইয়াসির "কণ্টেম্পোরানুল" পত্রিকায় ১৮৮৫ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৮৬ সনের মে মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বের হয়। ডেনিস ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থের নাম: Familiens, Privatatejendommens og Statens Oprindelse, Dansk, af forfatteren gennemgaaet Udgave, besorget af Gerson Trier, Kobenhavn. 1888. বর্তমান জার্মান সংস্করণের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত হেন্‌রী রাভের ফরাসী অনুবাদ গ্রন্থও যন্ত্রস্থ রয়েছে।

মানব পরিবারের ইতিহাস বলে কোন বস্তু থাকতে পারে ১৮৬০ সনের পূর্বে সে-কথা কেউ মুখে আনতেও পারতো না। এ-সম্বন্ধে ইতিহাস-বিজ্ঞান এপর্যন্ত প্রধানত মুসা-লিখিত পঞ্চ-গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করতো। অপর-কোন গ্রন্থের তুলনায় এই সমস্ত গ্রন্থে পিতৃপুরুষ-শাসিত পারিবারিক-প্রথার অধিকতর আনুপূর্বিক বিবরণী স্থান লাভ করেছে। কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করে এই পারিবারিক প্রথাকে সবচেয়ে প্রাচীন প্রথা ব'লে স্বীকার করে তো নেওয়া হয়েছেই উপরন্তু, মাত্র বহু-পত্নিত্ব প্রথা বাদ দিয়ে এই প্রথাকে আধুনিক বুর্জোয়া পরিবারের জুড়িদার বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, যেন (মুসা-সাহিত্য অনুসারে)

পারিবারিক-প্রথার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ঘটেনি মোটেই। বড় জোর এইমাত্র স্বীকার করা হয়েছে যে মান্ধাতার আমলে এক সময় অবাধ-যোনি-সংসর্গের রেওয়াজ ঘটে থাকবে! ইহা সত্য যে, একপতি-পত্নিত্ব-মূলক পরিবার ছাড়া, প্রাচ্যজগতের বহু-পত্নিত্ব আর ভারত ও তিব্বতের বহুস্বামিত্ব—এই দুই প্রথারও অস্তিত্ব জানা ছিল। কিন্তু এই তিন প্রথাকে ঐতিহাসিক মানের ক্রম অনুসারে সাজানো অসম্ভব মনে হয়, কারো সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই, এইরূপ পাশাপাশিভাবেই এইগুলা উদ্ভূত হয়ে থাকবে—এইরূপ ধারণা করা হয়। বর্তমান যুগের কতকগুলো জীবিত অসভ্য জাতের মত প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলো জাতির মধ্যেও বাপের পরিবর্তে মায়ের দিক থেকেই বংশানুক্রম গণনা করা হ'তো; কাজেই জননী-বিধিই ছিল একমাত্র বৈধ। বর্তমানেও পৃথিবীর সর্বত্র বহু জাতের কতকগুলি সীমাবদ্ধ বড় বড় দলের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। সেই সময় এ-সম্বন্ধে আদৌ তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা হয়নি। এই সব তথ্য অবশ্যই জানা ছিল। এই ধরণের নতুন নতুন অনেক তথ্য অনবরত সংগৃহীতও হয়েছে। কিন্তু এইসব তথ্য নিয়ে যে কি করতে হ'বে তা কারুরই জানা ছিল না। এমন-কি, ১৮৬৫ সালে মিঃ ই. বি. টেলর তাঁর **"মানব-জাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা"** (১৮৬৫) নামক গ্রন্থে এই সমস্ত উদাহরণ "অদ্ভুত প্রথা"রূপে, কোন কোন অসভ্যজাতির মধ্যে লোহার হাল-হাতিয়ার দিয়ে জ্বলন্তকাষ্ঠ স্পর্শ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং এই ধরণের আরও নানা ধর্ম-সংক্রান্ত হিজি-বিজির সঙ্গে একত্রে তালিকাভুক্ত করা হয়।

পারিবারিক ইতিহাস নামক সাহিত্যের সৃষ্টি হয় ১৮৬১ সনে [জার্মান পণ্ডিত] বাখোফোনের **"মাদার রাইট"** নামক গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত মতবাদগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন; যথা:—(১) মানব সমাজে, প্রথমত, অবাধ-যোনি-সংসর্গের পুরো আধিপত্য ছিল। বাখোফোন এখানে ভ্রান্তিবশে "হেতেরে" বা "অবাধ-যোনি-সংসর্গ"-প্রথা শব্দটা প্রয়োগ করেন; (২) অবাধ-যোনি-সংসর্গের ফলে পিতৃ-মাতৃ-পরিচয়, বিশেষত, পিতৃত্ব পরিচয় অসাধ্য ছিল। কাজেই সমাজে ছিল জননী-বিধির একচেটিয়া অধিকার এবং মায়ের দিক থেকেই বংশানুক্রম নির্ধারণ করা হতো। আর মান্ধাতার আমলে সমস্ত জাতিরই অবস্থা ছিল এইরূপ; (৩) বাপ ব'লে যে কোন বস্তু আছে, তখনকার দিনের সন্তান-সন্ততির নিকট তা ছিল অজ্ঞাত। কারণ, মাকেই নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভবপর ছিল। বর্তমানে মাতাপিতা বলতে যা বোঝায়,

লোকে তখন একমাত্র মাতৃত্বের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ দেখ্‌তো! সেইজন্য সমাজে মেয়েরা সু-উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। ফলে, বাখোফোনের মতানুসারে, সমাজে রীতিমত নারীর রাজত্ব (gynecocracy) প্রতিষ্ঠিত হয়; (৪) নারীর উপর মাত্র একজন পুরুষের একচেটিয়া অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একপতি-পত্নিত্ব-মূলক বিবাহ প্রাচীন ধর্মীয় বিধি লঙ্ঘন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়। (অর্থাৎ এই ব্যবস্থার ফলে বিবাহিতা নারীর উপর অন্যান্য পুরুষের যে অধিকার ছিল, চিরাচরিত সেই প্রথার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়।) এই আইন ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, অর্থাৎ এই বে-আইনী অধিকার লাভের মূল্যস্বরূপ নারীকে সাময়িকভাবে অবাধ-যোনি-সংসর্গের প্রশ্রয়দানে বাধ্য হ'তে হয়।

প্রাচীন পুঁথি ও কাব্য-সাহিত্য থেকে ভূরিভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করে বাখোফোন তাঁর মতবাদগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। বিস্তর শ্রম স্বীকার করেই তিনি এইসব প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এঁর মতে, 'হেতেরে-প্রথা' থেকে একপতি-পত্নিত্ব-মূলক বিয়ের ও মাতৃ-বিধি থেকে জনক-বিধির ক্রম-বিকাশ, ধর্মীয় ধারণার অগ্রগতির ফলে বিশেষভাবে গ্রীকদের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। এজন্য প্রাচীন ভাবধারার প্রতীক পুরাতন দেবদেবীদের স্থানচ্যুত ক'রে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রতিনিধি নতুন দেবদেবীদের বসানো হয়। পুরাতন দেবদেবীরা ক্রমশ যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করে। বাখোফোনের মতে, মানুষের জীবনযাত্রাপ্রণালীর বাস্তব শর্ত বা ঘটনাবলীর ক্রম-বিকাশের ফলে সমাজে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেনি। এই সব ঘটনা ও শর্ত মানুষের মাথায় যে ধর্মীয় প্রতিচ্ছবির অর্থাৎ ধারণার সৃষ্টি করে সেইগুলোই এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। প্রাচীন গ্রীকসমাজের বীর-যুগে জনক-বিধি ক্রমশ জননী-বিধিকে স্থানচ্যুত করে—বাখোফোন এই নতুন মতবাদ অনুসারে এস্‌খিলুসের ওরেস্টিয়াকে ক্ষীয়মানা জননী-বিধির ও উদীয়মান জনক-বিধির সংঘাতের নাটকীয় প্রতীক ব'লে ব্যাখ্যা করেন। ক্লিটেম্নেস্ট্রা উপপতি এগিস্থুসের জন্য স্বামী আগামেম্‌ননকে হত্যা করে। ট্রোজান যুদ্ধের পর আগামেম্‌নন্‌ যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন তখন এই ঘটনা ঘটে। আগামেম্‌নন্‌ ও ক্লিটেম্‌নেস্ট্রার পুত্র ওরেস্টেস্‌ মাকে খুন ক'রে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। জননী-বিধির অভিভাবক দৈত্য-সঙ্ঘের ফিউরীরা (Furies) এজন্য ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে ওরেস্টেসের দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করে। কারণ, এই দৈত্য-সঙ্ঘের মতে মাতৃহত্যাই সবচেয়ে গুরুতর পাপ। এই মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তেরও অতীত। এ্যাপোলো দেবতা গায়েবী বাণী দ্বারা

ওরেস্টেসকে মাতৃহত্যার অপরাধের জন্য আহ্বান করেন। এ্যাথেনা দেবীকে এ-সম্বন্ধে বিচার করার ভার দেওয়া হয়। এঁরা দুজনে পিতৃশাসনরূপ নববিধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। দু'জনে ওরেস্টেসকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেন। এ্যাথেনা উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করতে লাগলেন। সমস্ত ব্যাপারটা ওরেস্টেস ও ফিউরীদের মধ্যে বিতর্কের আকারে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওরেস্টেস্ বলেন যে, ক্লিটেমেস্ট্রা জোড়া-অপরাধ করে: প্রথমত, সে নিজের স্বামীকে খুন করে, দ্বিতীয়ত, তার (ওরেস্টেসের) বাবাকেও সে হত্যা করে; কাজেই, ওরেস্টেসের তুলনায় ক্লিটেমেস্ট্রার অপরাধ অনেক বেশি। ফিউরীরা সে বেলায় চুপ থেকে তার বেলায় কেন এমন উঠে প'ড়ে লাগে? এর উত্তরও চমকপ্রদ:

সে (ক্লিটেমেস্ট্রা) যাকে খুন করে, সে-পুরুষের সাথে তার **রক্ত-সম্পর্ক নেই**।"

যার সঙ্গে কোন রক্ত-সম্পর্ক নেই তাকে খুন করলে বিশেষ-কিছু আসে যায় না। হত্যাকারিণী যদি স্বামীকেও হত্যা করে থাকে তাও প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য। এ নিয়ে ফিউরীদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। রক্ত-সম্পর্কের মধ্যে খুন-খারাপী ঘটলে হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়াই তাদের একমাত্র কর্তব্য। রক্ত-সম্পর্কের খুনাখুনির মধ্যে মাতৃহত্যাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। জননী-বিধি অনুসারে এই অপরাধ প্রায়শ্চিত্তের অতীত। এ্যাপোলো ওরেস্টেসের পক্ষ সমর্থনের জন্য অগ্রসর হন। এ্যাথেনা তখন এরিয়োপেজাইটদের (**Areopagites**) অর্থাৎ এথেন্সের জুরীদের ভোট দেওয়ার জন্য ডাকেন। ওরেস্টেসের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান সমান দাঁড়ায়। এ্যাথেনা তখন প্রেসিডেন্টরূপে তাঁর নিজের ভোটটা দিয়ে ওরেস্টসকে মুক্তি দেন। পিতৃ-বিধি জননী-বিধির উপর জয়লাভ করে। "পরবর্তী পুরুষদের দেবদেবীরা" ফিউরীদের উপর জয়লাভ করে। ফিউরীরা তখন মনের দুঃখে নববিধানের আমলে নতুন কাজের দায়িত্ব নিয়ে কোনরূপে দিন গুজরাবার ব্যবস্থা করে।

ওরেস্টি য়্যার এই নতুন কিন্তু অভ্রান্ত ব্যাখ্যাটা সমগ্র গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অংশরূপে গণ্য। কিন্তু এতে আরও প্রমাণ হয় যে, বাখোফোনও ফিউরী-সঙ্ঘ, এ্যাপোলো ও এ্যাথেনায় অন্ততপক্ষে সে-যুগের এস্খিলুসের সমান বিশ্বাসী। কারণ, মূলত তিনিও বিশ্বাস করেন, গ্রীকদের বীরযুগে এইসব দেবতারা অলৌকিক কার্য-কলাপের ভেতর দিয়ে জননী-বিধি স্থলে জনক-বিধি কায়েম করে। এই জাতীয়

ধারণা ধর্মকে বিশ্ব-ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা ব'লে মনে করে; কাজেই ইহা শেষপর্যন্ত যে নিছক মরমীবাদে (mysticism) পরিণত হ'তে বাধ্য, তা সহজেই বোঝা যায়। সেইজন্য বাখোফোনের নিরেট বিরাট গ্রন্থখানা ঘেঁটে আর কোন লাভ নেই। ঘাঁটাঘাঁটি করলে মিছামিছি গলদ্‌ঘর্ম হওয়াই সার হয়। কিন্তু তাই ব'লে বাখোফোন যে অগ্রদূত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দূর অতীতে অবাধ-যোনি-সংসর্গ সম্পর্কে মানুষের যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, তার স্থলে তিনিই সর্বপ্রথম নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্বারা তা বাস্তব সত্যরূপে প্রমাণ করেন; যথা:—গ্রীক ও এসিয়াবাসীদের মধ্যে একপতি পত্নিত্বমূলক বিয়ে-সাদীর পূর্বে এমন অবস্থা ছিল, যখন একজন পুরুষ যেমন বহু নারীর সহিত যৌন-সঙ্গম উপভোগ করতে সক্ষম ছিল, নারীও তেমনি একাধিক পুরুষের সাহচর্য লাভ করে তৃপ্ত হতো; এতে প্রচলিত নীতিবোধে আঘাত লাগ্‌তো না মোটেই। প্রাচীন সাহিত্যে এখনও এর ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রথা হঠাৎ একদিনেই লোপ পেয়ে যায় নি। এর জের চলেছিল বহুদিন ধরে। একপতি-পত্নিত্ব অধিকারের মূল্যস্বরূপ নারীকে অল্পদিনের জন্য অবাধ-যোনি-সংসর্গের ঝামেলা পর্যন্ত সহ্য করতে হয়। অবাধ-যোনি-সংসর্গের দরুণ বংশানুক্রম কেবলমাত্র মায়ের দিক থেকে অর্থাৎ এক মা থেকে আর এক মা—এইভাবেই গণ্য করা হয়। এ প্রথা সুনিশ্চিত, অন্ততপক্ষে, স্বীকৃত-পিতৃত্ব সত্ত্বেও একপতি-পত্নিত্ব-মূলক বিয়ের আমলেও বহুদিন ধরে জননি-বিধিরই জয়-জয়কার ছিল। বাপ-মা সম্পর্কে জননীকে সন্তান-সন্ততিরা নির্ভুলরূপে চিনতে পারত। কাজেই মায়ের স্থান ছিল সকলের উপরে। মাতৃত্বের দরুণ সমস্ত নারীই সমাজে যে উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন বর্তমান যুগের মেয়েরা তা ধারণাও করতে পারেন না। মরমীবাদের মোহগ্রস্ত বাখোফোনের পক্ষে এই সমস্ত সত্য খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তা সত্ত্বেও তিনি এইগুলো প্রমাণ করেন। ১৮৬১ সনে তিনি রীতিমত বিপ্লবেরই সৃষ্টি করেন।

বাখোফোনের বিরাট গ্রন্থ লেখা হয় জার্মান ভাষায়। যে সময় বইখানা লেখা হয়, সেই সময় পৃথিবীর অন্যান্য জাতের তুলনায় জার্মানদের আধুনিক পরিবারের প্রাগৈতিহাস সম্বন্ধে খেয়াল ছিল না মোটেই। কাজেই বাখোফোন অখ্যাত অবস্থাতেই কাল কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পরবর্তী গবেষকের আবির্ভাব হয় ১৮৬৫ সনে। বাখোফোনের নাম পর্যন্ত এই নতুন গবেষকের শ্রুতিগোচর হয়নি।

এই নতুন গবেষকের নাম জে. এফ. ম্যাক্‌লেনান। সকল দিক দিয়েই ইনি বাখোফোনের বিপরীত-ধর্মী। প্রতিভাশালী মরমীবাদীর পরিবর্তে ইনি ছিলেন শুষ্ক-কাষ্ঠ আইনজীবী। কল্পনা-প্রবাহের আতিশয্যের পরিবর্তে দেখা যায় যেন ব্যারিস্টার আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য অনবরত আপাত-যুক্তি-যুক্ত প্রমাণ ও তথ্য ঝেড়ে চলেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু অসভ্য, বর্বর, এমন-কি, সভ্য জাতের মধ্যে ম্যাক্‌লেনান্ এমন এক বিবাহ-প্রথার সন্ধান পান, যে বিয়েতে বর একা বা তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কন্যার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে যেন তাকে জোর দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এই প্রথা নিশ্চয়ই এমন এক প্রথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যে-প্রথা অনুসারে এক উপজাতীয় পুরুষগণ অন্যান্য উপজাতির কাছ থেকে জোর করে মেয়ে ছিনিয়ে এনে বিয়ে-সাদী করতে অভ্যস্ত ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, এই "হাররাণ করে বিয়ে করার" মূলীভূত কারণ কি? পুরুষরা যতদিন আপন উপজাতির মধ্যে প্রয়োজন মত নারী পেয়েছে, ততদিন নিশ্চয়ই এই সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু সচরাচরই আমাদের চোখে পড়ে যে, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর লোকজনের মধ্যে এমন কতকগুলো দলের (groups), (১৮৬৫ সনে এই সমস্ত দল বা শ্রেণীকে উপজাতিরূপেই বিবেচনা করা হয়েছে) অস্তিত্ব আছে যার চৌহদ্দীর মধ্যে বিয়ে-সাদী নিষিদ্ধ করা হয়। কাজেই পুরুষের স্ত্রী আর নারীদের স্বামী ঢুঁড়ে বের করতে হয় দলের বাইরে। কতকগুলি উপজাতির মধ্যে আবার এমনও দেখা যায় যে, এক-একটা দলের পুরুষদের নিজ দল থেকেই স্ত্রী বাছাই করে নিতে হয়। ম্যাকলেনান প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপজাতিগুলোকে "গোত্রান্তর-বিবাহী" (exogamous) এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জাতিগুলিকে "সগোত্র-বিবাহী" (endogamous) আখ্যা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তাড়াতাড়ি "গোত্রান্তর-বিবাহী" ও "সগোত্রবিবাহী"-ওয়ালা উপজাতিগুলোর মধ্যে কঠোর পরস্পর-বিরোধিতার ভাবও আবিষ্কার করেন। গোত্রান্তরবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর নিজের গবেষণাই তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, অধিকাংশ বা সমস্ত ক্ষেত্রে না হ'লেও অনেক স্থলেই এই বিরোধিতা তাঁর কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও তিনি তার উপরেই তাঁর মতবাদটা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। এই থিয়োরী বা মতবাদ অনুসারে "গোত্রান্তর-বিবাহী" উপজাতিগুলো একমাত্র অপর-কোন উপজাতি থেকেই স্ত্রী গ্রহণে সক্ষম। অ-সভ্য অবস্থায় এক উপজাতির সাথে অপর উপজাতির চিরন্তন সংগ্রাম চল্‌ছে। কাজেই, স্ত্রী-সংগ্রহ করতে হ'লে শুধু বলপ্রয়োগ ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না বলে তাঁর বিশ্বাস।

ম্যাক্লেনান্ অতঃপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন: গোত্রান্তরবিবাহ-প্রথা এল কোথা থেকে? গোত্র-সম্পর্ক বা নিষিদ্ধ-যোনি-সংসর্গের (incest) ধারণার সৃষ্টি হয় অনেক পরে; কাজেই, এ-দুটোর সাথে গোত্রান্তর বিবাহের কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারে না। কিন্তু অ-সভ্যদের মধ্যে আর একটা প্রথা প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা টিপে তাকে মেরে ফেলা হয়। ফলে প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ঘটে, কাজেই কয়েকজন পুরুষ মিলে একজন পত্নী গ্রহণ করে—তাই-ই বহুস্বামিত্ব। এতে মাকে চিনবার কোন অসুবিধা না ঘট্‌লেও বাপ যে কে তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠে। কাজেই, মায়ের দিক থেকে বংশ নিরূপণ রেওয়াজে পরিণত হয়। পুরুষ অর্থাৎ বাপের দিক থেকে বংশানুক্রম নিরূপণ পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত হয়: এককথায়, জননী-বিধির জয়-জয়কার দেখা যায়। বহুস্বামিত্ব সমাজে নারীর ঘাটতি কিছুটা পরিমাণে দূর করলেও অসুবিধা ষোল আনা দূর করতে পারে নাই। কাজেই অন্য উপজাতি থেকে মেয়ে চুরি, নারী-হরণ ইত্যাদি দস্তুরে পরিণত হয়।

ম্যাক্লেনান্ "স্টাডিজ ইন এন্সাণ্ট হিস্টরী"তে (প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা) আদিম যুগের বিবাহ-প্রথা শীর্ষক প্যারায় লিখেন—

"সমাজে পুরুষ ও নারীর সামঞ্জস্যের অভাববশত গোত্রান্তরবিবাহ ও বহু-স্বামিত্ব দুই-ই ঘটেছে। কাজেই, **গোত্রান্তর-বিবাহী জাতিগুলোর মধ্যে যে প্রথমে বহু-স্বামিত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল** তা স্বীকার করতেই হ'বে ·······
এইজন্য, গোত্রান্তর-বিবাহী উপজাতিগুলির মধ্যে প্রথমত একমাত্র মায়ের দিক থেকে রক্ত-সম্পর্ক নির্ধারণই যে দস্তুর ছিল তাও নির্ভুলরূপে মেনে নিতে হয়।"

গোত্রান্তরবিবাহ-প্রথার গুরুত্ব আর এর যে ভূরিভূরি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ম্যাক্লেনান্ বড় রকমের কাজই করেন। তবুও তাঁকে এই প্রথার **আবিষ্কারক** বলা চলেনা মোটেই। আর এই প্রথাটা তিনি আরও কম বুঝতে পেরেছেন। বহু লেখক ও সমালোচকের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত-টীকা-টীপ্পনী ইত্যাদির নোট চয়ন ক'রে ম্যাক্লেনান্ তাঁর গবেষণা চালান। অপেক্ষাকৃত পূর্বতন যুগের এই সমস্ত তথ্য ছাড়া, ল্যাথাম ১৮৫৯ সনে তাঁর (**Descriptive Ethnology**) বিবৃতিমূলক ইতিহাস বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে মাগার নামধেয় ইণ্ডিয়ানদের ভেতর প্রচলিত এই প্রথার নির্ভুল ও আনুপূর্বিক বিবরণী প্রদান ক'রে বলেন যে, এক সময় পৃথিবীর সর্বত্র এই

প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। ম্যাক্‌লেনান্‌ নিজেও ল্যাথামের এই উক্তি উদ্ধৃত করেন। ১৮৪১ সনে মর্গ্যান তাঁর ইরোকোয়া সম্পর্কিত পত্রাবলীতে (আমেরিকান রিভিউ) এবং ১৮৫১ সনে "ইরোকোয়া জাতি সঙ্ঘ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই উপ-জাতির মধ্যে কয়েকটি "গোত্রান্তর-বিবাহী" দলের অস্তিত্ব ইতিপূর্বেই প্রমাণ করেন। পক্ষান্তরে ম্যাক্‌লেনান্‌ তাঁর আইনজীবিসুলভ মস্তিষ্ক নিয়ে আলোচনা চালাতে গিয়ে যে ধোঁয়ার রাজ্যেরই সৃষ্টি করেন তা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারবো। বাখোফোন তাঁর মরমীবাদ-জনিত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে জননী-বিধি সম্পর্কে আলোচনায় যেটুকু কৃতিত্ব দেখান ম্যাক্‌লেনানের ভাগ্যে তাও জুটে উঠেনি। মায়ের দিক থেকে বংশানুক্রম নির্ধারণ যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর প্রথা, ম্যাক্‌লেনান তা প্রচার ক'রে অবশ্যই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে বাখোফোনই যে এ-বিষয়ে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক তা ম্যাক্‌লেনান পরে সুস্পষ্ট-ভাবেই স্বীকার করেন। দুঃখের বিষয়, ম্যাক্‌লেনান্‌ এখানেও পরিষ্কারভাবে তাঁর মতবাদটা দাঁড় করাতে পারেননি। "কেবলমাত্র নারীর দিক থেকে আত্মীয়তার" বাণী তিনি হামেশাই প্রচার করেন। মান্ধাতার আমলে এই উক্তি সত্য হ'লেও সামাজিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তরগুলোতেও তিনি এই বাক্য অনবরত প্রয়োগ করেন। পরবর্তী স্তরগুলোতে বংশানুক্রম ও উত্তরাধিকার জননী-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লেও পুরুষের দিক থেকে আত্মীয়তা রীতিমত সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়। এখানেই গ্রন্থকীট আইনজীবিসুলভ মনের প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলে। আইনজীবীদের দস্তুরই এই যে, একটা কাটখোট্টা ধরাবাঁধা আইনের শব্দ বেছে নিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার ভেতরে যখন এই শব্দের প্রয়োগ আর চলতে পারেনা তখনও গায়ের জোরে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই ওটাকে চালাতে চেষ্টা করে থাকেন।

ম্যাক্‌লেনানের থিয়োরী বা মতবাদটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হ'লেও তাঁর নিজের কাছেও তা অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। "পুরুষের দিক থেকে আত্মীয়তা নিরূপণ" অর্থাৎ **পুরুষের** দিক থেকে বংশানুক্রম নির্ধারণে অভ্যস্ত জাতগুলির মধ্যেও বন্দী ক'রে বিয়ে করার প্রথা সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়" (পৃঃ ১৪০)। তাছাড়া, "মজার বিষয় এই যে, যেখানে গোত্রান্তর-বিবাহ ও প্রাচীনতম কুটুম্বজ্ঞান ও আত্মীয়তার **রীতি** ঠিক পাশাপাশি অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুহত্যার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না।" অন্ততপক্ষে ও দু'টো বিষয় ম্যাক্‌লেনানের কাছে কিম্ভূত-

কিমাকার বোধ হয়েছে। দু'টো বিষয়ই তাঁর ব্যাখ্যা-প্রণালীর এমন বিরোধিতা করে যে, নতুন এবং আরও বেশি জটিল অনুমিতির (Hypothesis) আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রকৃত অবস্থা যেমনি হোক-না-কেন, ম্যাক্‌লেনানের থিয়োরী কিন্তু ইংরেজদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। ইংলণ্ডে তাঁর সমর্থকরাও ছিল দলে ভারি। পারিবারিক ইতিহাসের আবিষ্কারক হিসাবেও তিনি অফুরন্ত যশের অধিকারী হন। ইংরেজরা তাঁকে এ-হিসাবে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ বলেও মেনে নেয়। কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে সামান্য-একটু এদিক-ওদিক দেখা গেলেও তৎ-প্রচারিত "গোত্রান্তর-বিবাহী" ও "সগোত্রবিবাহী" জাতিদের বিরোধিতা সর্ববাদী-সম্মত সত্যের ভিত্তিমূলরূপেই স্বীকৃত হয়। ঘোড়ার চোখের ঠুলির মত এই মতবাদের আওতায় স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান—গবেষণা পরিচালনের কোন উপায়ই ছিল না। কাজেই, এদিক দিয়ে কোনরূপ প্রগতি বা অগ্রগতির পথও রুদ্ধ হ'য়ে যায়। ইংলণ্ডে ম্যাক্‌লেনানের অতিরঞ্জিত প্রশংসা আর অন্যত্র ইংলণ্ডের অনুকরণ যেরূপ বাতিক বা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে একমাত্র বক্তব্য এই যে, এই পণ্ডিত গবেষণা চালিয়ে যেটুকু উপকার করেছেন, "গোত্রান্তর-বিবাহী" ও "সগোত্র-বিবাহী" জাতিদের বিরোধিতার ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেন।

ইতিপূর্বেই বাস্তব ঘটনা ও তথ্যের এত বেশি ভিড় জমে যে তাঁর ঝাড়ামোছা কাঠামোটার ভিতরে এইগুলোর খাপ-খাওয়ানো অসম্ভব বিবেচিত হয়। বহু-পত্নিত্ব, বহু-স্বামিত্ব, ও একপতি-পত্নিত্ব—ম্যাক্‌লেনান কেবলমাত্র এই তিন রকমের বিয়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে যতই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'তে থাকে, ততই ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে যে, অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে এমন-সব বিবাহ-প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে কতকগুলো লোককে এক সঙ্গে যৌথভাবে কতকগুলো নারীর স্বামীরূপে দেখা যায়। লুবক (সভ্যতার উৎপত্তি, ১৮৭০) এই দলগত বিয়েকে ("যৌথ বিবাহ") ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকার করেন।

ম্যাক্‌লেনানের তত্ত্ব-প্রচারের অব্যবহিত পরেই ১৮৭১ সনে মর্গ্যান তাঁর নতুন প্রমাণ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন, যা নানদিক দিয়ে চূড়ান্তও বটে। ইরোকোয়াদের (সমরক্তজ) অদ্ভুত সগোত্র-প্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত আদিম জাতিদের বেলাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কাজেই, একটা গোটা মহাদেশেই

এই প্রথা প্রচলিত। তবে এই সমস্ত জাতি বাস্তবিক পক্ষে যে-সমস্ত বিবাহ-প্রথায় অভ্যস্ত সেই সমস্ত প্রথা থেকে উদ্ভূত আত্মীয়তার ক্রমিক পর্যায়ের সঙ্গে এই (সমরক্তজ)-সগোত্র-প্রথার ঘোরতর বিরোধিতাই দেখা যায়। মর্গ্যান সমস্ত আমেরিকা মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সগোত্র-প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। মর্গ্যান জ্ঞাতিত্ব-প্রথা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কতকগুলি তালিকা ও প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। অতঃপর পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে রক্ত-সম্পর্ক নিরূপক প্রথাসমূহ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ এবং এতদ্ সম্পর্কে তাঁর তালিকা ও প্রশ্নাবলী দেশ-বিদেশে প্রেরণ সম্পর্কে তিনি ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করেন। উত্তরগুলো থেকে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবিষ্কার করেন: (১) আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সগোত্র সম্পর্ক-প্রথা এসিয়ার বহু জাতির মধ্যে বিদ্যমান; কিছু পরিবর্তিত আকারে এই প্রথা আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রচলিত আছে; (২) এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা একপ্রকার দলগত বিয়ের মধ্যেই খুঁড়ে বের করতে হ'বে। হাওয়াই ও অস্ট্রেলিয়ার নানা দ্বীপে দল-গত বিয়ের এখনও অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এই ধরণের বিয়ে ক্রমেই লোপ পাচ্ছে; এবং (৩) ঐ সমস্ত দ্বীপে এই ধরণের বিবাহ-প্রথার পাশাপাশি এমন এক (সমরক্তজ) সগোত্র-প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায় যার ব্যাখ্যা অধুনা-লুপ্ত আরও এক প্রকার প্রাচীনতর দলগত-বিয়ের দ্বারা সম্ভবপর। ১৮৭১ সালে "Systems of Consanguinity and Affinity" (সগোত্র প্রথা ও কুটুম্ব জ্ঞানের রকমফের) নামক গ্রন্থে তিনি এই সমস্ত প্রমাণপত্র ও এইগুলো সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করে ব্যাপকতর বিতর্কের সৃষ্টি করেন। সগোত্র-সম্পর্কের বিভিন্ন প্রথা থেকে আলোচনা শুরু করে এবং এক একটি প্রথা থেকে তার জুড়িদার পরিবারিক-প্রথা পুনর্গঠন ক'রে তিনি নতুন গবেষণাধারার সৃষ্টি করেন। এইভাবে আমাদের দৃষ্টি ও কল্পনা-শক্তি মানুষের প্রাগৈতিহাসের কোঠায় শেষ পর্যন্ত উপনীত হয়। এই পদ্ধতি যদি অভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তা'হলে ম্যাক্লেনানের চমকপ্রদ থিয়োরীগুলোর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদই উপস্থিত হবে।

ম্যাক্লেনান্ তাঁর মতবাদের জন্য নতুন যুক্তি-জাল বিস্তার ক'রে **"আদিম বিবাহ প্রথা"** বা Primitive Marriage-এর (Studies in Ancient History, 1876) নতুন সংস্করণ বের করেন। নিজের নিছক অনুমিতির (hypotheses) আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নিজে মানব পরিবারের পুরাদস্তুর কৃত্রিম ইতিহাস রচনা করলেও, তিনি লুবক ও মর্গ্যানের কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যেকটি

বিবৃতির জন্য কেবলমাত্র প্রমাণেরই দাবি করেন নি, তাঁদের কাছ থেকে তিনি এমন অভ্রান্ত প্রমাণের দাবি করেন, যেন এই পণ্ডিত দুজনকে স্কটল্যাণ্ডে কোন আদালতের সামনে হাজির হ'য়ে সাক্ষ্যদান করতে হবে। কিন্তু এই লোকটাই জার্মানদের মধ্যে মামা-ভাগ্নের নিগূঢ় সম্পর্ক (জার্মেনিয়া, ২০-তম অধ্যায়) সম্বন্ধে তাসিতুসের বিবরণী, দশ-বারজন ব্রিটেনের যৌথভাবে তাদের পত্নীদের সঙ্গে বসবাস বিষয়ক সিজারের রিপোর্ট এবং বর্বরদের মধ্যে যৌথ স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করা সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থকারদের বিবরণী অবলম্বন করে ঠাণ্ডা মেজাজে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই সব জাতি বহু-স্বামিত্বের (polyandry) আমলেই বসবাস করতো! সরকারপক্ষের কাউন্সেল যেন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যই বাগাড়ম্বর বিস্তার করছেন। নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য ইনি যেমন খুশি তেমনি যুক্তিজাল বিস্তার করবেন কিন্তু আসামীপক্ষের কাউন্সেলের কাছ থেকে তাঁর প্রত্যেকটি কথার জন্য নির্ভুল ও পুরোপুরি আইন-সঙ্গত প্রমাণ-পত্রাদি দাবি করবেন।

ম্যাক্লেনানের মতে দলগত-বিয়ে নিছক কল্পনা ছাড়া অপর কিছুই নয়; তার ফলে, তিনি বাখোফেনেরও অনেক নীচে নেমেছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, মর্গ্যান-প্রকীর্তিত সগোত্র-সম্পর্ক-প্রথাগুলি আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচারের নিয়ম-কানুন মাত্র। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে, ইণ্ডিয়ানরা বিদেশী লোক, এমন-কি, শ্বেতাঙ্গকেও ভাই বা বাবা বলে সম্বোধন করে। অবস্থা যদি এরকমই দাঁড়ায়, "পিতা" "মাতা" "ভাই" "বোন" ইত্যাদি শব্দকেও অনায়াসে অর্থহীন সম্বোধনসূচক উক্তিরূপে গণ্য করা যেতে পারে! কারণ লোকে ক্যাথলিক পুরোহিত ও মঠধারিণীদের "বাবা" ও "মা" ব'লে ডাকে। খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা, এমন-কি, ফ্রিম্যাসনরা (Free-masons) এবং বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন ও এসোসিয়েশানসমূহের সদস্যরাও তাঁদের পূর্ণ অধিবেশনের সময় পরস্পরকে "ভাই" আর "বোন" বলে সম্বোধন করেন। মোটের উপর, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ম্যাক্লেনান নিতান্ত দুর্বল যুক্তি ও প্রমাণপত্রের অবতারণা করেন।

ম্যাক্লেনানের একটা দুর্গ এখন পর্যন্ত অনাক্রান্ত রয়েছে। গোত্রান্তরবিবাহী ও সগোত্রবিবাহী জাতিদের পারস্পরিক বিরোধিতার উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর সমগ্র তত্ত্বকথাটাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। এই তত্ত্বকথার বিরুদ্ধে কেউ কলম চালাতে সাহস করে নি। সকলেই সর্ববাদীসম্মতরূপে এই তত্ত্বকথাকে মানব-পরিবারের সমগ্র ইতিকথার মেরুদণ্ডরূপেই স্বীকার করে

নেয়। এই বিরোধিতার ব্যাখ্যা করবার জন্য ম্যাকলেনানের চেষ্টা হয়ত ব্যর্থই হয়েছে। নিজে যে-সমস্ত ঘটনা ও তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হয়ত সেগুলোকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু খোদ বিরোধিতাটা অর্থাৎ পৃথক ও স্বাধীন দু'টো জাতির একটা স্বজাতির মধ্যে থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করে, আর আরেকটা এই প্রথাকে পুরো নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে,—পরস্পরের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সম্পর্কহীন এরূপ দুই শ্রেণী উপজাতির অস্তিত্ব—বেদ-বাইবেলের বাণীর মতই অভ্রান্ত সত্য। উদাহরণস্বরূপ, জিরো-তুলোঁর "ওরিজিনে ছলা ফ্যামিলে" (পরিবারের উৎপত্তি ১৮৭৪) গ্রন্থ, এমন কি, লুবকের Origin of Civilization (সভ্যতার উৎপত্তি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৮২) গ্রন্থ খতিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বোঝা যাবে।

এইখানে মর্গ্যান তাঁর **প্রাচীন সমাজ** (১৮৭৭) ("Ancient Society") নামক প্রধান গ্রন্থখানা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। এই গ্রন্থখানাকে ভিত্তি করেই বর্তমান গ্রন্থের উৎপত্তি। ১৮৭১ সনে মর্গ্যান যা ঠারেঠোরে উপলব্ধি করেন, তা এখন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত এবং অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত। গোত্রান্তর-বিবাহ ও সগোত্রবিবাহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বর্তমান সময় পর্যন্ত গোত্রান্তর-বিবাহী বলে কোন উপজাতির অস্তিত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রত্যেক জায়গাতেই অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য দলগত-বিয়ের প্রচলন সর্বজনীন বাস্তব-সত্যরূপেই গণ্য। যে সময় দলগত-বিয়ের প্রচলন ছিল সেই সময় উপজাতি মায়ের দিক থেকে রক্তসম্পর্কযুক্ত কতকগুলি দলে অর্থাৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হলেও উপজাতিটির মধ্যেই সকলে স্ত্রী-গ্রহণ করতে বাধ্য ছিল। কাজেই, প্রত্যেক গোষ্ঠী পুরাপুরি গোত্রান্তরবিবাহী হ'লেও এই সমস্ত গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত মূল উপজাতিটা ছিল খাঁটি সগোত্রবিবাহী। ম্যাক্লেনানের কৃত্রিম সৌধের ধ্বংসাবশেষটুকুও এইবার পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মর্গ্যান কিন্তু এইখানেই ক্ষান্ত হননি। আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীপ্রথার মারফতে তিনি তাঁর গবেষণাক্ষেত্রে দ্বিতীয় বড় রকমের আবিষ্ক্রিয়ায় উপনীত হ'তে সক্ষম হন। জননী-বিধি-শাসিত এই গোষ্ঠী-প্রথার ভেতরে তিনি এমন এক আদিম প্রথা আবিষ্কার করেন, যা থেকে পরবর্তী যুগের জনক-বিধি-শাসিত গোষ্ঠী-প্রথা উদ্ভূত। প্রাচীন সভ্য জাতিদের মধ্যে আমরা এরূপ গোষ্ঠী-প্রথারই সাক্ষাৎ পাই। ঐতিহাসিকদের নিকট সুপরিচিত দুর্বোধ্য হেঁয়ালী

গ্রীক ও রোমান গোষ্ঠী-প্রথার তাৎপর্য এখন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠী-প্রথার ভেতরেই আবিষ্কৃত হ'য়ে সমগ্র আদিমযুগের ইতিহাস এক নতুন ভিত্তিমূলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডারুইনের ক্রমোন্নতিবাদ যেমন প্রাণী-বিজ্ঞানের নিকট, আর মার্ক্সের বাড়তি মূল্যের থিয়োরী (theory of surplus value) যেমন ধনবিজ্ঞানের নিকট মূল্যবান, সভ্যজাতিদের পুরুষ-শাসিত গোষ্ঠীর প্রাথমিক স্তর হিসাবে আদিম যুগের জননী-বিধি-শাসিত গোষ্ঠীর পুনরাবিষ্কারও নৃতত্ত্বের নিকট তেমনি মূল্যবান বিবেচিত। মর্গ্যান্ এতদ্বারা সর্বপ্রথম মানব-পরিবারের ইতিহাসের কাঠামোটার সন্ধান পান। বর্তমানে যতদূর তথ্যাদি সংগ্রহ সম্ভবপর, তদনুসারে প্রাচীন যুগে পরিবারের ক্রমবিকাশের ধারাটার মোটামুটি স্বরূপটা পাকড়াও করা এখন সম্ভব হয়েছে। আদিমযুগের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা পরিচালনের যে নয়া রাস্তা খোলসা হয়, তা সকলেই স্বীকার করেন। সমগ্র নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান জননী-বিধি-শাসিত গোষ্ঠী-প্রথার উপরেই দণ্ডায়মান। এই প্রথা আবিষ্কৃত হওয়ার পর, গবেষণা পরিচালনের সময় কোথায় ও কিসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'বে আর কিভাবেই বা গবেষণার ফলগুলো সাজাতে হ'বে আমরা তার সন্ধান লাভ করি। কাজেই মর্গ্যানের গ্রন্থ প্রকাশের পর নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণার দ্রুত প্রগতি সাধিত হয়।

নৃতত্ত্বসেবীরা, এমন কি, ইংলণ্ডের নৃতত্ত্বসেবীরাও বর্তমানে মর্গ্যানের আবিষ্ক্রিয়াগুলি প্রশংসার চোখেই দেখে থাকেন, অন্ততপক্ষে, আত্মসাৎ তো করেনই। কিন্তু একজনের মধ্যেও এমন সততা দেখা যায় না যে, সে সোজাসুজি স্বীকার ক'রে বলে যে, মর্গ্যানই আমাদের চিন্তারাজ্যে এই বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। ইংলণ্ডের পণ্ডিতরা মর্গ্যানের গ্রন্থখানা সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন ক'রে বইখানার মুণ্ডপাত করার অভিলাষী। বড় জোর, গ্রন্থকারের অপেক্ষাকৃত পূর্বতন আবিষ্ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে দু'চারটে প্রশংসাবাদ আওড়িয়ে তাঁরা গ্রন্থকারকে সরাসরি বিদায় দিতে চেষ্টা করেন। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চুলচেরা হিসাব করতে এদের ক্লান্তিবোধ না হ'লেও মর্গ্যানের বড়বড় আবিষ্কারগুলো সম্বন্ধে এঁরা একগুঁয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। **"প্রাচীন সমাজ"** (এনশ্যেণ্ট সোসাইটি) গ্রন্থের মূল সংস্করণটা বাজারে নিঃশেষ হয়েছে। আমেরিকায় এই ধরণের বই বড়-একটা বিকায় না। ইংলণ্ডে, যতদূরসম্ভব, নিয়মিতভাবেই বইখানার প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। একমাত্র জার্মান অনুবাদ গ্রন্থখানাই এই যুগ-প্রবর্তক মহাগ্রন্থের একমাত্র সংস্করণরূপে এখনও কোনমতে বইয়ের বাজারে চালু আছে।

কিন্তু এত ঢাক ঢাক, গুড়গুড় কেন? গ্রন্থখানাকে ধামাধাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। শিষ্টতার খাতিরে আমাদের পরিচিত নৃতত্ত্ব-সেবীরা হামেশাই একে অপরের গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃত ক'রে বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করে থাকেন। মর্গ্যান আমেরিকান। কাজেই, ইংরেজ নৃতত্ত্বসেবীদের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ উপস্থিত হয়েছে। তথ্যসংগ্রহ সম্পর্কে যথেষ্ট বাহাদুরি সত্ত্বেও এই সমস্ত তথ্য সন্নিবেশ ও ঐগুলোর শ্রেণীবিন্যাসের বেলায়, এককথায়, আইডিয়া বা ভাব-ধারা সম্পর্কে তাঁদেরকে দু'জন প্রতিভাশালী বৈদেশিক—বাখোফোন ও মর্গ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। জার্মানকে বরং বরদাস্ত করা চলে কিন্তু আমেরিকানের দাপট সহ্য করা যায় কেমন করে? কোন আমেরিকানের বিরোধিতা করার সময় প্রত্যেক ইংরেজকেই দারুণ দেশ-প্রেমিক দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি এর জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি। তাছাড়া, ম্যাক্লেনান প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ্যার নেতা ও সরকারী প্রতিষ্ঠাতা। শিশুহত্যা, বহু-বিবাহ, পাশবিক বিবাহ, জননী-বিধি-শাসিত পরিবার—তৎকর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে গ্রথিত এই ঐতিহাসিক-ক্রম সম্বন্ধে আলোচনার সময় গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন যেন নৃতত্ত্ব-বিষয়ক শিষ্টাচারেই পরিণত হয়েছে। গোত্রান্তরবিবাহী ও সগোত্রবিবাহী উপজাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংশ্রবহীনতা ও পুরো নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সামান্য মাত্রায় সংশয় প্রকাশও দারুণ অধর্মাচারের পরিচায়ক। এই পবিত্র সিদ্ধান্তগুলোকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে মর্গ্যান ধর্মদ্রোহিতারই পরিচয় প্রদান করেন। তাছাড়া, মর্গ্যান তাঁর গবেষণা এমন কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন যে, জলন্ত ও প্রত্যক্ষ সত্যের মতই তাঁর মতবাদটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। কাজেই, গোত্রান্তরবিবাহ ও সগোত্রবিবাহের মধ্যে এতদিন নিরাশ্রয়ের মত ইতস্তত সঞ্চালিত হওয়ার পর, ম্যাক্লেনানপন্থীদের পক্ষে এখন ভ্রূকুঞ্চিত করে এইমাত্র বলাই সাজে: "এই তত্ত্ব নিজেরাই বহুদিন পূর্বে উদ্ভাবন না করে আমরা কেন এতকাল বোকা সেজে বসে আছি।"

মর্গ্যানের তথাকথিত অপরাধমূলক মতবাদটা সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় নৃতত্ত্ব-সেবীরা যে নীরবতা অবলম্বন করে তাঁকে উপেক্ষা করেন সে-সম্বন্ধে যেন অনেকটা পরোয়া না করেই মর্গ্যান তাঁর অপরাধ ষোলকলায় পূর্ণ করেন। কারণ তিনি কেবলমাত্র ফরাসী পণ্ডিত ফুরিয়ের মত সভ্যতা, পণ্য-উৎপাদন-সমিতি তথা, বর্তমান সমাজের মূল ভিত্তিটার তীব্র সমালোচনাই করেন নি, তিনি বর্তমান সমাজের ভাবী রূপান্তরের এমন আভাষ প্রদান করেন, যা একমাত্র কার্ল

মার্ক্‌সের পক্ষেই সম্ভবপর। কাজেই, "ঐতিহাসিক পদ্ধতি মর্গ্যানের ধাতে সহ্য হয় না" বলে ম্যাক্‌লেনান যে তাঁর বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ করবেন, এতে আর আশ্চর্য কি? ১৮৮৪ সনে জেনেভার অধ্যাপক-প্রবর মিঃ জিরো-তুলোঁও একই কথায় মর্গ্যানের বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। ১৮৭৪ সনে (ওরিজিনে দ্য লা ফামিলে) এই ভদ্রমহোদয় ম্যাক্‌লেনান-প্রকীর্তিত গোত্রান্তরবিবাহের গোলকধাঁধায় পড়ে যখন অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ান, তখন মর্গ্যানই এঁর উদ্ধার সাধন করেন।

আদিম মানব সমাজের ইতিহাস মর্গ্যানের কাছে যে আরও কত বিষয়ে ঋণী, সে সম্বন্ধে এখানে কোন্ আলোচনা করতে চাইনে। গ্রন্থের ভেতরে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। মর্গ্যানের প্রধান গ্রন্থখানা প্রকাশের পর চৌদ্দ ব'ছর অতীত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মানবজাতির আদিম-সমাজ সম্পর্কে গবেষণার উপযোগী মালমসলার বহর যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে। নৃতত্ত্ব-সেবীরা ছাড়া, পর্যটক, আদিম যুগের ইতিহাসের পেশাদার লেখকের দল, তুলনামূলক আইন-বিজ্ঞান বিশারদরাও যোগদান ক'রে এতে হয় নতুন তথ্য, না-হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যোজনা করেছেন। ফলে মর্গ্যানের কোন কোন বিশেষ দফার কতকগুলি ছোটখাট অনুমিতি সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, এমন-কি, ভ্রান্ত প্রমাণিতও হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু এই সমস্ত নতুন তথ্য তাঁর গ্রন্থের বড় বড় ভাবধারাগুলোর একটাকেও স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তৎপ্রবর্তিত আদিম যুগের ইতিহাসের ক্রমবিন্যাসের ধারা মোটামুটিভাবে এখনও অব্যাহত অবস্থায়ই আছে। নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণায় মর্গ্যানের সুমহান অবদান যে-ভাবে সতর্কতার সঙ্গে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার চেষ্টা করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর কৃতিত্ব ঠিক তেমনিভাবেই ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে (১)।

লণ্ডন, ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্‌

১৬ই জুন, ১৮৯১।

(১) ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে আসার সময় রসেষ্টার জেলা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব সদস্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। লুই মর্গ্যানের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মর্গ্যান সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশেষ-কিছু বলতে পারেন না। তিনি বলেন যে, মর্গ্যান বে-সরকারী নাগরিক হিসাবে রসেষ্টারে বাস করতেন। তিন দিনরাত তাঁর পড়াশোনা নিয়ে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ভাই ছিলেন সৈন্যবাহিনীর একজন কর্ণেল। ওয়াশিংটনের সামরিক দপ্তরে ইনি চাকরি করতেন। মর্গ্যান্ এই ভাইয়ের সাহায্যে তাঁর গবেষণা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সরকারী ব্যয়ে তাঁর কয়েকখানা বই ছাপিয়ে নেন। আমার সংবাদদাতা যখন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, তখন তিনিও একাজে তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন।—এফ, ই,

পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

প্রথম অধ্যায়

৩২১৪

সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক স্তর

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে মর্গ্যানই সর্বপ্রথম মানবজাতির প্রাগৈতিহাসিক যুগকে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভেতরে আনয়ন করতে চেষ্টা করেন। আর যতদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত বিষয়-বস্তুর চাপে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত না হয়, ততদিন তাঁর শ্রেণী-বিন্যাসই বলবৎ থাকবে।

অ-সভ্য (savagery) অবস্থা, বর্বর (barbarism) ও সভ্যতা—[মানব সমাজের] এই তিনটি প্রধান যুগের মধ্যে প্রথম দুটো এবং তৃতীয় যুগের পরিবর্তনের সূচনার সময় পর্যন্ত নিয়ে তিনি আলোচনা চালান। অ-সভ্য অবস্থা ও বর্বর যুগকে তিনি আহার্য উৎপাদনে প্রগতির ক্রম অনুসারে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিনটি স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত করেন। [আহার্য উৎপাদনের প্রগতিকে মাপকাঠিরূপে ব্যবহারের] কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন :

"আহার্য উৎপাদনে মানবজাতির নৈপুণ্যের উপরই তাদের পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারের সমগ্র সমস্যাটা নির্ভর করে। [সকলেরই বিশ্বাস পৃথিবীতে] একমাত্র মানবজাতিই আহার্য উৎপাদনের উপর পুরো ক্ষমতা বিস্তার করেছে, [অর্থাৎ এই সমস্যাটাকে পুরোপুরি (১) মুঠোর মধ্যে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই আহার্য উৎপাদনের উৎস ও উপায়গুলির বিস্তৃতি সাধনের সঙ্গে মানবীয় প্রগতি ধারার প্রধান প্রধান যুগগুলোকে অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষভাবে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে।" (২)

১। অ-সভ্য অবস্থা।

(ক) **নিম্নস্তর**—মানবজাতির শৈশব অবস্থা। মানুষ তখনো তার মূল আবাস-স্থল গ্রীষ্মমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের সন্নিহিত বন-জঙ্গলে, অন্তত আংশিকভাবে বৃক্ষে অবস্থান করে ; এছাড়া, অতিকায় শিকারী জানোয়ারদের মধ্যে তার অবিচ্ছিন্নভাবে তিষ্ঠিয়া থাকা কল্পনা করাও যায় না ; ফল, শাঁস, মূল তার আহার্য

১। 'পুরোপুরি' স্থলে এঙ্গেলস্ লিখেন "প্রায়।"

২। মর্গ্যান—পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১৯ পৃঃ।

দ্রব্য। মৌখিক ভাষার ক্রমবিকাশ এই যুগের প্রধান কীর্তি। এই ঐতিহাসিক যুগে বিদিত কোন জাতিকেই আর আদিম অবস্থায় দেখা যায় না। যদিও এই যুগ চলে হাজার ব'ছর ধরে তবুও এমন কোন প্রত্যক্ষ নজির বা প্রমাণপত্র নেই যা দিয়ে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে; কিন্তু প্রাণীরাজ্য থেকে মানবজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ স্বীকার করার সঙ্গে এই পরিবর্তনের যুগটাকেও অবশ্যই মেনে নিতে হয়।

(খ) **মধ্যস্তর**—ভোজ্যবস্তুরূপে মাছ (কাঁকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি জলজন্তু সহ) আগুন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, এই স্তরের সূচনা। মাছ আর আগুন উভয়ে উভয়ের পরিপূরক; কারণ, একমাত্র আগুনের সাহায্য নিয়েই মাছ শরীরের পুষ্টিসাধন করতে পারে। এই নতুন ভোজ্যবস্তু আবিষ্কারের পর মানুষ জল-বায়ু আর স্থানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। এমন কি, সেই নিতান্ত অ-সভ্য অবস্থাতেও তারা নদী আর সমুদ্রোপকূল ধ'রে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব দেশান্তর গমনের প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক মহাদেশেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের (Stone Age) বা পেলিওলিথ (Paleolithic) নামে পরিচিত যুগের আনাড়ীভাবে তৈরি ভোঁতা পাথরের অস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়; ঐ সমস্ত অস্ত্র বা উহার অধিকাংশের ব্যবহার সর্বতোভাবে বা প্রধানত এই যুগেই আরম্ভ হয়। নতুন অধিকৃত অঞ্চল, উদ্ভাবনের জন্য অবিশ্রান্ত সক্রিয় তাগিদ বোধ, আর ঘর্ষণ দ্বারা আগুন তৈরির ক্ষমতা মানুষকে নতুন নতুন ভোজ্যবস্তুর উদ্ভাবনে সক্ষম করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষ ক্রমে গুড়ো করার যোগ্য মূল ও কন্দ গরম ছাইয়ের গাদায় বা মাটির চুল্লিতে বসিয়ে ভোজ্যদ্রব্যে পরিণত করে। প্রথম অস্ত্র গদা ও বর্শা উদ্ভাবনের পর শিকারলব্ধ প্রাণীও মাঝে মাঝে ভোজ্য-বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু সাহিত্যে কেবল মাত্র মৃগয়াজীবী অর্থাৎ একমাত্র শিকারলব্ধ প্রাণীর মাংস খেয়েই জীবনধারণে অভ্যস্ত যে-সব উপজাতির বিবরণী হামেশা চোখে পড়ে, কিন্তু সেই ধরণের কোন উপজাতি কোনদিনই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করেনি। কারণ শিকারের প্রাণী যোগাড় করা তখন অত্যন্ত বিপজ্জনকই ছিল এবং কাজেই তা সম্ভবপর ছিল না। এই অবস্থায়, ভোজ্যবস্তু সরবরাহের অনবরত অনিশ্চয়তাবশত নরমাংস ভোজন প্রথাও উদ্ভূত হয়ে থাকবে। এই স্তর চলে আরও বহু দীর্ঘ সময় ধরে। অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দারা এবং পলিনেশিয়ার বহু জাতি এখনও অসভ্য অবস্থার এই মধ্য স্তরেই আছে।

(গ) **উচ্চস্তর**—তীর-ধনুক উদ্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের উৎপত্তি। তার ফলে শিকার-লব্ধ প্রাণী নিয়মিতভাবে ভোজ্য-বস্তু আর শিকার স্বাভাবিক বৃত্তিতে পরিণত হয়। ধনুক, রজ্জু ও তীর তখন অত্যন্ত জটিল অস্ত্ররূপে গণ্য। তীর-ধনুকের উদ্ভাবন মানুষের রীতিমতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিতে শাণ এবং বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরিচায়ক; মোটকথা, আরও অনেক কিছু আবিষ্কারের পরিচয় এই নয়া আবিষ্কারের ইন্ধন জোগায়। আমরা দেখতে পাই, মৃন্ময়পাত্র ব্যবহারে অনভ্যস্ত, কিন্তু তীর-ধনুর সঙ্গে পরিচিত জাতিগুলি (মর্গ্যানের মতে এখান থেকে বর্বরযুগের দিকে পরিবর্তনের সূচনা) ইতিমধ্যেই পল্লিগ্রামগুলিতে বসবাস আরম্ভ করেছে। আর তারা ভোজ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপায়ের উপরেও অনেকখানি প্রভুত্বলাভ করেছে। কাঠের জলপাত্র ও বাসনকোসন, গাছের ছালের তন্তু দিয়ে হাতে-বোনা (তাঁতের সাহায্যে নয়) বস্ত্র, গাছের ছাল বা পাতলা শাখা দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, ধারালো পাথরের অস্ত্রও (neolithic) আমাদের চোখে পড়ে। আগুন ও প্রস্তরের কুঠার উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়ি দিয়ে খোদাই করা নৌকার রেওয়াজও আরম্ভ হয়; লোকে কাঠের কড়ি আর তক্তা দিয়ে মাঝে মাঝে বসত-বাড়িও তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই সমস্ত অগ্রগতির ছাপ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এরা তীর ধনুর ব্যবহার জানলেও মৃন্ময়পাত্র সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ। বর্বর-যুগের লৌহ-নির্মিত তরবারি আর সভ্যতার আমলের আগ্নেয়াস্ত্রের মত অ-সভ্য যুগের তীর-ধনুকই চরম অস্ত্ররূপেই গণ্য।

২। বর্বর যুগ।

(ক) **নিম্নস্তর**—মৃন্ময়পাত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের সূচনা। আগুনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে প্রায়ই ঝুড়ি বা কাঠের পাত্রের গায়ে কাদা লেপা হতো। [প্রথম মৃন্ময়পাত্র এইভাবেই তৈরি হয়। নানাক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই প্রক্রিয়া যে সম্ভবও তাতে সন্দেহ করার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না।] মোটের উপর, এইভাবে মানুষ আবিষ্কার করে যে, ভেতরে কোন পাত্র না থাক্‌লেও মাটির ছাঁচেই বেশ কাজ চলে যায়।

এতক্ষণ আমরা ক্রমবিকাশের যে সাধারণ গতি ও ধারা নিয়ে আলোচনা করলাম, নির্দিষ্ট কোন যুগে, দেশ বা স্থান নির্বিশেষে এই গতি ও ধারা সমস্ত জাতির উপরেই প্রয়োগ করা চলে। বর্বর যুগের প্রারম্ভেই আমরা এমন একটা স্তরে পৌঁছি, যেখানে [পৃথিবীর] দুইটি মহাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর

পার্থক্য রীতিমত প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। পশুপালন, জনন এবং চাস-আবাদ বর্বর যুগের প্রধান বিশেষত্ব। এই সময় পূর্ব-মহাদেশ, তথাকথিত প্রাচীন-জগত পালনের যোগ্য প্রায় সকলপ্রকার জীব-জানোয়ারের অধিকারী। এখানে কেবলমাত্র একটি ছাড়া সকল প্রকার খাদ্য-শস্যও জন্মায়। পাশ্চাত্য মহাদেশ—আমেরিকায় লামা ছাড়া পালনের যোগ্য কোন স্তন্যপায়ী পশু ছিল না। আর এই লামা প্রাণীরও অস্তিত্ব ছিল দক্ষিণ-আমেরিকার মাত্র একটি অঞ্চলে। চাষ-আবাদের যোগ্য খাদ্যশস্যগুলোর মধ্যে আমেরিকায় মাত্র একটি খাদ্যশস্যের অস্তিত্ব ছিল। এর নাম ভুট্টা। তবে এই শস্যটা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। প্রাকৃতিক অবস্থার এই সমস্ত রকমফেরের জন্য প্রত্যেক গোলার্ধের লোকজন সে থেকে চলে আপন-আপন পথে। ফলে, মহাদেশ দুটিতে বিভিন্ন স্তরে নানা প্রকার পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

(খ) **মধ্যস্তর**।—পূর্ব-গোলার্ধে পশুপালন থেকে এই স্তর আরম্ভ হয়। পশ্চিম-গোলার্ধে পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে খাদ্য-শস্যের চাষ-আবাদ আর রোদে-শুকানো ইট ও পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরির সঙ্গে এই স্তরের সূচনা।

পশ্চিম-গোলার্ধ নিয়েই এখন আলোচনা শুরু করা যাক। কারণ এখানে ইউরোপিয়ানদের অধিকার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এই স্তরটি মোটেই পরবর্তী স্তরটির দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ার অবকাশ পায় নি।

ইণ্ডিয়ানরা যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন বর্বরযুগের নীচের ধাপের (মিসিসিপি নদীর পূর্বদিকের সমস্ত উপজাতি) ইণ্ডিয়ানরা ইতিপূর্বেই বাগানে ভুট্টার আবাদ আর সম্ভবত কুমড়া, শশা, খরমুজ প্রভৃতির আবাদেও অভ্যস্ত ছিল। এই সমস্ত ও ভুট্টা থেকে তাদের খোরাকের অধিকাংশ সংগৃহীতও হয়। বেড়া-দিয়ে-ঘেরা কাঠের বাড়িযুক্ত গ্রামে তারা বাস করে। উত্তর-পশ্চিমের, বিশেষত, কলম্বিয়া নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা তখনও অ-সভ্যযুগের উচ্চ স্তরে। মাটির বাসন বা চাষ-আবাদ তাদের নিকট একেবারে অজ্ঞাত বস্তু। অপরদিকে, [ইউরোপিয়ানদের দ্বারা]অধিকৃত হবার সময় নিউ-মেক্সিকোর তথাকথিত পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান, মেক্সিকোবাসী, মধ্য-আমেরিকাবাসী ও পেরুবাসী ইণ্ডিয়ানরা ছিল বর্বরযুগের মধ্য স্তরে। এরা রোদে পোড়া ইট ও পাথরের তৈরি দুর্গসদৃশ বাড়িতে বাস করতো। স্থান ও আবহাওয়ার ব্যতিক্রম অনুসারে ভুট্টা ও আরও পাঁচটা গাছপালার চাষ-আবাদ জানত ; কৃত্রিম জলসেচ দ্বারা এরা বিভিন্ন বাগানে বিভিন্ন অঞ্চল ও জলবায়ু অনুযায়ী এইসব চাষ-আবাদ করে ; এইগুলোই ছিল তাদের

প্রধান আহার্য। এরা সামান্য কিছুকিছু পশুপালনও করে। মেক্সিকোবাসীরা টার্কী ও অন্যান্য পাখী আর পেরুবাসীরা লামা পালনে অভ্যস্ত ছিল। ধাতুর ব্যবহারও তারা জানতো, তবে লোহা এদের কাছে ছিল অজ্ঞাত ; সে জন্য পাথরের অস্ত্র ও হাল-হাতিয়ার ব্যবহার ত্যাগ করতে তারা সক্ষম হয় নাই। ঠিক এমনি সময়ে, স্পেনীয়েরা তাদের স্বাধীন ক্রমবিকাশের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দেয়।

পূর্ব-গোলার্ধে দুধ ও মাংস-সরবরাহকারী পশু পালনের সঙ্গে সঙ্গে বর্বর যুগের মধ্যস্তর আরম্ভ হয়। কিন্তু এই যুগের শেষাশেষি চাষ-আবাদের সূচনা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। পশুপালন, পশু-জনন এবং বড় বড় পশুপালন সংগঠন আর্য ও সেমিটিক (semites) এবং অপরাপর বর্বরদের মধ্যে ভেদরেখা টেনে দেয়। ইউরোপীয় ও এসিয়াবাসী আর্যগণ গরুর একই রকমের নাম ব্যবহার করলেও চাষ-আবাদের অধিকাংশ শস্যের নামের মিল কদাচিৎ পাওয়া যায়।

সুযোগ-সুবিধামত কতকগুলি স্থানে পশুপালন সংগঠন পল্লি-জীবনে পরিণতি লাভ করে। ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিসের তীরবর্তী তৃণ-পূর্ণ সমতলভূমিতে সেমিটিকগণ এবং ভারতবর্ষ ও আক্সাস ও জাক্সার্টেস্ (Jaxartes), তথা ডন, নীপার তীরবর্তী তৃণপূর্ণ সমতল ক্ষেত্রগুলির আর্যগণ পল্লি-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এইরূপ পশুচারণ-যোগ্য ভূমিসমূহের, সীমান্ত দেশেই সর্বপ্রথম পশুপালনের রেওয়াজ আরম্ভ হয়ে থাকবে। কাজেই পরবর্তী যুগগুলির লোকজনদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, পশুপালক (pastoral) উপজাতিগুলো এমন-সব অঞ্চল থেকে এসেছে, যেগুলো মানবজাতির প্রসূতিগৃহ হওয়া দূরে থাক, ঐসব উপজাতির অ-সভ্য পূর্বপুরুষ, এমন-কি সেইযুগের নিম্নস্তরের লোকজনদের কাছেও বাসের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। আর নদীতীরবর্তী তৃণপূর্ণ সমতলভূমিতে পল্লিজীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার পর মধ্যযুগের এই সব বর্বরদের পক্ষে স্বেচ্ছায় আবার তাদের পূর্বপুরুষদের বনজঙ্গলে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনার চিন্তা করাও কঠিন হয়ে উঠে। উত্তর ও পশ্চিমে সরে যাওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ার সময়ও সেমিটিক ও আর্যগণ পশ্চিম-এসিয়া ও ইউরোপের জঙ্গল সমাকীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেনি। খাদ্যশস্যের চাষবাস দ্বারা এই সব অসুবিধাজনক অঞ্চলে গৃহপালিত পশুগুলির আহার্য সরবরাহ এবং শীতকালেও উহাদের পালনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাদের পশ্চিম-এসিয়া ও ইউরোপে বসবাস করা সম্ভব হয়নি। যতদূর-সম্ভব, পশু-খাদ্যের জন্যই এই সব উপজাতির লোকেরা খাদ্য-শস্যের চাষ-আবাদ করে এবং পরে ঐসব ভোজ্যদ্রব্য মানুষের পুষ্টিসাধনে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে।

দুধ ও মাংসের প্রচুর সরবরাহ, বিশেষত, শিশুদের পুষ্টিবিধানে এই দু'রকম খাদ্যদ্রব্যের অনুকূল প্রভাবের ফলেই আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলো অন্যান্য জাতির তুলনায় উন্নততর মূল্য জাতি (Race) রূপে গণ্য হয়। বস্তুত নিউ-মেক্সিকোর পুয়েব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের সম্পূর্ণরূপে নিরামিষভোজী বল্‌লেই চলে; সেই জন্য অধিকতর পরিমাণে মাছ-মাংস-ভোজী, বর্বরযুগের নিম্নস্তরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ানদের তুলনায় পুয়েব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের মগজটা আকারে অনেক ছোট দেখা যায়। যাই হোক, এই স্তরে নরমাংসভোজন-প্রথা ক্রমে একরূপ লোপ পেয়ে যায়। স্থানে স্থানে ধর্মকর্ম ও যাদুবিদ্যার জন্য নরমাংসভোজন-প্রথা কোনরকমে টিকে থাকে। ধর্ম-কর্ম আর যাদুবিদ্যা একই ধরণের চিজই বটে।

(গ) উচ্চস্তর—লৌহ-পিণ্ড ঢালাই করার সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরের উৎপত্তি; বর্ণমালার সাহায্যে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার আর সাহিত্যিক আলোচনা গবেষণা-গুলির রেকর্ড রাখা সম্পর্কে বর্ণমালার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তর ক্রমশ সভ্যতায় পরিণতি লাভ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে এই স্তরটা একমাত্র পূর্ব-গোলার্ধেই স্বাধীনভাবে ক্রমবিকাশ লাভের অবসর পায়; আর এর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী স্তরগুলির সমবেত উৎপাদনের চেয়েও বেশি ধন-দৌলত এই স্তরটিতে উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক যুগের (Heroic Age) গ্রীকগণ, রোমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সামান্য-কিছু পূর্বের ইতালীয় উপজাতিগণ, তাসিতুসের আমলের-জার্মানগণ এবং জল-দস্যু যুগের (Viking Age) নরমানরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

সকলের উপর, এই স্তরে গো-মহিষ-পরিচালিত লোহার-ফলক-যুক্ত লাঙলের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই লাঙলের কল্যাণে জমিতে ব্যাপকভাবে চাষ-আবাদ সম্ভব হয়; ফলে, পূর্ববর্তী যে-কোন যুগের তুলনায় সীমাহীন আহার্য সরবরাহের সুযোগ উপস্থিত হয়। ক্রমে চাষের জমি ও চারণ-ভূমির জন্য বন-জঙ্গল সাফ করা চল্‌তে থাকে। লোহার কুড়ুল আর লোহার কোদাল ছাড়া যে বিস্তৃতভাবে বন-জঙ্গল সাফ করার সমস্যাটার আজও সমাধান হ'ত না তা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও বেজায় বেড়ে যেতে আরম্ভ করে; ছোট ছোট অঞ্চলগুলো ঘন-লোক-বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়। [মাঠে-ময়দানে] চাষ-আবাদের রেওয়াজ প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে পাঁচ-লাখ লোকেরও একত্র সমাবেশ অতি অনন্যসাধারণ ব্যাপার-রূপে গণ্য হয়। যতদূরসম্ভব, এইরূপ লোক-সমাবেশ আদৌ ঘটে উঠেনি।

হোমারের কাব্য-সাহিত্যে, বিশেষত, **ইলিয়াদ** গ্রন্থে আমরা বর্বরযুগের উচ্চস্তর চরম সীমায় দেখতে পাই। পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত লোহার হাল-হাতিয়ার, কামারের জাঁতা, হাতে-চালানো মিল (hand-mill), কুম্ভকারের চাক, তেল ও মদ প্রস্তুত-করণ, সুকুমার-শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত ধাতুর কাজ, শকট ও যুদ্ধের রথ, কাঠের কড়ি ও তক্তার সাহায্যে জাহাজ প্রস্তুতকরণ, কলা-বিদ্যা হিসাবে স্থাপত্য-শিল্পের প্রবর্তন, দুর্গচূড়া ও ফুকারযুক্ত দুর্গ-প্রাচীর সহ প্রাচীর-ঘেরা শহর, হোমারের মহাকাব্য ও পুরোপুরি পুরাবৃত্ত—গ্রীকগণ এই সমস্ত অমূল্য সম্পদ উত্তরাধিকার হিসাবে বর্বরযুগের আমল থেকে সভ্যতার যুগে আনয়ন করে। হোমার-যুগের গ্রীকগণ যখন কৃষ্টিস্তর (cultural stage) থেকে অগ্রগতির পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত হয়, জার্মানরা তখন কৃষ্টি-স্তরের ঠিক গোড়াতেই দাঁড়িয়ে। সিজার এবং, এমন-কি, তাসিতুস এই জার্মানদের সম্বন্ধে যে-সব বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন তার তুলনামূলক বিচার ক'রে আমরা দেখতে পাই, বর্বরযুগের উচ্চ স্তরে ধন-সম্পদ উৎপাদন কী অদ্ভুত প্রগতিই না লাভ করে।

মর্গ্যানকে অনুসরণ করে মানবজাতির অ-সভ্য অবস্থা ও বর্বরযুগ থেকে সভ্যতার প্রারম্ভ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল, তা নিশ্চয়ই নতুন ও অকাট্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অনুসরণ করে প্রত্যক্ষভাবে এই সব তত্ত্ব স্থির করা হয়; কাজেই এগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। তবুও আমাদের আলোচনার শেষ ভাগে যে আলেখ্য উন্মোচন করা হয়, তার তুলনায় এই বিবরণী নিতান্ত আটপৌরে ও সাদাসিধেই বিবেচিত হবে। তখনই বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার ক্রমিক পরিবর্তনের ছবিটা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত অবস্থায় দেখা যাবে, আর বর্বর অবস্থা ও সভ্যতার পার্থক্যটাও ঝলমল হ'য়ে ফুটে উঠবে। আপাতত মর্গ্যানের শ্রেণী-বিন্যাসটা নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাক: অ-সভ্য যুগ—এই যুগে মানুষ প্রধানত প্রাকৃতিক অবস্থায় অবস্থিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করে; আর এই সমস্ত প্রাকৃতিক দ্রব্য আহরণের সহায়ক হাল-হাতিয়ারই মানুষের প্রধান কলা-সম্পদে পরিণত। বর্বর যুগ—এই যুগে মানুষ গৃহ-পালিত জীব-জানোয়ার পালন আর কৃষিকার্য শিক্ষা করে এবং মানবীয় শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াগুলো আয়ত্ত করে। সভ্যতা—এই যুগে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি উন্নততর কার্যপ্রণালী প্রয়োগ করতে শিক্ষা করে ও শিল্প ও কলাবিদ্যায় (art) জ্ঞান অর্জন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার

মর্গ্যান তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ইরোকোয়া (Iroquois) ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যাপন করেন। বর্তমানে এই ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাস করে। তিনি এই ইণ্ডিয়ানদের একটি উপজাতির (সেনেকা) মধ্যে মিশে পর্যন্ত গিয়েছিলেন (adopted)। তিনি এদের মধ্যে সগোত্র-সম্পর্কের (consanguinity) এমন একটা ধারা দেখতে পান যার সঙ্গে তাদের বাস্তব পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মিল ছিল না মোটেই। এদের ভেতর এক এক জোড়া দম্পতির মধ্যে বিবাহের প্রথা প্রচলন ছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে যে-কোন পক্ষের ইচ্ছাক্রমেই এই বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটতে পারতো। মর্গ্যান একে "জোড়-পরিবার" (pairing family) আখ্যা প্রদান করেন। এই বিবাহিত দম্পতির ছেলেমেয়েরা সকলেরই কাছে জ্ঞাত ও পরিচিত ছিল। কাকে বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন বলতে হ'বে এ-নিয়ে সন্দেহ বা কোন গোলযোগ ছিল না মোটেই। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু এই সমস্ত নাম ও সম্পর্ক পুরোপুরি বিপরীত-ভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। ইরোকোয়ার কাছে একমাত্র তার নিজস্ব সন্তানই ছেলে মেয়ে পদবাচ্য নয়, তার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততিরাও তার ছেলেমেয়ে; আর তারা তাকে বাবা বলে ডাকে। অপর পক্ষে, সে বোনের ছেলেমেয়েদের তার ভাগনী ও ভাগনী বলে ডাকে, আর তারা তাকে মাতুল মহাশয় ব'লে সম্বোধন করে। বিপরীত দিকে, ইরোকোয়া নারী তার নিজের বোনের ছেলেমেয়েকে নিজের ছেলেমেয়ে ব'লে ডাকে, আর তারাও সকলে তাকে মা বলে ডাকে। কিন্তু ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে সে ভাইপো ও ভাইঝি বলে ডাকে, আর তারাও তাকে পিসি ব'লে ডাকে। এইভাবে ভাইদের সমস্ত ছেলেমেয়ে পরস্পরকে ভাইবোন ব'লে ডাকে; বোনেদের ছেলেমেয়েরাও পরস্পরকে একইভাবে সম্বোধন করে। অপর পক্ষে, কোন নারীর নিজের ছেলেমেয়ে আর তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জ্ঞাতি ভাইবোন বা সম্পর্কের ভাইবোন (cousin) বলে ডাকে। এই সমস্ত কিন্তু শূন্যগর্ভ নাম নয়; সগোত্রের দিক থেকে দূরত্ব, সমতা, পার্থক্যের পরিমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধে এগুলো বাস্তব ধারণার অভিব্যক্তিরূপেই গণ্য: ব্যক্তির কয়েকশ' রকমের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক প্রকাশ করা যেতে পারে, ধারণাগুলা সগোত্র-সম্পর্কের এইরূপ সুবিস্তৃত

প্রথার ভিত্তিমূলেই পরিণত। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রথাটি কেবলমাত্র আমেরিকাবাসী সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের (এ পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি) বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, এই প্রথার প্রমাণ (validity) ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিবর্গ, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতিসমূহ এবং হিন্দুস্থানের গাউরা জাতিদের মধ্যেও অপরিবর্তিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতের তামিলজাতি আর নিউইয়র্ক স্টেটের ইরোকোয়াজাতি একইভাবে দু'শো রকমের সগোত্রসম্পর্কের পরিচয় প্রদান করে। আমেরিকাবাসী সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মত ভারতবর্ষের এই সমস্ত জাতির মধ্যেও সগোত্রসম্পর্ক-প্রথা আর চলতি পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বাস্তব সম্পর্কগুলোর মধ্যে একই রকম বিরোধিতা দৃষ্ট হয়।

কি ক'রে এসবের ব্যাখ্যা করা যায়? সমস্ত শ্রেণীর অ-সভ্য ও বর্বর স্তরের সমাজ-বিন্যাসে সগোত্র-সম্পর্ক যখন এমন চরম প্রভাব বিস্তার করে, তখন এমন এক ব্যাপক প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে কতকগুলো বাছা বাছা বুলি ঝাড়লেই যথেষ্ট হয় না। যখন একটা প্রথা আমেরিকার সর্বত্র চলতি সাধারণ প্রথায় পরিণত, আর এসিয়ার রক্তগত সম্পর্কের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নজাতীয় মূলজাতির (race) মধ্যেও যখন এই প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র, সামান্য কিছু তারতম্যসহ সেই একই প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন এই প্রথার ব্যাখ্যা করতে হয় ইতিহাসের মাপকাঠিতে; ম্যাক্লেনানের মত কেবলমাত্র আলোচনাতে পর্যবসিত করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে চলে না। বাপ, ছেলে, ভাই, বোন, এই সমস্ত শব্দ কেবলমাত্র সম্বর্ধনা বা অভিনন্দন-জ্ঞাপক শব্দমাত্র নয়। এই সমস্ত শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়িত্বসমূহের ভাবধারা নিহিত আছে। আলোচ্য জাতিগুলোর সমাজ-কাঠামোর সারভাগ এই সব দায়িত্ব ও বাধ্য-বাধকতা নিয়েই গঠিত। এ-সবের ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেও স্যাণ্ডুইচ্ দ্বীপপুঞ্জে (হাওয়াই) এমন এক প্রকার মানব-পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, যাতে আমেরিকান ও প্রাচীন ভারতীয় সগোত্র ধারানুযায়ী পিতামাতা, ভাইবোন, পুত্র-কন্যা, মামা-পিসি, বোনপো বোনঝির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আবার একটা আশ্চর্য ঘটনারও পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁটি হাওয়াইয়ান পরিবারের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপে প্রচলিত সগোত্র ধারার রীতিমত গরমিল দেখা যায়। কারণ হাওয়াইয়ান সগোত্র ধারা অনুসারে ভাইবোনদের সমস্ত ছেলেমেয়ে, কোনরকমের

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার

মর্গ্যান তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ইরোকোয়া (Iroquois) ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যাপন করেন। বর্তমানে এই ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাস করে। তিনি এই ইণ্ডিয়ানদের একটি উপজাতির (সেনেকা) মধ্যে মিশে পর্যন্ত গিয়েছিলেন (adopted)। তিনি এদের মধ্যে সগোত্র-সম্পর্কের (consanguinity) এমন একটা ধারা দেখতে পান যার সঙ্গে তাদের বাস্তব পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মিল ছিল না মোটেই। এদের ভেতর এক এক জোড়া দম্পতির মধ্যে বিবাহের প্রথা প্রচলন ছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে যে-কোন পক্ষের ইচ্ছাক্রমেই এই বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান ঘটতে পারতো। মর্গ্যান একে "জোড়-পরিবার" (pairing family) আখ্যা প্রদান করেন। এই বিবাহিত দম্পতির ছেলেমেয়েরা সকলেরই কাছে জ্ঞাত ও পরিচিত ছিল। কাকে বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন বলতে হ'বে এ-নিয়ে সন্দেহ বা কোন গোলযোগ ছিল না মোটেই। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু এই সমস্ত নাম ও সম্পর্ক পুরোপুরি বিপরীত-ভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। ইরোকোয়ার কাছে একমাত্র তার নিজস্ব সন্তানই ছেলে মেয়ে পদবাচ্য নয়, তার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততিরাও তার ছেলেমেয়ে; আর তারা তাকে বাবা বলে ডাকে। অপর পক্ষে, সে বোনের ছেলেমেয়েদের তার ভাগনী ও ভাগনী বলে ডাকে, আর তারা তাকে মাতুল মহাশয় ব'লে সম্বোধন করে। বিপরীত দিকে, ইরোকোয়া নারী তার নিজের বোনের ছেলেমেয়েকে নিজের ছেলেমেয়ে ব'লে ডাকে, আর তারাও সকলে তাকে মা বলে ডাকে। কিন্তু ভাইয়ের ছেলেমেয়েকে সে ভাইপো ও ভাইঝি বলে ডাকে, আর তারাও তাকে পিসি ব'লে ডাকে। এইভাবে ভাইদের সমস্ত ছেলেমেয়ে পরস্পরকে ভাইবোন ব'লে ডাকে; বোনেদের ছেলেমেয়েরাও পরস্পরকে একইভাবে সম্বোধন করে। অপর পক্ষে, কোন নারীর নিজের ছেলেমেয়ে আর তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জ্ঞাতি ভাইবোন বা সম্পর্কের ভাইবোন (cousin) বলে ডাকে। এই সমস্ত কিন্তু শূন্যগর্ভ নাম নয়; সগোত্রের দিক থেকে দূরত্ব, সমতা, পার্থক্যের পরিমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধে এগুলো বাস্তব ধারণার অভিব্যক্তিরূপেই গণ্য: ব্যক্তির কয়েকশ' রকমের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক প্রকাশ করা যেতে পারে, ধারণাগুলা সগোত্র-সম্পর্কের এইরূপ সুবিস্তৃত

প্রথার ভিত্তিমূলেই পরিণত। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রথাটি কেবলমাত্র আমেরিকাবাসী সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের (এ পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি) বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, এই প্রথার প্রমাণ (validity) ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিবর্গ, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতিসমূহ এবং হিন্দুস্থানের গাউরা জাতিদের মধ্যেও অপরিবর্তিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতের তামিলজাতি আর নিউইয়র্ক স্টেটের ইরোকোয়াজাতি একইভাবে দু'শো রকমের সগোত্রসম্পর্কের পরিচয় প্রদান করে। আমেরিকাবাসী সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মত ভারতবর্ষের এই সমস্ত জাতির মধ্যেও সগোত্রসম্পর্ক-প্রথা আর চলতি পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বাস্তব সম্পর্কগুলোর মধ্যে একই রকম বিরোধিতা দৃষ্ট হয়।

কি ক'রে এসবের ব্যাখ্যা করা যায় ? সমস্ত শ্রেণীর অ-সভ্য ও বর্বর স্তরের সমাজ-বিন্যাসে সগোত্র-সম্পর্ক যখন এমন চরম প্রভাব বিস্তার করে, তখন এমন এক ব্যাপক প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে কতকগুলো বাছা বাছা বুলি ঝাড়লেই যথেষ্ট হয় না। যখন একটা প্রথা আমেরিকার সর্বত্র চলতি সাধারণ প্রথায় পরিণত, আর এসিয়ায় রক্তগত সম্পর্কের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নজাতীয় মূলজাতির (race) মধ্যেও যখন এই প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র, সামান্য কিছু তারতম্যসহ সেই একই প্রথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন এই প্রথার ব্যাখ্যা করতে হয় ইতিহাসের মাপকাঠিতে; ম্যাক্লেনানের মত কেবলমাত্র আলোচনাতে পর্যবসিত করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে চলে না। বাপ, ছেলে, ভাই, বোন, এই সমস্ত শব্দ কেবলমাত্র সম্বর্ধনা বা অভিনন্দন-জ্ঞাপক শব্দমাত্র নয়। এই সমস্ত শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়িত্বসমূহের ভাবধারা নিহিত আছে। আলোচ্য জাতিগুলোর সমাজ-কাঠামোর সারভাগ এই সব দায়িত্ব ও বাধ্য-বাধকতা নিয়েই গঠিত। এ-সবের ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেও স্যাণ্ডুইচ্ দ্বীপপুঞ্জে (হাওয়াই) এমন এক প্রকার মানব-পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, যাতে আমেরিকান ও প্রাচীন ভারতীয় সগোত্র ধারানুযায়ী পিতামাতা, ভাইবোন, পুত্র-কন্যা, মামা-পিসি, বোনপো বোনঝির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আবার একটা আশ্চর্য ঘটনারও পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁটি হাওয়াইয়ান পরিবারের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপে প্রচলিত সগোত্র ধারার রীতিমত গরমিল দেখা যায়। কারণ হাওয়াইয়ান সগোত্র ধারা অনুসারে ভাইবোনদের সমস্ত ছেলেমেয়ে, কোনরকমের

ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, সকলেই সকলের ভাইবোনরূপে গণ্য। আর এই সমস্ত ছেলেমেয়ে কেবলমাত্র তাদের মা আর মায়ের বোনদের কিংবা বাপ আর খুড়োদের ছেলেমেয়ে নয়, মাতা ও পিতা উভয়েরই ভাই ও বোন নির্বিশেষে সকলেরই সর্বজনীন ছেলেমেয়ে। এইভাবে যদি আমেরিকান সগোত্র জ্ঞাতি-সম্পর্ক-প্রথা আমেরিকার অধুনা-বিলুপ্ত প্রথার অস্তিত্ব ঘোষণা করে আর অমেরিকায় এই পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত হ'লেও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এর চলন দেখতে পাওয়া যায়, তাহ'লে কাজে কাজেই, হাওয়াইয়ান সগোত্র-প্রথা আরও সেকেলে পারিবারিক প্রথারই অস্তিত্ব ঘোষণা করে। যদিও পৃথিবীর কোনস্থানে এই প্রথা দেখতে পাওয়া যায় না তবুও একদিন **নিশ্চয়ই** এর অস্তিত্ব ছিল; অন্যথায় এর জুড়িদার সগোত্র প্রথা কখনই উদ্ভূত হতে পারতো না। মর্গ্যান বলেন, "পরিবার সক্রিয় নীতিরই প্রতীক। ইহা কখনও নিশ্চল নয়; সমাজের নীচু অবস্থা থেকে উঁচু অবস্থায় প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারও নিম্নতন স্তর থেকে ঊর্ধ্বতন স্তরে অগ্রসর হয়। ...পক্ষান্তরে সগোত্র বা শোণিত সম্পর্কের প্রথাগুলি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়; এগুলো দীর্ঘ সময় পরপর সমাজের অগ্রগতির রেকর্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন পরিবারের আমূল পরিবর্তন ঘটে, একমাত্র তখনই এই প্রথারও আমূল পরিবর্তন ঘটে।" † এ-সম্বন্ধে মার্কস্ বলেন, "আর রাজনৈতিক, আইনঘটিত, ধর্মসংক্রান্ত ও দার্শনিক প্রথাগুলোর বেলাতেও সাধারণভাবে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।" পরিবার-প্রথা ক্রমাগত চললেও সগোত্র-প্রথাগুলো অস্থিতে পরিণত হয়। আর লোক-প্রথায় পরিণত হ'য়ে সগোত্র-প্রথা অব্যাহত থাকলেও পরিবার-প্রথা ওকে অতিক্রম করে। যাই হোক প্যারির নিকটে প্রাপ্ত জীব-জন্তুর কঙ্কালে মার্সপিয়াল (marsupial) হাড়ের অস্তিত্ব দেখে কুভিয়ের (Cuvier) যেমন নিশ্চিতরূপে ঐ অঞ্চলে একদিন অধুনালুপ্ত মার্সপিয়াল জীব-জানোয়ারের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করতে পারেন, আমরাও তেমনি ঐতিহাসিকভাবে সঞ্চারিত কোন সগোত্র ধারার কোন লুপ্ত রূপটিকে থাকতে দেখে নিশ্চিন্তরূপে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পারিবারিক প্রথারও নিশ্চয়ই অস্তিত্ব ছিল।

আমরা এইমাত্র যে সমস্ত পারিবারিক ও সগোত্র ধারার কথা উল্লেখ করলাম, সে-গুলোর সঙ্গে বর্তমান যুগের পারিবারিক ও সগোত্র ধারার ঢের পার্থক্য। কারণ, ঐখানে প্রত্যেক সন্তানের একাধিক পিতা ও একাধিক মাতা

† মর্গ্যানের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৪৩৫ পৃঃ।

বর্তমান। হাওয়াইন পারিবারিক-প্রথার জুড়িদার আমেরিকান সগোত্র-প্রথায় ভাই ও বোন একই শিশুর মাতা ও পিতারূপে গণ্য হতে পারে না; পক্ষান্তরে, হাওয়াইয়ান সগোত্র-প্রথা এমন এক পারিবারিক-প্রথার সন্ধান বলে দেয়, যেখানে ইহাই ছিল সনাতনী রীতি। এখানে আমরা এমন-সব পারিবারিক প্রথার সন্ধান পাই, যে-গুলো এতদিন ধরে পরম সত্যরূপে গণ্য পারিবারিক প্রথাগুলোর বিপরীত-ধর্মী বলেই মনে হয়। প্রচলিত মতামত কেবলমাত্র এক-পতি-পত্নিত্বমূলক বিবাহ, আর ব্যক্তিগতভাবে পুরুষের বহুবিবাহ, আর এমন-কি, নারীদেরও ব্যক্তিগতভাবে বহু-স্বামিত্ব-প্রথার সন্ধান জানে। সমাজের কর্ণধার যে-সব বাধা-বিঘ্নের কথা উল্লেখ করে থাকে, বাস্তবিকপক্ষে লোকেরা তা শান্তচিত্তে ও সুস্থ শরীরে, নীতিবাগীশ গোঁড়াদের মতবাদ বলেই মেনে চলে। এই বাস্তব সত্যটা ঢেকে ফেলবার অপচেষ্টাই করা হয়। আদিম মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন সামাজিক পরিস্থিতির সন্ধান মিলে, যেখানে পুরুষ বহুবিবাহ, আর তাদের স্ত্রীর বহু-স্বামিত্বের (polyandry) সুযোগ-সুবিধা একই সময়ে, একইভাবে উপভোগ করে, আর তাদের ছেলেমেয়ে সকলের সর্বজনীন ছেলেমেয়েতেই পরিণত হয়। এই প্রাথমিক অবস্থাটা পরিবর্তনের সুদীর্ঘ ধারা ও উপধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত একপতি-পত্নিত্ব বা এক-বিবাহে এসে ঠেকে। এই সমস্ত পরিবর্তনের গতিটা বিবাহরূপ সাধারণ বন্ধনের দ্বারা সংবদ্ধ লোকজনের গণ্ডিটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর করে তোলে। প্রথমত এই গণ্ডি বা পরিধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। শেষপর্যন্ত ইহা মাত্র বিবাহিত-দম্পতিতে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এখন এরই আধিপত্য।

পরিবারের অতীত ইতিহাস এইভাবে আলোচনা করে গড়ে তোলবার সময় মর্গ্যান তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীদের সঙ্গে একমত হ'য়ে এমন একটি আদিম অবস্থার সন্ধান লাভ করেন, যে-অবস্থায় এক-একটি উপজাতির ভেতরে অবাধ-যৌন-সঙ্গম প্রচলিত ছিল অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর উপর প্রত্যেক পুরুষের সমান অধিকার আর প্রত্যেক পুরুষের উপরেও তেমনি প্রত্যেক নারীর সমান অধিকার বর্তমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এইরূপ আদিম অবস্থা সম্বন্ধে কত রকমের আলোচনাই না চলে আসছে, কিন্তু আলোচনা কেবলমাত্র কতকগুলা সাধারণ বুলির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাখোফোনই সর্বপ্রথম এইরূপ আদিম অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত-চিত্তে গবেষণায় ব্রতী হন এবং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় জনশ্রুতির মধ্যে এই অবস্থার চিহ্নগুলি খুঁজে বের করতে

চেষ্টা করেন। এ তাঁর একটা অন্যতম মস্ত বড় অবদান। বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি যে-সব হদিশের সন্ধান পান, তাতে তিনি মোটেই অবাধ-যৌন-সঙ্গমের সামাজিক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন নি ; এই অবস্থার বহু পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ যৌথ-বিবাহের (group marriage) স্তরেই নিয়ে গেছেন। অবাধ-যৌন-সঙ্গমের (Promiscuity) আদিম সামাজিক অবস্থা যদি কোনকালে ঘটেও থাকে, তাহ'লেও তা এত দূরবর্তী যুগে যে, অনগ্রসর অসভ্যজাতিদের ভিতরে তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করে আমরা সরাসরি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ আশা করতে পারি না। বাখোফোনের কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম এই সমস্যাটাকে আলোচনার অগ্রগণ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন।*

মানবজাতির যৌন-জীবনের এই প্রাথমিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলা পরবর্তী যুগের যেন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র লক্ষ্য, মানবতাকে এই দারুণ "লজ্জা" থেকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। এই রকম অবস্থার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে প্রাণীজগৎ থেকে তারা প্রমাণ-পত্রাদি সংগ্রহ ক'রে দেখায় ; কারণ, লাতুর্ণো (Letourneu) কর্তৃক সংগৃহীত বিবিধ ঘটনাবলীর (Evolution of Marriage and Family, 1889) অনুসরণ করে দেখা যায়, এমন কি, জীব-জানোয়ারের মধ্যেও যথেচ্ছ যৌনসঙ্গম ক্রমবিকাশের নিম্ন স্তরেরই পরিচায়ক। এই সব তথ্য থেকে আমি কিন্তু কেবল এই মাত্র সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মানুষ আর তার আদিম অবস্থা সম্পর্কে এই সব কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণীর দীর্ঘ সময়ের জন্য একত্র বসবাস দৈহিক কারণ বলে যুক্তিযুক্তভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মাদী পাখিগুলোর ডিমে তা দেওয়ার সময় নর পাখিগুলোর সাহায্যের দরকার হয় বলে উভয়ে একত্র বসবাস করে থাকে। কিন্তু পাখিদের মধ্যে বিশ্বস্ত একনিষ্ঠতার রেওয়াজ থেকে মানুষের সম্বন্ধে ওটা প্রয়োগ করা চলে না এই জন্যে যে, মানুষ পাখি থেকে জন্মলাভ করেনি। খাঁটি এক-বিবাহ যদি পরম ধর্ম বিবেচিত হয়, তা হলে বিষ্ঠার পোকাকেই সর্বোচ্চ সম্মানের ভাগী করতে হয়। এই পোকা ৫০টা থেকে

* বাখোফোন এই আদিম অবস্থাটা বর্ণনা করার সময় 'হেতেরে' (Hetaerism) শব্দটা ব্যবহার করেন। এতে বোঝা যায়, তাঁর নিজস্ব আবিষ্ক্রিয়া বা তাঁর কল্পনার কত অল্প অংশই না তিনি সমঝাতে পেরেছেন। কারণ গ্রীকরা যখন এই শব্দটা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে, তখন তারা এই শব্দটা বলতে অবিবাহিত পুরুষ বা এক-পতি-পত্নী প্রথার জীবনযাপনকারী পুরুষের সঙ্গে

১০০টা পর্যন্ত গিটের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত গিটে এই অদ্ভুত পোকার নিজের সঙ্গেই নিজের সঙ্গম চলছে দিনরাত ধরে। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করলে আমার যৌন-জীবনের অশেষ রূপ দেখতে পাই : অবাধ-যৌন-সঙ্গম, একটা দলের সঙ্গে আর একটা দলের বিবাহ, বহু-বিবাহ, এক-বিবাহ ইত্যাদি সকল রকমের বিয়েই চোখে পড়ে। অভাব একমাত্র বহু-স্বামিত্বের। কেবলমাত্র মানুষের পক্ষেই এই প্রথা অবলম্বন সম্ভব। মানবজাতির নিকট আত্মীয় চতুর্ভুজ (বানরদের) মধ্যে আমরা যৌন-সংসর্গের সমস্ত রীতিই দেখতে পাই। বানরদের মধ্যে অ্যানথ্রপয়েডদের সঙ্গে মানুষের আরও বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মাত্র চারশ্রেণীর অ্যানথপয়েড্‌দের [যৌন-সংসর্গ] সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে দেখা যাক অবস্থা কেমন দাঁড়ায়। [ফরাসী পণ্ডিত] লাতুর্নো এদের কখনও কখনও এক-বিবাহের সমর্থক আবার কখনও বা বহু-বিবাহের সমর্থক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আবার জিরো তুলোঁ কর্তৃক উদ্ধৃত সোসিৎরে এদের খাঁটি এক-পত্নী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে মনুষ্যাকৃতি জীবদের মধ্যে দৃষ্ট এক-পত্নিত্ব সম্বন্ধে ওয়েস্টারমার্ক তাঁর "মানবজাতির বিবাহের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে যে-সমস্ত যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশ করেন, তাতে তেমন কোন-কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায় না। মোটের উপর, আমাদের নজীর ও প্রমাণপত্রাদির অবস্থা দেখে লাতুর্নো খোলাখুলি-ভাবেই স্বীকার করেন, "স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে যৌন-সংসর্গের কোন সম্পর্কই নেই" [ফরাসী পণ্ডিত] এস্পিনাসও তাঁর (Animal Societies, 1877 বা পশু-সমাজ) নামক গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন—যূথই পশুদের সেরা সমাজ-সঙ্ঘ ; আপাতদৃষ্টিতে যূথ কতকগুলো পরিবারের সমষ্টি বলে মনে হলেও এ দুটোর মধ্যে চির-সঙ্ঘাত বিদ্যমান, দু'টোর ক্রমবিকাশের ধারা চলে বিপরীত দিকে।"

অবিবাহিত নারীর যৌন-সম্পর্ক মনে করেছেন। ইহা নির্দিষ্ট রকমের বিবাহ-প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে তার বাইরের যৌন-সম্মেলনই বুঝিয়েছে। অন্তত বেশ্যাবৃত্তির সম্ভাবনাকে এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকবে। শব্দটি অপর কোন অর্থেই ব্যবহৃত হয় নি ; আমিও মর্গ্যানের সঙ্গে একমত হয়ে শব্দটি এইভাবেই ব্যবহার করেছি। মানবজাতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পথে জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর পরিবর্তে সমসাময়িক ধর্মীয় ভাব-ধারা থেকেই নর-নারীর সম্পর্ক স্থির হয়, বাখোফোন এই অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী। তাই তিনি তাঁর অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্ক্রিয়ার সর্বত্র বিশ্বাসের অযোগ্য তত্ত্বকথাসমূহের অবতারণা করে ধোঁয়ার রাজ্যেরই সৃষ্টি করেন।

উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মানবাকৃতিবিশিষ্ট জীব (Anthropoid) বানরদের পরিবার ও অন্যান্য দলগতজীবন সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকপক্ষে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারি না। সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর-বিরোধী। এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। অ-সভ্য বা "স্যাভেজ" উপজাতিদের সম্পর্কিত আমাদের হাতের নজির প্রমাণগুলোও পরস্পর-বিরোধী। এই সব নজির খুব তন্নতন্ন করে দেখা দরকার। মানব সমাজের তুলনায় বানরদের সমাজগুলোর স্বরূপ ঠিক করা আরও বেশি কঠিন। এই সমস্ত অনির্ভরযোগ্য রিপোর্টাদি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত করা হয় আপাতত আমাদের সেই সমস্ত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে চল্‌তে হ'বে।

তবে এস্পিনাসের কেতাব থেকে উপরে উদ্ধৃত বাক্যটা নিয়ে আলোচনার সূচনা করা যেতে পারে। উচ্চতর জীব-জানোয়ারগুলোর মধ্যে যূথ আর পরিবার পরস্পরের পরিপূরক নয়; যূথের সঙ্গে পরিবারের পরস্পর-বিরোধী সম্বন্ধ। যৌন-সংসর্গের ঋতুতে পুরুষদের হিংসা কিভাবে যূথ-বন্ধন শিথিল করে, এমন কি সাময়িকভাবে ছিন্ন করেও ফেলে এস্পিনাস তা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই দেখিয়েছেন। "পারিবারিক বন্ধন যখন নিবিড় থাকে তখন কালেভদ্রেও যূথ বা দল গড়ে উঠবার অবসর পায় না। আবার যখন অবাধ-যৌন-সংসর্গ বা বহু-বিবাহের রেওয়াজ চলে তখন যূথ আপনা-আপনি গ'ড়ে উঠে। ...যূথ গঠনের পূর্বে পারিবারিক বন্ধনগুলো অবশ্যই শিথিল করার দরকার, আর ব্যক্তিকেও তখন অনেকটা স্বাধীনভাবে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দিতে হয়। এইজন্য পাখিদের প্রায়ই সঙ্ঘবদ্ধ যূথ বা ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায় না। ...অপর পক্ষে যেহেতু স্তন্যপায়ীদের ভিতর ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলতে হয় না, তাই তাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর সঙ্ঘবদ্ধ যূথের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।...প্রাথমিক গঠনের সময় পরিবারের ভাব-ধারণা যূথের ভাব-ধারণার ঘোরতর পরিপন্থী বিবেচিত হয়। আমাদের নিঃসঙ্কোচেই বলা দরকার; পরিবারের চেয়ে উন্নততর কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যদি উদ্ভূত হয়েও থাকে, তাহ'লেও তা একমাত্র এই কারণবশত সম্ভব হয়ে থাক্‌বে যে, এর ভেতর এমন-সব পরিবার ছিল, যেগুলোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ঠিক এই কারণবশত এরূপ সম্ভাবনাকেও বাদ দেওয়া যায় না যে, এই সমস্ত পরিবার পরে, বহু গুণে শ্রেয় পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করতে পেরেছে। (Espinas *op. cit.*, Ch. 1.

quoted by Giraud-Teulon—Origin of Marriage and Family, 1884, pp. 518-20).

এখানে আমার মনে হয় যে, মানব-সমাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের বেলায় অবশ্য পশু-সমাজগুলো কিছুটা কার্যকরী ; কিন্তু এই মূল্য বা কার্যকারিতাও নেতি-বাচক ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-পর্যন্ত যে সব প্রমাণ-পত্র পাওয়া গেল, তাতে দেখা যায় যে, উচ্চতর শ্রেণীর মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগুলোর মধ্যে বহুপত্নিক অথবা কেবলমাত্র স্ত্রী ও পুরুষের জোট—এই দু'রকমের পরিবার দেখা যায়। এই দুই পরিবারেই কেবলমাত্র একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, একজন মাত্র স্বামীর স্থান আছে। পুরুষের হিংসা পরিবারের বন্ধন ও সীমা উভয়েরই প্রতীক। এই হিংসা পশু-পরিবারপ্রথাকে যূথ-বিরোধী করে তোলে। [এই] পুরুষ জানোয়ারদের হিংসা উচ্চতর সমাজ-জীবনে যূথ-গঠনের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে, ইহা যৌথ-জীবনকে দুর্বল করে অথবা যৌন-সংসর্গের ঋতুতে যূথকে একেবারে ভেঙে-চুরে ফেলে ; অন্তত, ইহা যূথের ক্রমবিকাশ ব্যাহত করে। এতেই বেশ বোঝা যায় যে, পশু-পরিবারগুলোর সঙ্গে আদিম মানবসমাজের কোন দিক দিয়েই মিল ছিল না ; প্রাণী-জগতে আদিম মানুষের যখন প্রথম অভ্যুদয় ও অগ্রগতি শুরু হয় তখন তাদের পরিবার বলে কোন বস্তুই ছিল না, আর থাক্‌লেও সেই ধরণের পরিবার জানোয়ারদের মধ্যে কোন দিনই ছিল না। প্রাথমিক সৃজনের সময় মানুষ সংখ্যায় ছিল নিতান্ত অল্প, আর তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না আদৌ। নেহাত পশুসুলভ নীতিরই অনুসরণ করলে মানুষ উন্নততর দলগত জীবন যাপনের অবসর না পেয়ে তাকে মাত্র একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষের দাম্পত্যজীবন যাপন করে বিচ্ছিন্নভাবেই কঠোর জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হ'তে হ'তো। ওয়েস্টারমার্ক শিকারীদের বিবরণী থেকে গরিলা আর শিম্পাঞ্জীদের এইরকম জীবন-যাত্রার পরিচয়ই প্রদান করেন। প্রকৃতি-রাণীর অগ্রগতির সর্বোচ্চ ধাপ, পশু-জীবন থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের জন্যে আরও কিছু মৌলিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় : যূথের সহযোগিতা ও সমবেত শক্তিদ্বারা ব্যক্তির আত্মরক্ষাশক্তির অভাব বা ঘাটতির পূরণ করা। অন্যথায় "অ্যান্‌থ্রপয়েড" বানরকে আজ আমরা যে অবস্থার ভিতর বাস করতে দেখ্‌তে পাই সেই পরিস্থিতির মধ্য থেকে মানব স্তরে অভ্যুদয় কোন্-মতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে হয় যেন, এই সব বানর ক্রমবিকাশের পথ থেকে ছিট্‌কে পড়েছে অর্থাৎ বিপথগামী হয়ে মরণ পথের যাত্রী হয়েছে বা অবনত হ'য়ে পড়েছে। বানর-সমাজ-ব্যবস্থা থেকে আদিম মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে

মতবাদ প্রচারের যেসব চেষ্টা-চরিত্র করা হয়, তা এই গুরুত্বপূর্ণ নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলা যেতে পারে। বানর সমাজ বা অপরাপর পশুযূথের তুলনায় বৃহত্তর ও স্থায়ী দলের ভিতরেই জানোয়ারদের পক্ষে মানুষে পরিণতি লাভ সম্ভব। একমাত্র পরিণতবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও হিংসা বর্জনের উপরেই এই ধরণের দল গড়া সম্ভব হ'তে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য, যার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব রীতিমতভাবে প্রমাণ করা যায়, যার দু-একটা দৃষ্টান্ত এখনও পৃথিবীর দু'একটা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় এরূপ প্রাচীনতম ও আদিমতম মানব-পরিবারের বাস্তব গড়ন কেমন? যৌথ-বিবাহই এই সর্বাপেক্ষা আদিম পরিবারের বিশেষত্ব। এই ধরণের পরিবারে দলের সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত নারী পরস্পরের ভোগ্য ও ভোগ্যারূপে বিবেচিত। এই ধরণের পরিবারে হিংসার কোনই স্থান নেই। এই আদিম পরিবারের ক্রমবিকাশের এক পরবর্তী স্তরে আমরা অন্যান্য সাধারণ বহু-স্বামিত্বের প্রচলন দেখ্‌তে পাই। এই প্রথা হিংসাপ্রবণতার মূলে কুঠারাঘাত করে; কাজেই, ইহা জানোয়ারের রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তু। যত প্রকারের যৌথ-বিবাহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সবগুলির মধ্যেই এই রকম জটিল নিয়ম পাওয়া যায়। কাজেই, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম যুগে যে সহজতর যৌন-সংসর্গের অস্তিত্ব ছিল, তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মোটের উপর, যৌথ-বিবাহের গোড়ার স্তরে অবাধ-যৌন-সংসর্গই প্রচলিত ছিল; আর ঠিক সেই অবস্থাতেই সৃষ্টির ধারা জানোয়ার থেকে মানবতার ধাপে পা ফেলে।

তাহলে অবাধ-যৌন-সংসর্গ কাকে বলে? এর অর্থ—এখনকার ও তৎপূর্ব-যুগে প্রচলিত বাধা-নিষেধগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। হিংসাগত বাধারও পতন আমরা দেখেছি। হিংসা-বোধটা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে বিকাশ লাভ করেছে। "ইনসেস্টের" বেলায়ও এ-ধারণা খাটে। আগে ভাই-বোনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ত ছিলই, এমন-কি, মা-বাপের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের যৌন-সংসর্গ বর্তমানেও বহু জাতের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। ব্যাংক্রফট্ (**উত্তর-আমেরিকার প্যাসিফিক স্টেটগুলির আদিম জাতিসমূহ, ১৮৭৫, প্রথম খণ্ড**) বেরিং প্রণালীর নিকট কাভিয়াটজাতি, আলস্কার নিকটে কাদিয়াক, এবং বৃটিশ উত্তর-আমেরিকার ভিতরের দিকে তিন্নেদের মধ্যে এই ধরণের প্রথা আবিষ্কার করেন। লাতুর্নোও চিপ্পেওয়ে ইণ্ডিয়ান, চিলি দেশের কুকু, কারিবিয়ান জনপদের অধিবাসী ও (ইন্দো-চীনের) কারেনদের মধ্যে একইরূপ বিবরণী সংগ্রহ করেন; আর প্রাচীন

যুগের গ্রীক আর রোমানরা পার্থিয়ান, পারসিক, সিথিয়ান, হুন ইত্যাদি জাতিদের নিয়ে যে-সব বিবরণ লিখে গিয়েছেন তার উল্লেখ নাই করলাম। "ইনসেস্ট" বা অগম্যাগমন উদ্ভাবনার আগে (এ একটি উদ্ভাবনা এবং বিশেষ মূল্যবান উদ্ভাবনা।) দু' পুরুষের নর-নারীর মধ্যে যৌন-সংসর্গ ঘটলে আজকাল সেরা সঙ্কীর্ণমনা (Philistine) দেশগুলোতেও পাঁচজনের মনে যেমন ধারণার উদ্রেক হয়, জনকজননীর সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসংসর্গ ঘটলে বড়জোর ততটুকু বিরুদ্ধ-ধারণার সৃষ্টি করতো; বাস্তবিকপক্ষে, ষাট বছরেরও অধিক বয়স্কা ধনী "বুড়ী কুমারীরা"ও তিরিশ বছরের ছোকরাদের প্রায়ই বিয়ে করছে। বর্তমান যুগের মানুষ ইন্‌সেস্ট বল্‌তে যা বোঝে প্রাচীন যুগের মানুষ সে-সম্বন্ধে উল্টো ধ্যান-ধারণার বশবর্তী ছিল। এই ধ্যান-ধারণার কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা মান্ধাতার আমলের পারিবারিক প্রথা নিয়ে আলোচনা চালাই, তা হ'লে আমরা ঐ যুগের যৌন-সংসর্গকে অবাধ-যৌন-সংসর্গ আখ্যা প্রদান করতেই বাধ্য হ'ব। অবাধ এই হিসাবে যে পরে প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির বিধিনিষেধগুলোর অস্তিত্ব ছিল না মোটেই। তাই বলে এথেকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে বেপরোয়া সমবেত যৌন-সংসর্গ চল্‌তো, অবাধ-যৌন-সংসর্গ বলতে তেমন কোন ব্যবস্থার কথা বুঝায় না। একজন পুরুষ একজন নারীর কিছুদিনের জন্যে একত্রে সহবাস যে প্রায়ই ঘটতো না তা নয়। বস্তুত, আজকাল দলগত বিবাহের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা এই রকমই দেখা যায়। সর্বশেষে ওয়েস্টারমার্ক এইরূপ আদিম অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে সন্তান জন্মের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত নর ও নারীর যৌন-সম্পর্কমাত্রকেই বিবাহ আখ্যা প্রদান করেন। তাঁর নিকট আমাদের বক্তব্য, অবাধ-যৌন-সংসর্গের আমলে অবাধ-যৌন-সংসর্গ নীতির কোনরকম খেলাপ না ক'রে অর্থাৎ যৌন-সংসর্গ সম্পর্কে কোনরূপ বাধা-নিষেধের ব্যবস্থার অবর্তমানেও এই ধরণের বিয়ে অক্লেশেই ঘটতে পারত। ওয়েস্টারমার্কের আরও একটা ত্রুটি এই যে, "অবাধ-যৌন-সংসর্গ ব্যক্তিগত ঝোঁক বা প্রবৃত্তিগুলোকে পিষে মেরে ফেলেছে।"—এই মতবাদ থেকেই তিনি আলোচনা শুরু করেন। সেইজন্য তিনি অবাধ-যৌন-সংসর্গকে বেশ্যাবৃত্তিরই নামান্তর বলে মনে করেন। আমার মতে, মান্ধাতার আমলের সমাজ-ব্যবস্থাকে যারা বেশ্যাবৃত্তির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, তারা কোনদিনই এই সমাজকে বুঝতে পারবে না। দলগত-বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আমরা আবার এ নিয়ে আলোচনা করবো।

মর্গ্যানের মতে, সম্ভবত মান্ধাতার আমলে এই অবাধ-যৌন-সংসর্গ থেকেই সুদূর অতীতে উৎপন্ন হয়ঃ

(১) একবংশজাত পরিবার ; পরিবারের প্রথম স্তর।

এখানে বিয়ের দল [বা বর-কনেরা] এক এক পুরুষে বিন্যস্ত : পরিবারের চৌহদ্দির ভেতরে ঠাকুর্দা ঠানদিরা সকলেই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী, তাঁদের ছেলেমেয়ে অর্থাৎ জনক-জননীদের মধ্যেও এই ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান। তারপর তৃতীয় পুরুষে নাতি-নাতনীর দল, ওরাও পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী, এদের ছেলেমেয়ে অর্থাৎ প্রথম পুরুষের প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা পর্যায়ক্রমে চতুর্থ পুরুষের বর আর কনের দল সৃষ্টি করে। এই বৈবাহিক প্রথায়, কেবলমাত্র বাপমা আর ছেলেমেয়ে তথা পূর্বপুরুষ আর বংশধরদের পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য অধিকার ও বাধ্যবাধকতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভাই-বোন ১ম, ২য় এবং আরো দূর পুরুষের জ্যাঠতুত, খুড়তুত মাসতুত, পিসতুত, মামাতো ইত্যাদি সম্পর্কের ভাইবোনেরাও পরস্পর পরস্পরের ভাইবোন ; **ঠিক সেই হিসাবে** এরাও পরস্পরের স্বামী এবং স্ত্রীও বটে ; সমাজের এই স্তরে ভাই আর বোনের সম্পর্কের মধ্যেও যৌন-সংসর্গ ছিল অপরিহার্য ঘটনা বিশেষ। (১)মাত্র এক জোড়া

(১) "নিবেলুঙের" পুরাণ অবলম্বনে গীতিনাট্য রচনায় ওয়েগ্‌নার মান্ধাতার আমলের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ভুল অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, মার্ক্‌স্ ১৮৮২ সনের বসন্তকালে লিখিত এক পত্রে তার কঠোর সমালোচনা করেন। ওয়েগনার লিখেন—"ভাই বোনকে স্ত্রী বলে আলিঙ্গন করে, একি কখনও কেউ শুনেছে ?" আধুনিক যুগের রুচিবাগীশদের অনুযায়ী এই উক্তির উত্তরস্বরূপ মার্ক্‌স্ ওয়েগ্‌নার আর তাঁর কামুক দেবতাদের লক্ষ্য করে বলেন—"মান্ধাতার আমলে বোনই ছিল ভাইয়ের পত্নী ; আর **এই সম্পর্ক ছিল রীতিমত নীতি-সম্মত**"

(চতুর্থ সংস্করণে) আমার জনৈক ওয়েগ্‌নার-ভক্ত ফরাসী বন্ধু মার্ক্‌সের বিরুদ্ধ-সমালোচনা ক'রে বলেন—"এগিস্‌ড্রেথা নামক পুরাণে লোকী ফ্রেয়াকে তিরস্কার করে বলছেন—'দেবতাদের চোখের সামনে নিজের ভাইকে আলিঙ্গন করলি ?" এ-থেকে তিনি যুক্তি বের করেন, পুরাণের আমলের অনেক আগেই ভাইয়ে-বোনে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই আমলে পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসও ভেঙ্গে গিয়েছে। "এগিস্‌ড্রেথা" তারই নিদর্শন, দেবতাদের বিদ্রূপ করবার জন্যই এগিস্‌ড্রেথা পুরাণ লিখিত হয়। লোকী যদি সত্যসত্যই ফ্রেয়াকে তিরস্কারই করে থাকেন তাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এগিস্‌ড্রেথার যুগে ভাইয়ে-বোনে বিয়ে নিষিদ্ধ হ'লেও পূর্ববর্তী যুগে প্রথাটার চলন ছিল। প্রাচীনতর সমাজের প্রথাটা অপেক্ষাকৃত নবীনতর যুগের পুরাণে নিন্দিত হয়েছে। ওয়েগ্‌নার এই প্রাচীনতর সমাজের নিয়মটা বুঝতে না পেরে গোলে পড়েন। এগিস্‌ড্রেথা পুরাণে আরও ভাই বোনের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরাণের শেষের দিকে লোকী নিয়োরকে তিরস্কার করে

নর-নারীর বংশধরদের নিয়েই এক-একটা পরিবারের উৎপত্তি ঘটে। এই বংশধরের বংশধরেরা প্রত্যেক পুরুষে পরস্পরের ভাই ও বোন, ঠিক ঐ কারণেই তারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হ'তো। এইভাবে যৌথ-বিবাহ পরম্পরায় বংশগত পরিবারের উৎপত্তি।

বংশগত পরিবার-প্রথা লোপ পেয়েছে। ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে আদিম জাতিদের মধ্যেও এই প্রথার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবুও এই প্রথার একদিন যে **নিশ্চয়ই** প্রচলন ছিল তা স্বীকার করতে হয় এই কারণে যে, পলিনেসিয়ার সর্বত্র হাওয়াই সমাজে বংশগত পরিবার-প্রথার রেওয়াজ এখনও চলিত রয়েছে। এই আত্মীয়তা-জ্ঞানের যে সমস্ত প্রকারভেদ ও মাত্রার রকমারি দেখতে পাওয়া যায়, তা নিশ্চয়ই এই ধরণের পারিবারিক প্রথা থেকেই উদ্ভূত হয়।

(২) পুনালুয়া পরিবার

মানব পরিবারের অগ্রগতির প্রথম ধাপে যদি বাপ-মার সঙ্গে ছেলে-মেয়ের যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় ধাপে ভাই-বোনের যৌন-সংসর্গের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয়েছে। ভাই-বোনের মধ্যে বয়সের অধিকতর সাদৃশ্য বশত দ্বিতীয় ধাপের অগ্রগতিটা অনেক বেশি মূল্যবান, আর প্রথম ধাপের তুলনায় এটা ঢের বেশি কঠিনও বটে। এই সমস্ত কার্যে পরিণত করা হয়েছে ক্রমে ক্রমে। প্রথমত দু'একটা পরিবারে ভাই-বোনেদের (অর্থাৎ এক মায়ের পেটের ছেলে-মেয়ে) যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ক্রমে তা সাধারণ দস্তুরে পরিণত হয় (উনবিংশ শতাব্দীর হাওয়াই সমাজে ক্ষেত্র-বিশেষে এর ব্যতিক্রমও ঘটতে দেখা যায়)। ক্রমে খুড়তুত, মাসতুত প্রভৃতি ভাই-সম্পর্কের পুরুষদের সঙ্গে এই সমস্ত ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর বোনেদের বিয়েও নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়। মর্গ্যানের মতে, এই বিধি-নিষেধ "প্রাকৃতিক নির্বাচন

বলছেন—"তুমি তোমার বোনের গর্ভে এই সন্তান উৎপন্ন করেছ।" নিয়োর অস দেশের লোক নয়, ভন দেশের অধিবাসী; ভন দেশে ভাইয়ে বোনে বিয়ে প্রচলিত ছিল, অস দেশে প্রথাটি নিষিদ্ধ। ভন শ্রেণীর দেবতাদের তুলনায় অসরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক; নিয়োর ভন শ্রেণীর দেবতা হ'য়ে অসদের সঙ্গে বাস করতে এসে এইরূপ ফ্যাসাদে পড়েছেন। কবি গ্যেটেও ওয়েগ্নারের মত ভুল করেন। তাঁর বায়াডের নামক কাব্যে তিনি দেবদাসীদের বেশ্যাদের সামিল মনে করেন।

প্রক্রিয়ার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।" যে সমস্ত উপজাতির মধ্যে এই অগ্রগতির ফলে এক বংশের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সন্তানোৎপাদনের বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করা হয় সেই উপজাতিগুলি অপরাপর উপজাতি অর্থাৎ যে-গুলোর মধ্যে কেবল মাত্র ভাই-বোনের মধ্যেই যৌন-সংসর্গ আইন ও দস্তুর সেইগুলোর তুলনায় দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির ফল কিরূপ প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা এই প্রথা থেকে সরাসরি উদ্ভূত গোষ্ঠীনামক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা যায়। [যৌন-সংসর্গের বাধা-নিষেধগুলো থেকে উদ্ভূত হ'লেও] এই প্রতিষ্ঠান ঐ প্রগতিকে বহু দূর অতিক্রম করে যায়। ইহা জেন্‌স বা গোষ্ঠী-প্রথা নামে অভিহিত, পৃথিবীর সমস্ত না হ'লেও, অধিকাংশ বর্বর-জাতিরই সামাজিক ভিত্তি। প্রাচীন গ্রীস ও রোম এই গোষ্ঠী-প্রথারই স্তর ছেড়ে সরাসরি সর্বপ্রথম সভ্যতা বা উৎকর্ষের যুগে প্রবেশ করে।

বড় জোর কয়েক পুরুষ চলার পর প্রত্যেক আদিম পরিবারই বহুধা-বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। বর্বর অবস্থার মধ্য-স্তরের শেষ সীমানা পর্যন্ত সর্বত্র আদিম সাম্যবাদী সাধারণ (communistic) পরিবারে বসবাস সর্বজনীন রীতি হ'লেও পরিবারের সর্বোচ্চ সাইজ বা আকারের সীমারেখা নির্ধারিত হয়। অবস্থাভেদে কিছু তারতম্য বা প্রকারভেদ ঘটলেও প্রত্যেক অঞ্চলে দস্তুরটা মোটামুটি একইরূপ দাঁড়িয়ে যায়। একই মায়ের গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে যৌন-সংস্রব অশোভন,—যখন এই ধারণার উৎপত্তি হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহা ঐরূপ প্রাচীন দলবিভাগের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, ঐ সমস্ত বহুধা-বিভক্ত হয়ে নতুন নতুন পরিবারের সৃষ্টি হয়। (যার পরিবারভুক্ত দলের সঙ্গে অবশ্য কোন মিল নেই) দলের বোন পর্যায়ের এক বা একাধিক মেয়েরা মিলে এক-একটা পরিবারের কেন্দ্র পত্তন করে; তেমনি তাদের মামুলী ভাইয়েরাও নতুন নতুন পরিবারের কেন্দ্র সৃষ্টি করতে থাকে। বংশগত (শোণিত-সম্পর্কগত) পরিবার থেকে মর্গ্যান কথিত পুনালুয়া পরিবারেরও এইভাবে কিংবা অনুরূপভাবেই উৎপত্তি ঘটে থাক্‌বে। হাওয়াই সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে, মামুলী কিংবা সগোত্রের (অর্থাৎ মাসতুতো, পিসতুতো, খুড়তুতো ইত্যাদি) বোনেরা সকলেই তাদের যৌথ-স্বামীদের যৌথ-পত্নীরূপে গণ্য। এই স্বামীর দল থেকে তাদের ভাইদের বিচ্যুত করা হয়। এই সব স্বামীরা আর পরস্পরের ভাই নয়; কাজেই তারা পরস্পরকে ভাই বলে সম্বোধন করে না। পরস্পরকে ডাকে **পুনালুয়া** অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সহচর বা অংশীদার। তেমনি মামুলী বা সগোত্র ভাইরা কতকগুলো

মেয়েকে যৌথ-পত্নীরূপে গ্রহণ করে। তারা পরস্পরের বোন নয়; সেইজন্য এরাও পরস্পরকে **পুনালুয়া** বলে সম্বোধন করে। মানব-পরিবারের এই হল সনাতনী কাঠামো; পরে অনেক-কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং তার মূল বিশেষত্বগুলো অটুট অবস্থাতেই থাকে। এই বিশেষত্বগুলো হচ্ছে এই: নির্দিষ্ট পারিবারিক গণ্ডির ভেতরে স্বামী আর স্ত্রীরা ছিল পরস্পর পরস্পরের যৌথ স্বামী বা স্ত্রী। এই স্বামীর দল থেকে প্রথমত স্ত্রীদের মামুলী ভাইদের, পরে সগোত্র ভাইদের বহিষ্কৃত করা হয়; অপরপক্ষে, স্বামীদের বোনদেরও স্ত্রীর দল থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়।

আমেরিকান প্রথার মধ্যে শোণিত-সম্পর্কের যে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রি বা ক্রমের নির্ভুল সূক্ষ্ম পরিচয় পাওয়া যায় এই পারিবারিক প্রথাতেও রক্তগত সম্পর্কের তেমনি সূক্ষ্ম প্রকার ক্রমের পরিচয় আমরা পাই। আমার বাবার ভাইদের ছেলে-মেয়েরা যে-ভাবে তাঁরও ছেলেমেয়েরূপে গণ্য, আমার মায়ের বোনদের ছেলে-মেয়েরাও তেমনি এখনও তাঁর ছেলে-মেয়ে; কাজেই, তাদের সকলেই আমার ভাই ও বোন; কিন্তু আমার মায়ের ভাইদের ছেলেমেয়েরা এখন মার ভাইপো ও ভাইঝি, আর বাবার বোনদের ছেলে-মেয়েরা বাবার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী; আর এরা সকলেই আমার মামাতো বা পিসতুতো ভাই-বোন। আমার মায়ের বোনদের স্বামীরা যেমন এখনও মার স্বামী আর আমার বাবার ভাইদের স্ত্রীরাও তেমনি আমার পিতার পত্নীরূপে গণ্য হলেও অধিকার বলে, বাস্তবিকপক্ষে সকল সময়, এরূপ নাও ঘটতে পারে। ভাই আর বোনদের মধ্যে যৌন-সংসর্গের বিরুদ্ধে সামাজিক নিষেধ জারির ফলে, প্রথম শ্রেণীর সম্পর্কের ভাই-বোনরা এতদিন নির্বিচারে ভাই-বোনরূপে গণ্য হ'য়ে এলেও তারা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে: এক শ্রেণীতে কতক পূর্বের মতই সগোত্র ভাই ও বোনে পরিণত; কিন্তু অপর শ্রেণীতে, একপক্ষে, ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা এবং অপরপক্ষে বোনের ছেলে-মেয়েরা আর ভাই-বোনরূপে গণ্য হ'তে **পারে না**। কারণ তাদের আর একই বাপ-মা—বাবা বা মা বা উভয়ই আর থাকতে পারে না; কাজেই সর্বপ্রথম ভাইপো ও ভাইঝি বা ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী ও এবং খুড়তুত, পিসতুতো, মামাত, মাসতুতো ভাই-বোনের ভাবধারার সৃষ্টি হয়। প্রাচীনতম যুগের পরিবারে এরূপ সম্পর্ক অর্থহীন বলেই গণ্য হ'তো। যে-কোন ধরণের ব্যক্তিগত বিবাহ-প্রথার উপর দণ্ডায়মান যে-কোন পারিবারিক-প্রথার কাছে আমেরিকার রক্তগত সম্পর্ক-প্রথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে বিবেচিত হলেও এ সব-কিছু খুঁটি-নাটির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আর প্রাকৃতিক ভিত্তিমূল পুনালুয়া পরিবারের ভেতরে পাওয়া

যাবে। বংশগত পারিবারিক-প্রথার মতই পুনালুয়া বা এর জুড়িদার প্রথাগুলো একদিন পৃথিবীর সর্বত্র একই পরিমাণে অন্তত প্রচলিত ছিল।

হাওয়াই দ্বীপে এই ধরণের পারিবারিক-প্রথার অস্তিত্বের রীতিমত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশিয়ার সর্বত্র এতদসম্পর্কে প্রমাণ-পত্রাদি অনায়াসেই পাওয়া যেত; কিন্তু ধর্মের বাতিকগ্রস্ত মিসনারী প্রভুরা যদি স্পেনীয় প্রাক্তন মোহান্তদের মত অ-খৃস্টীয় রীতিনীতির ভেতরে "বীভৎস"* দুর্নীতির বাইরের কিছু লক্ষ্য করতে সমর্থ হতেন। যখন সিজার বৃটিশ জাতির বিবরণী লিখেন বৃটনরা তখন "বর্বর" যুগের মাঝামাঝি অবস্থায়। "তারা দশ বার জন একত্রে কয়েকটি মেয়েকে বিয়ে করে যৌথ স্ত্রীরূপে নিয়ে বসবাস করত। পুরুষদের ভেতর ভাই পর্যায়ের লোক থাকতো। এমন-কি, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত এই অবাধ-যৌন-সংসর্গযুক্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাক্তো।" দলগত বিয়েরূপে এই সামাজিক ব্যবস্থার অনায়াসেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বর্বর যুগের জননীর গর্ভজাত আট-দশটা ছেলে একসঙ্গে একাধিক নারীকে যৌথ-স্ত্রীরূপে রাখার উপযুক্ত বয়স পায় না। কিন্তু পুনালুয়া প্রথার জুড়িদার আমেরিকান বংশগত পারিবারিক প্রথায় বহু ভ্রাতার অস্তিত্ব ধারণা করা যেতে পারে। কারণ মামাতো, মাসতুত, পিসতুত, খুড়তুত ভাইয়েরা আপন ভাইয়ের পর্যায়-ভুক্ত। সিজারের ছেলে-পুলে সহ বাপ-মার কথাপ্রসঙ্গে বুঝা যায়, তিনি বৃটনদের সামাজিক অবস্থাটা ঠিক বুঝ্‌তে পারেন নি। এই সামাজিক প্রথায় বাপ ও ছেলে, মা ও মেয়ের একই বিবাহ-দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব না হ'লেও বাপ ও মেয়ে, মা ও ছেলে কোন মতেই ওর অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। হেরোদোতাস এবং আরও বহু প্রাচীন যুগের লেখকরা "অ-সভ্য" ও "বর্বর" যুগের যৌথ-পত্নী-প্রথা সম্বন্ধে যে-সব বিবরণী রেখে গেছেন, পূর্বোক্ত বা ওর জুড়িদার দলগত বিয়ের সাহায্যে সেই সব যৌথ-পত্নিত্বের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ওয়াটসন এবং কে ভারতের অধিবাসী

---

* অবাধ-যৌন-সংসর্গ বাখোফোনের তথাকথিত "কাদার ভেতরের আগাছাদের আপনা-আপনি জন্মের" নিদর্শন যে আমাদের দলগত বিয়ের দিকে নিয়ে যায় সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কাল্‌ মার্কস্‌ এর উত্তরে বলেন: "বাখোফোন যদি পুনালুয়া বিয়েকে "বে-আইনী" মনে করেন, তাহ'লে, ঐ যুগের লোকেরাও আজকালকার যুগে প্রচলিত নিকট ও দূর-সম্পর্কীয় মাসতুত, মামাত, খুড়তুত, পিসতুত ভাইবোনের মধ্যে বিয়েকে ইনসেষ্ট অর্থাৎ সমরক্তজ ভাই-বোনদের সহিত বিয়ে বলে অনায়াসেই ঘৃণায় নাক সিট্‌কাতে পারে।"

নামক পুস্তকে (†) (গঙ্গার উত্তরে) অযোধ্যায় টিকুর জাতির সম্বন্ধে যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন সে সম্বন্ধেও একই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক বড় বড় পরিবারে (যৌন-সংসর্গ সম্পর্কে প্রায় কোন রকম বাচ-বিচার না ক'রে) নর ও নারী একত্রে বসবাস করে। দু'জন যখন বিবাহিত বলে গণ্য হয় তখন তাদের মধ্যেকার বন্ধন নামমাত্র।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনালুয়া পরিবার থেকে সরাসরি **গোষ্ঠী**-প্রথা উদ্ভূত হয়। অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণী-পদ্ধতি নিয়েও (classification system) নিঃসন্দেহে আলোচনা শুরু করা যায়। অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে জেন্টিস (gentes) রয়েছে, কিন্তু পুনালুয়া পরিবার নেই; তৎপরিবর্তে আরও সেকেলে ধরণের দলগত বিবাহ-প্রথার রেওয়াজ রয়েছে।

সকল রকমের দলগত পারিবারিক প্রথায়ই সন্তানের বাপ-নির্ণয় কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠে কিন্তু ছেলের মা যে কে তা নিয়ে অসুবিধে হয় না মোটেই। কিন্তু পরিবারের **সমস্ত** ছেলেমেয়েকেই সে (নারী) নিজের ছেলেমেয়ে ব'লে ডাকে, আর তাদের সকলেরই বেলায় সে মায়ের দায়িত্ব পালনেও বাধ্য; তবুও সে অন্যান্যদের চাইতে তার নিজের মামুলী ছেলেমেয়ে যে কে বা কারা তা ভালরূপেই জানে। যেখানে যেখানে দলগত বিয়ের প্রচলন, সেখানে কেবলমাত্র **মায়ের দিক** থেকেই পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কাজেই, কেবলমাত্র **মাতৃগত বংশ-পরম্পরাকেই** স্বীকার করা হয়। সমস্ত আদিম ও বর্বর-যুগের নিম্নস্তরে মানব সমাজে বস্তুত ইহাই ছিল দস্তর। পণ্ডিত বাখোফোনের দ্বিতীয় বড় কীর্তি হচ্ছে, তিনিই এই কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি এর নাম দেন, মায়ের দিক থেকে অনন্যসাধারণ বংশানুক্রম নির্ণয়, আর তা থেকে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নির্ণয়ের রীতিকে তিনি "জননী-বিধি" আখ্যা প্রদান করেন। সংক্ষিপ্ততার দিক থেকে সুবিধা হ'বে ব'লে এই আখ্যাটাই রাখা যাচ্ছে। কিন্তু পরিভাষাটা তেমন পরিষ্কার নয়; কারণ সমাজের এই আদিম অবস্থায় আইনের দিক থেকে 'অধিকার' বলে কোন কিছুই ছিল না।

পুনালুয়া পরিবারের দু'টো আদর্শস্থানীয় দলের একটা দল, যথা—মামুলী এবং সগোত্র বোনদের (collateral sisters) একদল (অর্থাৎ মামুলী বোনদের এক, দুই বা ততোধিক পর্যায়ের ছেলেমেয়ে) আর তাদের ছেলেমেয়ে এবং মায়ের দিক থেকে তাদের মামুলী ভাই ও সগোত্র ভাইদের আমাদের (অনুমিতি মতে এরা

(†) ওয়াটসন এবং কে লিখিত "ভারতের অধিবাসী" (১৮৬৮-৭২) ৮৫ পৃঃ।

কেউই স্বামী হ'তে পারে না) ধর্তব্যের মধ্যে আনয়ন করি তাহ'লে আমরা বহু লোকজনের এমন একটা গণ্ডির সাক্ষাৎ পাই যা পরে গোষ্ঠী-প্রথার আদিম রূপের আকার ধারণ করে। এরা সকলেই এক মায়ের বংশধর : এই মাতৃ-বংশ-ধারার প্রত্যেক মেয়ে পুরুষানুক্রমে পরস্পরের বোনরূপে গণ্য। এই সব বোনের স্বামীরা এই সমস্ত বোনের ভাই হতে পারে না অর্থাৎ একই মাতৃবংশোদ্ভূত, কাজেই, একই বংশগত দল এবং আরও পরের তাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এই দলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, একমাত্র মায়ের দিক থেকে বংশানুক্রম ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য, আর ইহাই একমাত্র নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্টও বটে। মাতৃপক্ষের দূরতম সগোত্র সম্পর্ক সহ সমস্ত ভাই আর বোনের মধ্যে যৌন-সংসর্গের বিরুদ্ধে যখন নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন এই বংশগত দল গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়—অর্থাৎ মায়ের দিক দিয়ে রক্তগত-সম্পর্কের লোকজনদের নিয়ে এমন একটা ধরাবাঁধা গণ্ডির সৃষ্টি করা হয় যার ভেতরে পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে সাদী করতে দেওয়া হয় না। অতঃপর সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকৃতির অন্যান্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সেটাকে সুসংহত করে এবং একই উপজাতির মধ্যেকার অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে এটাকে পৃথক করে। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা যাবে। এখন যদি আমরা দেখতে পাই যে, পুনালুয়া থেকে কেবলমাত্র অপরিহার্য হিসাবে নয়, পুরাপুরি স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয় তাহলে এ-থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্ত ক'রতে পারি যে, সমস্ত উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান-সমূহ (gentile institutions) প্রচলিত দেখা যায়,—অর্থাৎ প্রায় সমস্ত "বার্বারিয়ান" ও সভ্য-সমাজে এক সময় পুনালুয়া পারিবারিক-প্রথা প্রচলিত ছিল।

মর্গ্যান যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন তখন দলগত বিয়ে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। অস্ট্রেলিয়ানদের দলগত বিয়ে সম্বন্ধে সামান্য-কিছু খোঁজ-খবর মিলতো। অস্ট্রেলিয়ানেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাছাড়া, ১৮৭১ সনে, মর্গ্যান হাওয়াই দ্বীপের পুনালুয়া পরিবার সম্বন্ধে প্রাপ্ত কতকগুলো রিপোর্টও ছাপেন। একপক্ষে, পুনালুয়া পরিবার প্রথাই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত শোণিতগত পরিবার-প্রথার পূর্ণ ব্যাখ্যারূপে তিনি গবেষণা শুরু করেন। অপরপক্ষে, এই পুনালুয়া পরিবার-প্রথাই মাতৃগত গোষ্ঠীর উৎপত্তির সন্ধান থেকে নিবৃত্ত হওয়ার মূলসূত্র রূপেই গণ্য হয়। অস্ট্রেলিয়ান শ্রেণী-প্রথার তুলনায় তা অধিকতর উৎকর্ষতার দাবি করতে পারে। কাজেই মর্গ্যান কেন যে পুনালুয়া

পরিবারকে পরবর্তী জোড়পরিবারের অপরিহার্য উন্নতির স্তর মনে করেন আর সেখানে এই প্রথাই সর্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল মনে করেন এখন তা বেশ বুঝা যায়। এর পর আরও নানাপ্রকার দলগত বিবাহ-প্রথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে; কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে, মর্গ্যান এ নিয়ে বেশ-কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। তা সত্ত্বেও পুনালুয়া পরিবার আবিষ্কার ক'রে মর্গ্যান তার মধ্যে দলগত বিয়ের চরম আদিম পরিণতিরই সন্ধান পান, যা থেকে ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তরটা ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।

ইংরেজ পাদ্রী লরিমার ফিজন দলগত-বিয়ে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারটা বেশ বাড়িয়ে দেন বলে আমরা তাঁর কাছে ঋণী। দলগত বিবাহযুক্ত পারিবারিক-প্রথার ঐতিহাসিক বাসভূমি অস্ট্রেলিয়ায় তিনি অনেক বছর ধরে গবেষণা চালান। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার গাম্বিয়ার পাহাড়ের অস্ট্রেলিয়ান নিগ্রোদের তিনি ক্রম-বিকাশের সর্বনিম্ন ধাপে দেখতে পান। সমগ্র উপজাতিটি ক্রোকি ও কুমিতে নামক দুটি বিরাট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই সব প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভেতরে যোনি-সংসর্গ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু অপরপক্ষে, একটি শ্রেণীর প্রত্যেক পুরুষ জন্মগত অধিকার হিসাবে অপর শ্রেণীর প্রত্যেক নারীর স্বামী, জন্মগত অধিকার হিসাবে এইরূপ প্রত্যেক নারী তার স্ত্রী। এখানে বলা যায়, ব্যক্তিগতভাবে বিয়ে না হ'য়ে সমগ্র দলের সঙ্গে সমগ্র দলের বিয়ে হয়। কেবল-মাত্র দুটো গোত্রান্তর-বিবাহী-শ্রেণীতে বিভাগ ছাড়া বয়সের পার্থক্য বা বিশেষ রক্তগত সম্পর্ক কিছুতেই যোনি-সংসর্গে কোনরূপেই বাধার সৃষ্টি করেনি; প্রত্যেক ক্রোকি কুমিতে-দলের যে-কোন মেয়েকে আইনত পত্নী বিবেচনা করতে পারে। তার নিজের মেয়েও মাতৃ-বিধির দিক থেকে কুমিতে দলের লোক। কুমিতে নারীর গর্ভজাত কন্যা হিসাবে প্রত্যেক ক্রোকিই তাকে জন্মগত পত্নী বলে দাবি করতে পারে। কাজেই তার বাপও তাকে পত্নী বিবেচনা করতে পারে। শ্রেণীগত পারিবারিক-প্রথা এইরূপ কোন ক্ষেত্রেই নিষেধ চাপায় না। এই পারিবারিক-প্রথা হয়, এমন এক সময় উদ্ভূত হয়ে থাকবে, যখন সমরক্তজদের মধ্যে সন্তান উৎপাদনের বাধা-নিষেধের মনোভাব জাগ্রত হ'লেও, মা-বাপের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের যোনি-সংসর্গ তখনও বিশেষ বীভৎসরূপে গণ্য হয়নি —এইরূপ অবস্থায় দ্বিধা-বিভক্ত পারিবারিক-প্রথা বা শ্রেণী-প্রথা অবাধ-যোনি-সংসর্গের মধ্যেই সরাসরি উৎপন্ন হত। অন্যথায় দ্বিধা-বিভক্ত পরিবার রূপ পরিগ্রহ করার **আগেই** মা-বাপ আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ হ'য়ে

থাকবে ; কাজেই এই প্রথা অতীতের শোণিতগত পারিবারিক প্রথার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোণিতগত পারিবারিক-প্রথার পরবর্তী ধাপরূপে এই প্রথা উদ্ভূত হয়। শেষোক্ত পরিণতিটাই সম্ভবপর মনে হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে মা-বাপ আর ছেলেমেয়ের মধ্যে যৌন-সংসর্গের কোন খবরও পাওয়া যায় নি। গোত্রান্তর-বিবাহী প্রথার শেষ পরিণতি, মাতৃবিধিগত গোষ্ঠী-প্রথায়ও এইরূপ সংসর্গ নিষিদ্ধ বলে মেনে নেয়। গোষ্ঠীর অভ্যুদয়ের সময় এই রকমই ঘটে থাকবে।

দু'টি দ্বিধা-বিভক্ত পারিবারিক-প্রথার অস্তিত্ব কেবলমাত্র দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার গাম্বিয়ার পাহাড়েই সীমাবদ্ধ নয় ; আরও পূর্বে ডার্লিং নদীতীরে এবং উত্তর-পূর্বের কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশেও এই প্রথার অস্তিত্ব আছে। কাজেই, প্রথাটি সুবিস্তৃত বলেই মনে হয়। এই প্রথায় ভাই আর বোন, মায়ের দিক্ দিয়ে ভাইদের ছেলেমেয়ে আর বোনদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়, এরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে। তবে ভাই আর বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হ'তে পারে। নিউ সাউথ ওয়েলসের ডার্লিং নদী অঞ্চলের কামিলারায় জাতি সমরক্তজদের মধ্যে বংশ বৃদ্ধি রদ করার জন্যে আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা করে। এখানে মূলশ্রেণী দু'টাকে এরা চার শ্রেণীতে ভাগ করে। এই চার শ্রেণীর প্রত্যেকটির সঙ্গে অপর এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিয়ে হয়। প্রথম দুইশ্রেণী পরস্পর জন্মগত স্বামী আর স্ত্রী। মা প্রথম কি দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত তদনুসারে ছেলেমেয়েরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী আবার পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী। এই দু'শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সামিলরূপে গণ্য হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় দলের লোকজন একপুরুষরূপে গণ্য হয় ; তৃতীয় ও চতুর্থদল গণ্য হয় পরবর্তী পুরুষরূপে। এর পরবর্তী পুরুষ আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথা অনুসারে মায়ের দিকের ভাই বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয় না ; কিন্তু তাদের পৌত্রপৌত্রীদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ নয়। অস্ট্রেলিয়ার পারিবারিক প্রথা রীতিমত জটিল। মাতৃবিধিগত গোষ্ঠীগুলো পরে এই প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এই প্রথা আরও বেশি জটিল হয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই প্রথা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট ভাব-ধারণা না থাকা সত্ত্বেও সমরক্তজদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করার জন্যে যেন একটা অন্ধ ঝোঁক বা প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।

অস্ট্রেলিয়ার দলগত বিয়ে এখনও শ্রেণী-বিবাহরূপে প্রচলিত আছে। গোটা মহাদেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে এমন পুরো একশ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে এমনিভাবে ছড়িয়ে-পড়া এক শ্রেণীর নারীর বিয়ে—এই দলগত বিয়ের অস্তিত্বে সংকীর্ণমনাদের মন ঘৃণায় ভ'রে উঠতে পারে; কারণ এঁরা এর ভেতরে বেশ্যা বা বেশ্যাবৃত্তিরই জঘন্য ছবি দেখ্‌তে পান—কিন্তু আরো একটু তলিয়ে দেখ্‌লে ব্যাপারটা তেমন ধিক্কারজনক মনে হয় না মোটেই। অন্যপক্ষে, এই প্রথা সম্বন্ধে বহু বৎসর ধ'রে কোন প্রকার সন্দেহবাদই উচ্চারিত হয় নি। অল্পদিন থেকে এ সম্বন্ধে আবার নানাপ্রকার কুৎসাবাদ আরম্ভ হয়েছে। নিরেট পর্যবেক্ষকগণ হয়ত এই দলগত বিবাহ-প্রথার মধ্যে আল্‌গা বাঁধনের একনিষ্ঠ বিয়ে, এখানে-সেখানে বহু-বিবাহযুক্ত বিয়ে আর মাঝে মাঝে ব্যভিচারই দেখ্‌তে পাবেন, কিন্তু মূলত ব্যাপারটা এইরূপ নয় মোটেই। প্রথাটাকে ভালভাবে জান্‌তে হ'লে ফিজন ও হাওইট্‌-এর ন্যায় বহু বছর ধরে অনুসন্ধান চালানো দরকার। তাহলে এইবিবাহ-প্রথার নিয়ন্ত্রক মূল আইনটা আবিষ্কার করতে পারেন। এই আইনের কল্যাণে অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রো প্রবাসী স্বগৃহ থেকে শত শত মাইল দূরে, যাদের ভাষা পর্যন্ত সে বুঝ্‌তে পারে না, এমন-সব লোকের মধ্যে বিচরণ করবার সময় যেকোন উপজাতি অথবা যে-কোন শিবিরে প্রায়ই এমন-সব নারীর সন্ধান পান, যারা নিঃসঙ্কোচে সামান্য মাত্রাতেও বাধা না দি'য়ে তার নিকট আত্মদান করে। এই আইনের ধারা অনুসারে স্বামী অভ্যাগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জনকয়েক পত্নীর একজনকে তার সঙ্গে রাত্রিবাসের অনুমতি দান করে। ইউরোপিয়ানরা যেখানে নীতি-ভ্রষ্টতা ও অরাজকতার পূর্ণ মূর্তি প্রকটিত দেখেন, সেখানে বাস্তবপক্ষে আইন-শৃঙ্খলার কঠোরতাই ষোলআনায় বিদ্যমান। প্রত্যেক নারীই বিদেশী অভ্যাগতের বিবাহ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তার জন্মগত পত্নী। যে নৈতিক আইনের বলে উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থ করার অবসর পায়, সেই আইনই কঠোর নির্বাসনের ফতোয়া জারি ক'রে বিবাহ-শ্রেণীর বাইরে যৌনি-সংসর্গ নিষিদ্ধ করে। এমন-কি, যেখানে মেয়ে অপহরণ করা হয়, যা প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এবং যা সেখানকার নিয়ম, সেখানেও কিন্তু শ্রেণীগত আইন প্রতিপালিত হয় অক্ষরে অক্ষরে।

নারী অপহরণ ব্যাপারে অন্ততপক্ষে জোড়-পরিবার-সম্মত এক-পত্নিত্বের সূচনাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যখন কোন যুবক তার বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে কোন বালিকাকে চুরি করে আনে, তখন সকলেই তাকে পালা করে ভোগ করার

অধিকারী হয়। পরে অবশ্য বালিকা খোদ অপহরণকারীর পত্নিতেই পরিণত হয়। আবার এই অপহৃতা মেয়ে যদি সেই পুরুষের হাত থেকে পালিয়ে যায়, তা'হলে যে তাকে প্রথমে ধরে, তারই পত্নীরূপে সে গণ্য হয়। প্রথম স্বামীর কোন একতিয়ারই তার উপর আর খাটেনা। এই সমস্ত ব্যাপার থেকে বেশ বোঝা যায় যে দলগত-বিয়ে সাধারণ পারিবারিক রীতি হিসেবে প্রচলিত থাক্লেও এর পাশে পাশে অনন্যসাধারণ সম্পর্ক, অল্প বা বেশি সময়ের জন্য সহবাস, এমন-কি, বহুবিবাহের রেওয়াজও আরম্ভ হ'তে দেখা যায়। দলগত বিয়ের এইভাবে অবসান হ'তে চলেছে। ইউরোপিয়ানদের প্রভাবে দলগত বিয়ে ক্রমশ লোপ পাচ্ছে; কিন্তু এই প্রভাবে দলগত বিয়ে, না, অস্ট্রেলিয়ার কালো জাতি প্রথম লোপ পাবে তা ভাববার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

যাই হোক, অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত সমগ্র শ্রেণীগত-বিয়ে দলগত-বিয়ের আদিম ও নিম্নস্তর। পক্ষান্তরে, আমরা যতদূর জানি, পুনালুয়া পরিবারে তার সর্বোচ্চ বিকাশ। পূর্বোক্ত প্রথাটা যাযাবার অসভ্য স্তরের অনুযায়ী আর পরবর্তী স্তরটা অপেক্ষাকৃত যৌথ-ধন-দৌলতযুক্ত স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থারই পরিচয় প্রদান করে। আর এইরূপে সমাজ-ব্যবস্থার অব্যবহিত পরেই সমাজ-জীবনের প্রগতি-ধারার পরবর্তী ধাপটাও পাকড়াও করা সম্ভব কিন্তু স্তর দু'টোর মধ্যে একাধিক মধ্যবর্তী স্তর নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল। এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান গবেষণা পরিচালনার সম্মুক্ত ও অনধ্যুসিত মস্ত বড় ক্ষেত্র প'ড়ে আছে।

(৩) জোড় পরিবার

কম-বেশি কিছু সময়ের জন্য জোড়ে জোড়ে বসবাস দলগত-বিয়ের আমলে এমন-কি, তার পূর্ববর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। পুরুষের বহু পত্নীর মধ্যে একজন তার প্রধানা পত্নীরূপে গণ্য হ'তো (তখনও প্রিয় পত্নী যে কাকে ব'লে তা মানুষের অনেকটা অজ্ঞাত ছিল), আর এই স্ত্রীর কাছে অন্যান্য স্বামীর তুলনায় এই স্বামীরই প্রভাব-প্রতিপত্তিও সবচেয়ে বেশি খাট্তো। খৃস্টান মিশনারীরা এই সামাজিক ব্যবস্থাটা নিয়ে বেশ গোলে পড়ে। তাঁদের ধারণায় কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারিণী উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের মধ্যেই দলগত বিয়ের প্রচলন থাকা সম্ভব; কখনও কখনও তাঁরা দলগত-বিয়েকে অবাধ-যোনি-সম্পর্ক বলেই মনে করেন। গোষ্ঠীর ক্রম-বিকাশ আর পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে এখন অসম্ভব এমন "ভাই" ও "বোন" শ্রেণীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গতানুগতিক জোড়-পরিবারের

বুনিয়াদটাও বেশ দৃঢ় হ'তে থাকে। গোষ্ঠী দ্বারা রক্ত-সম্পর্ক-যুক্ত আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে প্রতিরোধের জন্য যে প্ররোচনা দেওয়া হয়, তাতে কাজ আরও অগ্রসর হয়। ইরোকোয়া ও "বর্বরযুগের" নিম্নস্তরে অবস্থিত অন্যান্য ইণ্ডিয়ান-দের মধ্যে সকল প্রকার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। এই সমস্ত আত্মীয়তার শত শত প্রকার-ভেদের অস্তিত্ব রয়েছে। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের জটিলতা এত বেশি বেড়ে চলে যে, শেষ পর্যন্ত দলগত-বিয়ে অসম্ভব হ'য়ে উঠে এবং **জোড়-পরিবার** ক্রমশ দলগত বিবাহ-প্রথাকে স্থানচ্যুত করে। সমাজের এই স্তরে জোড়-পরিবার, অর্থাৎ একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর একত্রে বসবাস অনেকটা দস্তুরে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও পুরুষের পক্ষে মাঝে-মাঝে ব্যভিচার, এমন কি, বহু-পত্নিত্বের অধিকারও স্বীকৃত হয়। তবে অর্থ-নৈতিক কারণবশত বহু-পত্নিত্ব খুব কমই ঘটবার অবসর পায়। নারীর বেলায় কিন্তু যতদিন যে-কোন পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে, ততদিন পুরাপুরি বিশ্বস্ততা রক্ষা দস্তুরে পরিণত হয়। ব্যভিচারিণীর কঠোর শাস্তি দানেরই ব্যবস্থা করা হয়। বিবাহ-বন্ধন কিন্তু যে-কোন পক্ষের ইচ্ছায় সহজেই ছিন্ন করা চল্‌তো; বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ছেলেমেয়েরা মায়ের সম্পত্তিরূপেই গণ্য হয়।

বিবাহ-বন্ধন থেকে সমরক্তজদের অধিক সংখ্যায় বাদ দেওয়ার প্রথা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকায় এর ভেতরে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই হাত দেখা যায়। মর্গ্যানের ভাষায় বলতে হয়: "রক্তসম্পর্কহীন গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ের বাঁধনে "শরীর ও মন দুই দিক দিয়েই উচ্চতরশ্রেণীর মানুষ গড়ে উঠে।...শক্তি-শালী দু'টো অগ্রগামী উপজাতি একত্রে মিলিত হ'য়ে যখন নতুন জাতে সংমিশ্রিত হয়, তখন উভয়ের মিলিত ক্ষমতা ও শক্তির সমাবেশরূপেই নতুন মাথার খুলি, ও মগজ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই বিস্তৃতি লাভ করে।" গোষ্ঠী-ব্যবস্থাযুক্ত উপজাতিগুলো এই কারণবশত অন্য প্রকার অনুন্নত উপজাতিগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অনগ্রসর উপজাতি-গুলোকে তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

এভাবে মান্ধাতার আমলে এক একটি পরিবার সমস্ত উপজাতিকেই জুড়ে বসে। তখন সমগ্র উপজাতির নর-নারীদের মধ্যে অবাধ-যৌনি-সংসর্গ ঘটতো। অতীত যুগে মানব পরিবারের ইতিহাস, পারিবারিক বেষ্টনির ক্রমিক সংকোচ সাধনেরই ইতিহাস। প্রথমে নিকটতর জ্ঞাতিদের, পরে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের, শেষপর্যন্ত বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত লোকজনকেও বাদ দেওয়ার ফলে

দলগত বিয়ের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। পরিবার শেষপর্যন্ত এক জোড়া নর-নারীতে পর্যবসিত হয়। সে বন্ধনও নিতান্ত আলগা ধরণের। পরিবারের এই ক্ষুদ্রতম সংস্করণও যখন ভেঙে পড়ে তখন বিয়েরও অবসান ঘটে। বর্তমানে আমরা ব্যক্তিগত বা স্বাধীন যৌন-প্রেম বলতে যা বুঝি একপতিত্ব বা একপত্নিত্বের অভ্যুদয়ে যে তা কত কম প্রভাব বিস্তার করেছে তা বেশ বুঝা যায়। এই সময়ের সমাজ-ব্যবস্থায় সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথা থেকে এর আরও বেশি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বতন পারিবারিক প্রথাগুলোর আমলে পুরুষের পক্ষে নারীর কোন অভাব ছিল না। তখন মেয়েমানুষ মিলতো প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু এখন নারী হয়েছে দুর্লভ, পুরুষকে মেয়েমানুষ খুঁজে হায়রাণ হ'তে হয়। কাজেই, জোড়-পরিবার-প্রথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে লুট, মেয়ে ক্রয় ইত্যাদি আরম্ভ হয়। কিন্তু গভীরতর সামাজিক পরিবর্তনের এ-গুলো সুবিস্তৃত লক্ষণ বা উপসর্গ ছাড়া অপর কিছুই নয়। স্কচ্ লেখক ম্যাক্লেনান এই সব লক্ষণকে, স্ত্রীলাভের উপায়গুলোতে রূপান্তরিত ক'রে দু'টো ভাগে বিভক্ত করেন, যথা:—দখলের জোরে বা পৈশাচিক বিয়ে, আর ক্রয়সূত্রে বিয়ে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু, এই শ্রেণী-বিন্যাসের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে কিন্তু বলতে হয়, আমেরিকা-বাসী ইণ্ডিয়ান বা তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্য জাতির মধ্যে (একই স্তরে) বিয়ে জিনিসটা কিন্তু কেবলমাত্র বর আর কনের নিজস্ব বিষয়-বস্তু নয়। অনেক সময় এদের কোন মতামত না নিয়েই, মাত্র মায়েদের মত নিয়েই বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত-পরিচয় দুই ব্যক্তির এইভাবে বৈবাহিক বন্ধনের জন্য বাগ্দান করা হয়। মাত্র বিয়ের সময় ঘনিয়ে এলে তারা জানতে পারে যে, তাদের দুজনকে একত্রে বসবাস করতে হবে। বিয়ের আগে বর-কনের (মাতৃকুলের) আত্মীয়-স্বজনের নিকট কনের বিনিময়-মূল্যস্বরূপ বিস্তর উপঢৌকন প্রদান করে। (কনের পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়)। এই বিয়েও উভয় পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে খতম হ'তে পারে। তবে ইরোকোয়াদের অন্তর্ভুক্ত অনেক জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অ-বনিবনাও হ'লে উভয় গোষ্ঠীর আত্মীয়-স্বজনেরা মধ্যস্থতা করে বিবাদ মেটাতে চেষ্টা করে। অপারক হ'লে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ছেলেপিলে মায়ের কাছেই থাকে। উভয়েই আবার নতুন করে সংসার পাতার অধিকারী হয়।

জোড়-পরিবার এত বেশি দুর্বল ও অস্থায়ী ধরণের যে, এজন্য পৃথকভাবে ঘর-গৃহস্থালি পাতাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি এবং তা বাঞ্ছনীয়ও মনে হয়নি; কাজেই, ইহা পূর্ববর্তী যুগের যৌথ ঘর-গৃহস্থালিকেও বিলুপ্ত করতে পারেনি। কিন্তু যৌথ পরিবারের অর্থ নারীর প্রাধান্য; বাপকে চেনা যায় না, মাকেই সঠিকভাবে চিনতে পারা যায়, সেইজন্য যৌথ-পরিবারে মায়েরই মর্যাদা বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পণ্ডিতগণ সমাজের গোড়ায় নারীকে পুরুষের ক্রীতদাসীরূপে গণ্য ক'রে মস্ত ভুল করেন। সমস্ত "অ-সভ্য" এবং নিম্ন ও মধ্য স্তরের, এমন-কি, কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের বর্বরদের মধ্যেও নারী পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারিণী ত' বটেই, অধিকন্তু, সমাজে তার সম্মানও অত্যন্ত বেশি। জোড়-পরিবারে এখনও মেয়েদের মর্যাদা কিরূপ সে-সম্বন্ধে আর্থার রাইট অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। ইরোকোয়াদের সেনেকা জাতির মধ্যে ইনি দীর্ঘকাল খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকরূপে কাজ করেন। মিঃ রাইট বলেন :—

"তাদের পারিবারিক প্রথা সম্পর্কে বলা যায়, (এক যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থার অধীনে বহু পরিবার একত্রে),···সেকেলে ধরণের বড় বড় বাড়িতে বাস করার সময় কোন কোন গোষ্ঠী এর মধ্যে প্রবল থাকা সম্ভব। মেয়েরা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বামী আহরণ করতো।···সাধারণত পরিবারে মেয়েদেরই প্রাধান্য; খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্র সমস্ত পরিবারের জন্য একত্র মজুত রাখা হ'তো। কোন স্বামী কুড়েমি করলে আর তার রক্ষা ছিল না, যত সন্তানের বাপ আর যত সম্পদের মালিকই সে হোক-না-কেন, তাকে যে-কোন সময়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বিদেয় দেওয়ার আদেশ দেওয়া হ'তো। এই আদেশ লঙ্ঘন করা তার পক্ষে কোনক্রমেই হিতকর নয়; কারণ তাহ'লে সমগ্র যৌথ-পরিবার বিদ্রোহী হ'য়ে তাকে তিষ্ঠাতে দিত না। এই দুর্দশাগ্রস্ত স্বামীকে তার আপন গোষ্ঠীতে ফিরে যেতে হ'তো; অন্যথায় এবং প্রায়ই তাকে অপর কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাতে হ'তো। সর্বত্র মেয়েদেরই ছিল পূর্ণ রাজত্ব। তারা বিগড়ালে গোষ্ঠীপতিকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে নতুন গোষ্ঠিপতি বহাল করতে পারতো।" যৌথ পরিবারের সমস্ত অথবা অধিকাংশ নারীই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর পুরুষরা আসে বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে; ইহাই মেয়েদের প্রাধান্যের ভিত্তি। মান্ধাতার আমলের মানব সমাজে নারীর প্রাধান্যই ছিল দস্তুর। বাখোফোন এই সত্যটা আবিষ্কার ক'রে তৃতীয় সুমহান কীর্তি স্থাপন করেন। এ ছাড়া আমি আরো কিছু বলছি : পর্যটক ও খৃস্টীয় প্রচারকদের বিবরণী থেকে দেখানো

যেতে পারে, অ-সভ্য ও বর্বর মেয়েদের গুরু পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়। তাতে যা উপরে বলা হয়েছে তার সঙ্গে একটুও অসঙ্গতি নেই। নারী ও পুরুষের শ্রম-বিভাগ এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা একই কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি ; সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কারণবশত ঘটেছে। যে সমস্ত জাতির মধ্যে মেয়েরা, তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব বলে আমরা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি খাটে, সেই সব জাতের মেয়েরা ইউরোপীয় নারীদের তুলনায় অনেক বেশি প্রকৃত মর্যাদা ভোগ করে। সকল প্রকার বাস্তব কাজ থেকে বিচ্যুত আর পুরুষের মিথ্যা স্তব-স্তুতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন সভ্য মহিলারা কঠোর পরিশ্রমী বর্বর নারীর তুলনায় বহুগুণে কম মর্যাদার অধিকারী। বর্বর পুরুষরা বর্বর নারীর তুলনায় বহুগুণে কম মর্যাদার অধিকারী। বর্বর পুরুষরা বর্বর মেয়েদের প্রকৃতই দেবী মনে করে, আর মর্যাদার দিক থেকেও তারা তাই বটে।

বর্তমানে আমরিকায় জোড়-বিয়ে দলগত বিয়েকে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করেছে কিনা তা স্থির করতে হ'লে উত্তর-পশ্চিম, বিশেষত, দক্ষিণ-আমেরিকার জাতিগুলির মধ্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাতে হ'বে। এই সমস্ত অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা এখনও অ-সভ্য অবস্থার উচ্চ স্তরে আছে। দক্ষিণ-আমেরিকার জাতিগুলির মধ্যে যৌন-সংসর্গের স্বাধীনতার এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, দলগত বিয়ের প্রচলন এদের মধ্যে একেবারে লোপ পেয়েছে, কদাচিৎ এরূপ ধারণা করা যায়। অন্ততপক্ষে, এর সমস্ত নিদর্শন বা প্রতীক এখনও লোপ পায়নি। উত্তর-আমেরিকায়, অন্ততপক্ষে, চল্লিশটা উপজাতির মধ্যে দস্তর এই যে, কোন পরিবারের বড় বোনকে যে বিয়ে করে, সমস্ত ছোট শালী বয়ঃপ্রাপ্তা হ'লে তার স্ত্রী হ'য়ে থাকে। এই রীতি সমস্ত বোন মিলে স্বামী-মণ্ডলী নিয়ে ঘর-কন্না করার অতীত প্রথাটারই প্রতীক। কালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের উপজাতিদের (অ-সভ্য অবস্থার উচ্চস্তরে) সম্পর্কে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট কর্তৃক লিখিত-বিবরণীতে দেখা যায়, নির্বিচারে যৌনি-সংসর্গের আমোদ উপভোগের জন্য কতকগুলি উৎসবে বহু উপজাতি একত্রে মিলিত হয়। এই সব উপজাতি নিশ্চয়ই এক একটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এমন এক সময় ছিল, যখন এক গোষ্ঠীর মেয়েরা অপর এক গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষকে যৌথ-স্বামী রূপে বরণ করে, আবার শেষোক্ত গোষ্ঠীর মেয়েরাও পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর পুরুষদের নিয়ে আমোদ উপভোগ করে। এই সমস্ত উৎসবে দুর অতীতের সেই স্মৃতিটাই জাগিয়ে রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় এখনও এই প্রথা প্রচলিত। অনেক জাতের মধ্যে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত ভারি বয়সের লোক, সর্দার ও যাদুকর-

পুরোহিতরা যৌথ-পতিত্বের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। নিজেদের স্বার্থে বহু নারীর উপর তাদের একচেটে অধিকার। কিন্তু কতকগুলো উৎসব ও লোক-সমাবেশের সময় তাদের পত্নীদের যুবকদের সঙ্গে স্ফূর্তি করবার সুযোগ দান করতে হয়। ওয়েস্টারমার্ক তাঁর বিবাহের ইতিহাস নামক গ্রন্থে (১৮৫১, ২৮-২৯ পৃঃ) এইরূপ সাময়িক অসংযত উৎসবের বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তখন কিছুকালের মত যৌন-সংসর্গের পুরাতন স্বাধীনতা আবার পুন-প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের হো, সাঁওতাল, পাঞ্জা, ও কোটারদের মধ্যে, আফ্রিকারও নানা জাতির ভেতর এই ধরণের উৎসব প্রচলিত আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওয়েস্টারমার্ক দলগত বিয়েতে বিশ্বাস করেন না; তাই তিনি এই সব উৎসবকে দলগত-বিয়ের জের মনে না করে আদিম মানুষের শৃঙ্গার ঋতুর স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেন। জানোয়ারেরা যেমন কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে শৃঙ্গারপ্রবণ হয়, আদিম নর-নারীও তেমনি সময়ে সময়ে উৎকট শৃঙ্গার লালসার বশবর্তী হয়েথাকে।

এখানে বাখোফোনের চতুর্থ সুমহান আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। তিনি দলগত বিয়ে আর জোড়-পরিবারের মধ্যে এক বিস্তৃত মধ্যবর্তী যুগ ও প্রথার সন্ধান পান। এই যুগে নারী প্রাচীনযুগ-সুলভ যৌথ স্বামীদের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে **একজন** মাত্র পুরুষের নিকট আত্মদান করে। কিন্তু ভগবানের আদিম আদেশ অগ্রাহ্য করে এই একজনের নিকট আত্মদানরূপ মহাপাপের জন্য নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আদিম যুগে বহু পুরুষের ভোগ্যা হওয়াই নারীর স্বধর্ম ছিল। সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা কি সহজ কথা? সেই জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। বাখোফোন এই মধ্যবর্তী প্রথাকে এই প্রায়শ্চিত্তের প্রতীকরূপেই পরিকল্পনা করেন। সতী হওয়া, অর্থাৎ মাত্র একজনের ভোগ্যারূপে বিবেচিত হওয়া স্ত্রীজাতির নিকট তখন মহাপাপ বলেই গণ্য হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত পরিমিত আত্মসমর্পণেরই রূপ পরিগ্রহ করে। ব্যাবিলোনিয়ার মেয়েরা বছরে একবার মিলিতার মন্দিরে এইভাবেই (সমবেত সমস্ত পুরুষের কাছে) আত্মদান করে। মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য জাতিরা তাদের আইবুড় মেয়েদের আনাইতিসের মন্দিরে প্রেরণ করতো। এখানে কয়েক ব'ছর ধরে নিজ নিজ প্রেমাস্পদের সঙ্গে স্বাধীন প্রেম উপভোগের পর তারা বিয়ে-সাদী করতো। ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত এশিয়া-বাসীদের ধর্মের ছদ্ম আবরণের মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। পাপ-মোচনের জন্য নারীকে যে প্রায়শ্চিত্তমূলক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার পরিমাণটা কিন্তু কালক্রমে ক্রমশ কমে আসে। বাখোফোন বলেন:

"বৎসরে একবার প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তে জীবনে একবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়। বিবাহিতা পত্নীদের বহুস্বামিত্ব (হেতেরে) ভোগের পাতিটা পরে কেবলমাত্র কুমারীদের পক্ষে জায়েজ রাখা হয়; বিবাহিত জীবনে বহু-স্বামিত্ব ভোগের পরিবর্তে কুমারী অবস্থায় তা বলবৎ করা হয়; নির্বিচারে সকলের নিকট আত্মদানের স্থলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আত্মদান-প্রথা কায়েম করা হয়।" (মুট্টেরেখট, ১৯ পৃষ্ঠা) কতকগুলো জাতের মধ্যে ধর্মের অছিলা বা অজুহাত দেখতে পাওয়া যায় না মোটেই। অন্যান্য জাতির মধ্যে, প্রাচীন যুগের থে্সিয়ান, কেল্ট, প্রভৃতি জাতের মধ্যে, বর্তমান কালেও ভারতের বহু আদিম অধিবাসী, মালয়বাসী, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকাবাসী বহু ইণ্ডিয়ানের মধ্যে বিয়ের আগে কুমারীরা সব চাইতে বেশি অবাধ-যোনিসংসর্গের স্বাধীনতা উপভোগ করে। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই এই রীতি দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-আমেরিকার অভ্যন্তরভাগে কিছুদূর ভ্রমণের যাঁরাই সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই এইরূপ অভিমত প্রকাশে বাধ্য হবেন। অগাসিজ, **ব্রেজিল পর্যটন**, বোস্টন ও নিউইয়র্ক, ১৮৮৬, ২৬৬ পৃঃ, নামক গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে এক চমৎকার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। একবার এক ধনী দো-আঁশলা ইণ্ডিয়ান পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হয়। এই পরিবারের কন্যার সঙ্গে যখন তাঁকে পরিচয় করা হয়, তখন তিনি তার বাপ কে তা জানতে চান। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে তখন লড়াই চলে। লোকটা ছিল একজন সামরিক অফিসার। গ্রন্থকার তাকেই তার মাতার স্বামী মনে করেন; কিন্তু মেয়ের মা হাসিমুখে উত্তর দেয়—"মেয়েটার বাপ নেই। সে দৈবক্রমে জন্মগ্রহণ করে।"

"এই অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান বা বর্ণ-সংকর মেয়েরা……কোনরূপ লজ্জাসংকোচ না করে অম্লানবদনেই নিজেদের জারজ সন্তানদের কথা উল্লেখ করে থাকে।… এই অবস্থাটা আদৌ অনন্যসাধারণ ব্যাপার নয়; বরং বিপরীতটাই এর ব্যতিক্রম। ছেলেমেয়েরা কেবলমাত্র তাদের মাকেই চিনে, কারণ সকল লালন-পালনের দায়িত্ব মাকেই পালন করতে হয়। বাপ তাদের নিকট একেবারে অপরিচিত। আর বাপের উপর জননী বা তার ছেলে-মেয়েদের যে কোন এক্তিয়ার আছে এ ধারণাও তাদের নিকট অজ্ঞাত।"

সভ্য মানুষের চোখে এই সমস্ত রীতি-নীতি অদ্ভুত ঠেকলেও দলগত-বিবাহ পদ্ধতি আর "জননী-বিধির" আমলে ইহা সহজ ও সাধারণ নিয়মরূপেই গণ্য।

আরও কতকগুলো জাতের মধ্যে বরের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য বরযাত্রী বিবাহের দিনেই পরম্পরাগত অধিকার প্রয়োগ করে, বরের পালা আসে সকলের শেষে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকায় আউগিলাসদের প্রাচীন সমাজে এই রীতি ছিল। আবিসিনিয়ার বারিয়া জাতির মধ্যে এখনও এই প্রথা আছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায়, উপজাতি বা গোষ্ঠীর সর্দার, কাসিক, ওঝা, পুরোহিত, রাজা প্রভৃতি কোন প্রতিনিধি-স্থানীয় পদস্থ লোক কনের সঙ্গে প্রথম রাত্রির সুখ উপভোগ করে। পরবর্তী যুগের ভাব-বাদ দ্বারা (neo-romantic) দোষ ঢাকার শত চেষ্টা সত্ত্বেও আলাস্কা অঞ্চলের বহু অধিবাসী ও উত্তর-মেক্সিকোর তাহুজাতির এবং আরও নানাজাতির মধ্যে (ব্যানক্রফ্‌টের "আদিম জাতি", ১ম, পৃঃ ৮১) দলগত বিয়ের প্রতীকরূপে এই বিবাহ-রাত্রির অধিকার-নীতি এখনও টিকে আছে। কেল্‌টিক জাতির আদিম বাসভূমিতে সরাসরি দলগত বিয়ের থেকে সঞ্চারিত এই প্রথা মধ্যযুগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আরাগনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যাস্টাইল প্রদেশের চাষীরা কখনও দাসে পরিণত না হ'লেও আরাগনে অত্যন্ত লজ্জাকর দাস-প্রথার রেওয়াজ ছিল। ক্যাথলিক রাজা ফার্ডিনাণ্ড কর্তৃক ১৪৮৬ সনে ডিক্রি জারি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে এই অবস্থাই বর্তমান ছিল। এই ঘোষণাবাণীতে আছে :

"আমাদের রায় ও ঘোষণাবাণী মতে পূর্বোক্ত অভিজাতগণ (সেনরগণ, ব্যারণ) ...চাষীদের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে আর প্রথম রাত কাটাতে পারবেন না। আর বিয়ের রাতে চাষীর বৌ যখন বিছানা পেতে শয়ন করবে, তখন তারা প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ তার বিছানায় পা মাড়ানো বা তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবেন না। তাছাড়া পূর্বোক্ত অভিজাতগণ চাষীদের ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কি, পারিশ্রমিক দিয়ে, বা না দিয়েও কাজে লাগাতে পারবেন না।"

'হেতেরে' বা যৌথ-পত্নিত্ব থেকে প্রধানত নারীদের মারফতেই একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথার বিবর্তন হয়েছে বলে বাখোফোন এবারও যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা পুরোপুরি সত্য। জীবনযাত্রাপ্রণালীতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদের পতন এবং জন-সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই পুরানো প্রথানুযায়ী যৌন-সম্পর্কগুলো সরল আদিম বাহ্য প্রকৃতি হারিয়েছে ততই সেসব নারীদের কাছে লাঞ্ছনা ও পীড়াদায়ক মনে হয়েছে ; ততই তাদের তীব্র বাসনা জেগেছে মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে সতীত্বের অধিকারে, একজন

পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী বা স্থায়ী অধিকার লাভের জন্য। পুরুষ থেকে এ অগ্রগতি কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। কারণ তারা কখনও, এমন-কি বর্তমানেও, প্রকৃত দলগত বিয়ের আমোদ পরিত্যাগের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না—এই একটি কারণই যথেষ্ট। মেয়েদের দ্বারা জোড় পরিবার-প্রথা প্রবর্তনের পরই পুরুষেরা খাঁটি একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথা প্রচলনে সক্ষম হয়। এই খাঁটি একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথা অবশ্য কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যই।

অসভ্য ও বর্বর যুগের সীমারেখাতেই জোড়-পরিবারের উৎপত্তি—অসভ্য যুগের উচ্চ স্তরেই, প্রধানত, কোথাও কোথাও বর্বর যুগের নিম্ন স্তরেও এর উৎপত্তি হয়। দলগত বিবাহ যেমন অসভ্য যুগের, একনিষ্ঠবিবাহ যেমন সভ্য যুগের বৈশিষ্ট্য, তেমনি এই প্রথাও বর্বর যুগের পারিবারিক প্রথার বৈশিষ্ট্য। স্থায়ী একনিষ্ঠবিবাহ প্রথায় এই প্রথার বিকাশলাভের জন্য এ পর্যন্ত আমরা যে-সব কারণ সক্রিয় দেখেছি তার অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন হয়। জোড়-পরিবারে দলটি ইতিপূর্বেই তার চরম এককে, এর দুই পরমাণু সম্বলিত জীবাণু-কেন্দ্রে—একজন পুরুষ ও একজন নারীতে সংকোচ-প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন দলগত বিবাহ বেষ্টনীটার অনবরত সংকোচ সাধন ক'রে তার কাজ সম্পন্ন করেছে। এদিক দিয়ে তার আর কিছুই করার মত ছিল না। সামাজিক নতুন কোন পরিচালনা-শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ না হলে, জোড়-পরিবার থেকে নতুন কোন পারিবারিক প্রথার উদ্ভবের কোন কারণই থাকত না। কিন্তু এই সমস্ত পরিচালনা-শক্তি কাজ করতে শুরু করেছে।

এখন জোড়-পরিবারের প্রাচীন আশ্রয়-ভূমি আমেরিকা ত্যাগ করা যাক্। কারণ আমেরিকা আবিষ্কার ও বিজয়ের পূর্বে সেখানে কোন উচ্চতর পারিবারিক প্রথা বিকাশ লাভ করেছিল বা সেখানকার কোন অঞ্চলে, কোন সময়ে খাঁটি একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথার অস্তিত্ব ছিল, এরূপ সিদ্ধান্তের উপযোগী কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। প্রাচীন জগতের অবস্থাটা কিন্তু অন্য রকমের ছিল।

এখানে পশুপালন ও পশুযূথের জনন এ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত ধনদৌলতের নতুন উৎসের পথ প্রশস্ত করে এবং নতুন সামাজিক সম্পর্কেরও সৃষ্টি করে। বর্বর অবস্থার নিম্ন স্তর পর্যন্ত স্থায়ী সম্পত্তি মোটামুটি বাসগৃহ, পরিচ্ছদ, মোটাসোটা গহনা, আহার্য আহরণ ও রান্নার সাজ-সরঞ্জাম; নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র, সাদা-সিধে ধরণের ঘর-গৃহস্থালির তৈজসপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। আহার্য আহরণ করতে হত, প্রত্যেক দিন নতুন ক'রে। এখন, ঘোড়া, উট, গাধা, গরু, ভেড়া,

ছাগল ও শূকরের যূথ সহ অগ্রগামী পশুপালক জাতিরা—ভারতবর্ষের পঞ্চনদ ও গাঙ্গেয় অঞ্চলের এবং অক্সাস্ ও জাক্সার্তেস বিধৌত তৃণাঞ্চলের আর্যরা এবং ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীসের তীরবর্তী সেমেটিক জাতিরা এমন-সব স্থান অধিকার করল যেখানে ক্রমবর্ধনশীল হারে বংশবৃদ্ধি ও সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর দুধ ও মাংস সরবরাহের জন্য সামান্য-কিছু তদারক ও যৎসামান্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাই ছিল যথেষ্ট। খাদ্য-সংস্থানের পূর্বতন সমস্ত উপায়ই এখন যবনিকার অন্তরালে সরে গেল। যে শিকার একদা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল এখন তা বিলাসে পরিণত হল।

কিন্তু এই ধনদৌলতের মালিক ছিল কারা? গোড়ায়, নিঃসন্দেহে, মালিক ছিল এ সবের জেন্‌স বা গোষ্ঠী। অতি গোড়ার দিকেই পশুর পশুলোয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্থাপিত হয়। তথাকথিত মুশা লিখিত প্রথম গ্রন্থের রচয়িতা পিতা আব্রাহামকে তাঁর পশুপালের মালিকরূপে বর্ণনা করেন,—কিন্তু যৌথ পরিবারের কর্তা হিসাবে না গোষ্ঠীপতি হিসাবে তা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। তবে, একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, আধুনিক সময়ে সম্পত্তির মালিক বলতে আমরা যা বুঝি তাঁকে সেই ধরণের সম্পত্তির মালিক বিবেচনা করলে চলবে না। আরো একটি সুনিশ্চিত বিষয় এই যে, খাঁটি ঐতিহাসিক যুগের গোড়াতেই আমরা দেখতে পাই, বর্বর যুগের কলাসম্পদ, ধাতু-নির্মিত তৈজসপত্র, বিলাসের উপকরণ এবং সর্বশেষে, পশুর সামিল কেনা-গোলামদের ন্যায় সর্বত্র পশুপালগুলো ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের পৃথক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

এ যুগে দাসত্ব-প্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে। নিম্ন স্তরের বর্বরদের কাছে গোলাম ছিল নগণ্য সম্পদ। এই কারণেই আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা পরাজিত শত্রুদের সঙ্গে উচ্চ স্তরের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করত। বিজয়ী উপজাতিরা পরাজিত শত্রুদের হত্যা করত অথবা ভাইয়ের মত নিজেদের দলে টেনে নিত। মেয়েদেরও বিবাহ করা হত অথবা একইভাবে তাদের হতাবশিষ্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দলভুক্ত করা হত। এই স্তরে মানুষের শ্রম-শক্তি নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যয়-নির্বাহের পর কোন বাড়তি আয় সৃষ্টি করতে পারতো না। কিন্তু গো-মহিষ পালন, ধাতুর কাজ, বয়ন এবং শেষ পর্যন্ত কৃষিকার্য প্রবর্তনের পর এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। এক সময়কার সহজলভ্য নারীদের এখন যেমন বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কেনা যায়, পশুপালগুলো, শেষ পর্যন্ত, পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর শ্রম-শক্তির বেলায়ও ঠিক তাই ঘটে। পরিবারের লোকজন গো-মহিষের তুলনায় দ্রুতগতিতে বাড়ে না। পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণের

জন্য আরো লোকের দরকার হয়। যুদ্ধবন্দীদের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়। গো-মহিষদের মতোই এদের পালন করা যায়।

একবার এই সম্পদ পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে এবং জোড়-পরিবার ও জননী-বিধি-শাসিত গোষ্ঠীর ভিত্তিতে রচিত সমাজের উপর কঠোর আঘাত হানে। জোড়-পরিবার প্রথা পরিবারে নতুন চীজ আমদানি করে। স্বাভাবিক মাতার পাশেই প্রমাণ-সিদ্ধ পিতাকে স্থাপন করা হয়। আজকালকার অনেক "বাপের" চেয়ে এই বাপ অনেক বেশি প্রমাণ-সিদ্ধতার দাবি করতে পারে। সেই সময়কার পারিবারিক শ্রম-বিভাগ প্রথানুসারে পুরুষের ভাগে পড়ে আহার্য সংস্থান ও তদুপযোগী সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের ভার। সেইজন্য আহার্য-সংস্থানের সরঞ্জামগুলোর উপরেও পুরুষের একতিয়ার জন্মে। বিচ্ছেদের সময় পুরুষ তার হাল-হাতিয়ার নিয়ে সরে পড়ত আর ঘর-কন্নার জিনিসগুলো নারী আটকে রাখত। তাই এ যুগের সামাজিক প্রথানুসারে আহার্য সংগ্রহের নতুন সংস্থান গো-মহিষ ও পরে শ্রমশক্তির নতুন হাতিয়ার গোলামদের উপরও মালিকানা পুরুষরা লাভ করে। কিন্তু সেই সামাজিক বিধান অনুসারেই তার ছেলেমেয়েরা তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে দখল করতে পারত না; কারণ উত্তরাধিকারের নিয়ম-কানুন ছিল নিম্নরূপ :

মাতৃ-বিধি অনুসারে অর্থাৎ, যতদিন মাতৃবংশ দ্বারা মানুষের কুল, বংশ ইত্যাদির পরিচয় দেওয়ার রেওয়াজ ছিল ততদিন গোষ্ঠীর ভিতরে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করার আদিম-প্রথা অনুসারে গোষ্ঠীর সভ্যস্থানীয় কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার আত্মীয়-স্বজনরা প্রথমত তার সম্পত্তি ভোগ-দখল করত। সম্পত্তি গোষ্ঠীর তাঁবে থাকবে এই ছিল দস্তুর। প্রথমত, বিষয়-সম্পত্তি নেহাৎ নগণ্য ছিল বলে যতদূরসম্ভব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার নিকট-আত্মীয়েরাই অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে সমরক্তজরাই ঐ সমস্ত ভোগ-দখল করত। মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা তাদের মায়ের গোষ্ঠীর লোক। গোড়ায় তারা উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের অন্যান্য সমরক্তজদের সঙ্গে মায়ের সম্পত্তি ভোগ-দখল করত। পরে, যতদূরসম্ভব, অগ্রাধিকারের নীতি অনুসারে তারা মায়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকবে "কিন্তু বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না; কারণ, তারা তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। বাপের সম্পত্তি বাপের গোষ্ঠীর তাঁবেই থেকে যাবে। সেজন্য পশুযূথ-মালিকের মৃত্যু হলে তার পশুপাল প্রথমেই চলে

যেতো তার ভাই-বোন, বোনদের ছেলেমেয়ে অথবা মাসিমার বংশধরদের হাতে কিন্তু তার নিজের ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হত।

ধনদৌলত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিক দিয়ে পরিবারে নারীর তুলনায় পুরুষের মর্যাদা বেড়ে যায়, অপর দিকে, পুরুষ পুরাতন উত্তরাধিকার প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে আপন ছেলেমেয়েদের সুব্যবস্থা করবার জন্য এই বর্ধিত মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু জননী-বিধি অনুসারে বংশানুক্রম নির্ধারণের প্রথা যতদিন প্রচলিত ছিল ততদিন ইহা সম্ভব হয়নি। কাজে কাজেই, জননী-বিধি পাল্টে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং শেষ-পর্যন্ত হয়ও তাই। বর্তমানে দুঃসাধ্য মনে হলেও এই পরিবর্তন আনতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। কারণ, মানব-সমাজের অন্যতম সেরা বিপ্লবটার ফলে গোষ্ঠীর কোন জীবন্ত সদস্যের কোনরূপ অকল্যাণ হয়নি। ইতিপূর্বে যেভাবে ছিল, সমস্ত সদস্য সেইভাবেই থাকতে পারে। ভবিষ্যতে পুরুষ-সদস্যদের বংশধররা গোষ্ঠীর ভেতরেই থাকবে আর মেয়েদের সন্তান-সন্ততিরা গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাদের পিতার গোষ্ঠীতে স্থানান্তরিত হবে—এইরূপ একটা সাধাসিধে সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল। এতদ্বারা মাতৃকুলের নামে বংশ-পরিচয় ও জননী-বিধি অনুসারে উত্তরাধিকার নির্ধারণ বর্জন করে তৎস্থানে পিতৃবংশ ও পিতৃবিধি অনুসারে উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। সভ্যজাতিদের মধ্যে কখন এবং কি-ভাবে এই বিপ্লব সাধিত হয় তাহা আমরা কিছুই জানিনে। ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটেছে। জননী-বিধি সম্পর্কে যে-সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেইগুলোর বিশেষত, বাখোফোনের সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে যে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যায় তাতে এই বিপ্লব যে সুনিশ্চিতভাবেই **ঘটেছিল** তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর কত সহজে যে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা ইণ্ডিয়ান উপজাতির ওপর দৃষ্টিপাত করলেই বেশ বোঝা যায়। ক্রমবর্ধনশীল সম্পত্তির প্রভাব এবং জীবন-যাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন-পদ্ধতি (জঙ্গলের বদলে তৃণাকীর্ণ অঞ্চলে বসবাস) এবং আংশিকভাবে মিশনারী ও সভ্যতার নৈতিক প্রভাববশত এই বিপ্লব রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিদের মধ্যে অতি অল্পদিন আগে ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। মিশৌরি অঞ্চলের আটটা উপজাতির মধ্যে ছয়টায় পুরুষ এবং দুটোয় নারীগত বংশানুক্রম ও উত্তরাধিকার প্রথা বর্তমান আছে। শাউনী, মিয়ামী ও দেলাওয়ের উপজাতির মধ্যে ছেলেরা যাতে বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে সেজন্য বাপের গোষ্ঠীর নাম দিয়ে ঐ গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা

প্রচলিত হয়। "নামের পরিবর্তন দ্বারা বস্তুর পরিবর্তন সাধনে মানুষের সহজাত কূটতর্ক! প্রত্যক্ষ স্বার্থের পিছনে যখন বাসনা প্রবল হয়ে উঠে তখন মানুষ ঐতিহ্যের মধ্যেই ঐতিহ্যকে পরিহার করায় ছিদ্র অন্বেষণ করে!" (মার্ক্স্) ফলে নৈরাশ্যজনক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। একমাত্র জনক-বিধির প্রবর্তন দ্বারাই এই গোঁজামিল থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব এবং বাস্তবিকপক্ষে এই নয়া-বিধির প্রয়োগে আংশিক পরিবর্তন লাভও হয়। "এই পরিবর্তন মোটের উপর সবচেয়ে স্বাভাবিকও মনে হয়"—(মার্ক্স্)। প্রাচীন জগতের সভ্যজাতিদের মধ্যে কোন্ পন্থায় এবং কোন্ কোন্ উপায়ে এই পরিবর্তন সাধন হয়েছে সে-সম্বন্ধে তুলনামূলক আইন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ যা বলতে পারেন সেইগুলো নিছক অনুমিতি ছাড়া আর কিছুই নয়,—সে সমস্ত জানতে হলে এম, কোভালেভ্স্কী প্রণীত **পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তিও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**, স্টকহোলম, ১৮৯০ দ্রষ্টব্য।

জননী-বিধির উচ্ছেদসাধন, **নারীজাতির বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়** বিশেষ ছিল। পুরুষ গৃহেও কর্তৃত্ব অধিকার করে; নারী অবনমিত হয়, গোলামি স্বীকার করতে তাকে বাধ্য করা হয়; নারী পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্রীতদাসী, আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়; নারীর এই অবনমিত অবস্থা বিশেষভাবে পরিস্ফুট দেখা যায় বীর যুগের গ্রীকদের মধ্যে, মহাকাব্যের যুগের গ্রীকদের মধ্যে ইহা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপেক্ষাকৃত মিষ্টি কথার প্রলেপ ও পোশাকী সাজে এই অবনমিত অবস্থা ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করা হলেও তা একেবারে লোপ পায় নি।

এখন যে পুরুষদের একাধিপত্য স্থাপিত হ'ল তার প্রথম পরিণতি অভিব্যক্ত হয় পুরুষ-শাসিত পরিবারের মধ্যে। মধ্যবর্তী প্রথা হিসাবে এই পরিবার রূপ পরিগ্রহ করে। বহুবিবাহ এর মূল লক্ষণ নয়। এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। "ইহা গৃহস্বামীর পৈত্রিক ক্ষমতার শাসনাধীনে স্বাধীন ও গোলাম বহু নর-নারীকে নিয়ে গঠিত এক-একটি পরিবার। সেমিটিক পরিবারে পরিবারের নায়ক এক সঙ্গে বহু স্ত্রী ভোগ করতো; গোলামের থাকতো একজন মাত্র স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি; অল্পপরিসর অঞ্চলে পশুপালের রক্ষণাবেক্ষণই ছিল এই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য।" পিতার প্রভুত্ব ও গোলামদের অন্তর্ভুক্তি এই পরিবারের প্রধান বিশেষত্ব। সেই জন্য এই ধরণের নিখুঁত পরিবারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রোমান পরিবারের মধ্যে। আজকালকার নীতিবাগীশেরা (Philistines) পরিবার

বলতে যেমন ভাবালুতা ও ঘরোয়া কলহের একত্র সমাবেশ বলে মনে করে গোড়ায় **ফ্যামিলি** শব্দ সেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হ'তো না। গোড়ায় রোমানদের মধ্যে পরিবার বলতে, এমন-কি, বিবাহিত দম্পতি ও তাদের ছেলেমেয়েদের না বুঝিয়ে কেবলমাত্র গোলামদেরই বুঝাত। **ফ্যামুলাস** শব্দের অর্থ পারিবারিক গোলাম, এবং **ফ্যামিলিয়া** বলতে একজন লোকের অধীনস্থ সমস্ত গোলামকেই বুঝতে হ'বে। এমন কি, গাইয়ুসের আমলে পর্যন্ত লোকে উইল করে **ফ্যামিলিয়ার** উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে যেতো। এক নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বর্ণনা করার জন্য রোমানরা এই শব্দটা উদ্ভাবন করে। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের অধীনে থাকতো তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ও কতকগুলি গোলাম, যাদের উপর সেই রোমান জনক-বিধির অধিকার অনুসারে সে ব্যক্তি দণ্ড-মুণ্ডের অধিকারও পরিচালন করতো। "কাজে কাজেই এই শব্দটি ল্যাটিন উপজাতিদের লৌহ-বিধিযুক্ত পারিবারিক প্রথার চেয়ে পুরনো নয়, ক্ষেতে-খামারে চাষ-আবাদ আর গোলামি-প্রথা আইন-সম্মতরূপে ধার্য হওয়ার পর এবং গ্রীক ও (আর্য) ল্যাটিনদের পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এর উৎপত্তি হয়।" এই সঙ্গে মার্ক্স্ জুড়ে দিয়েছেন, "যেহেতু গোড়া থেকেই চাষ-আবাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ, সেইজন্য আধুনিক যুগের পরিবারের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় কেবলমাত্র গোলামি (servitus) নয়, ভূমি-গোলামিও নিহিত আছে। সমাজ ও তার রাষ্ট্রের যে সমস্ত বিশেষ বিরোধ ব্যাপক ও বিস্তীর্ণতর আকারে দেখা দিয়েছে সেই সমস্ত সংক্ষিপ্ত আকারে (পরিবারে) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

জোড়-পরিবার থেকে **একনিষ্ঠবিবাহে** পরিবর্তনই দেখা যায় এই ধরণের পরিবারের মধ্যে। স্ত্রীর বিশ্বস্ততা অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জনকত্ব নির্ভুলরূপে প্রমাণ করার জন্য স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর কর্তৃত্বের অধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়; স্বামী যদি স্ত্রীকে হত্যা করে তাহলে বুঝতে হবে যে সে নিজের অধিকারই প্রয়োগ করেছে।

পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত পরিবারের সঙ্গে আমরা লিখিত ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করি; সঙ্গে সঙ্গে আমরা এমন একটা ক্ষেত্রে প্রবেশ করি যেখানে তুলনা-মূলক আইনবিজ্ঞান আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, এখানে তা থেকে আমরা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভও করেছি। আর বাস্তবিকপক্ষে, পুরুষ-শাসিত পারিবারিক মণ্ডলী যে দলগত বিয়ে থেকে উদ্ভূত জননী-বিধি-শাসিত পরিবার ও আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত পরিবারের মধ্যে পরিবর্তনের স্তর এই প্রমাণের জন্য

আমরা ম্যাক্সিম কোভালেভস্কীর (**পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**, স্টক্‌হলম্‌, ১৮৯০, ৬০—১০০ পৃঃ) কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বর্তমানেও আমরা এই পুরুষ-শাসিত পারিবারিক মণ্ডলীর নিদর্শন দেখ্‌তে পাই, সার্ব ও বুলগারদের মধ্যে "জাদ্রুগা" (বন্ধুবর্গ) ও "ব্রাৎসৎ ভো" (সৌভ্রাতৃ-সঙ্ঘ) নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এই পরিবার কিছুটা পরিবর্তিত আকারে প্রাচ্যবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। প্রাচ্য-জগতের সভ্য জাতি, আর্য ও সেমিটদের মধ্যে অন্তত পারিবারিক প্রথার ক্রম-বিকাশ এইভাবে ঘটেছে বলে মনে হয়।

এরূপ পারিবারিক মণ্ডলীর অস্তিত্বের এখনো প্রচলিত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখ্‌তে পাওয়া যায় দক্ষিণ-ইউরোপের স্লাভ জাতিদের "জাদ্রুগা" প্রতিষ্ঠানে। একজন পুরুষের বহু-পুরুষানুক্রমিক বংশধরদের এবং তাদের স্ত্রীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। এরা সকলে একই পরিবারে বাস করে, যৌথভাবে জমিজমা চাষ করে, যৌথ ধনভাণ্ডার থেকে কাপড়-চোপড় নেয়, খাওয়া-দাওয়া চালায়, আবার যদি কিছু বাঁচে সকলে মিলে একত্রে ভোগ-দখল করে। এই মণ্ডলী শাসিত হয় গৃহস্বামীর (দোমাসিন) নিরঙ্কুশ পরিচালনাধীনে; বাইরে ইনি পরিবারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন, ইচ্ছা করলে পরিবারের অপেক্ষাকৃত ছোট-খাট জিনিসগুলি বেচে ফেল্‌তে পারেন, পরিবারের তহবিলও থাকে তার তাঁবে; এই তহবিলের আয়-ব্যয় ও বাইরে ব্যবসায় পরিচালন সম্পর্কে এঁকে রীতিমত দায়িত্ব-সম্পন্ন থাক্‌তে হয়। পরিবারের সবচেয়ে বুড়ো লোকই যে দোমাসিন্ হবে তা নয়; দস্তুরমত নির্বাচন দ্বারা দোমাসিন্ ঠিক করতে হয়। জাদ্রুগা প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা ও তাদের কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর (দোমাসিনা) দ্বারা। সাধারণত দোমাসিনের স্ত্রীই এই পদলাভ করে। কুমারীদের স্বামী নির্বাচনের সময় এর হাত খুব বেশি থাকে; এমন-কি, তার রায়ই সর্বোচ্চ বিবেচিত হয়। যাহোক, সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পারিবারিক পরিষদের হাতে। পরিবারের সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক নর-নারী এই পরিষদের সদস্য। এই পরিষদের নিকট গৃহস্বামীকে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হয়। পরিষদই সমস্ত বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সদস্যদের বিচারের ভারও এর উপরে, বড় বড় কেনাবেচা, বিশেষত, জমিজমা হস্তান্তর প্রভৃতি সমস্ত কার্য পরিষদ দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

রুশিয়াতেও এই ধরণের বড় বড় পারিবারিক মণ্ডলীর যে অস্তিত্ব ছিল, দশ-বারো বছর আগেও তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অব্‌সিনা বা পল্লি-সমাজের

মত কৃষকদের লৌকিক প্রথাগুলোর মধ্যে যে এগুলি সমান শিকড় গেড়ে রয়েছে এখন তা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। ডালমেশিয়ান বিধিতে লিখিত নামেই (ভারত) কৃষকদের প্রাচীন আইন-গ্রন্থ "ইয়ারো স্লাভের প্রাভদায়" প্রায়ই এ গুলোর উল্লেখ দেখা যায়। পোল ও চেক ইতিহাস সাহিত্যেও এগুলির উল্লেখ দেখা যায়।

হয়স্লারের (১) মতে (Institutes of German Right) জার্মানদের মধ্যেও প্রথমে আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত পরিবার অর্থনৈতিক একক কেন্দ্ররূপে গণ্য হ'তো না; কয়েকটি পুরুষ-পরম্পরা বা কতকগুলো ব্যক্তিগত পরিবার এবং প্রায়ই বহু-সংখ্যক দাস নিয়ে গঠিত "গৃহ-গোষ্ঠীই" আর্থিক কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হ'তো। রোমান পরিবারও যে এই ধরণেরই ছিল তা এখন অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে। ফলে গৃহস্বামীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং তার তুলনায় পরিবারের অন্যান্য লোকের ক্ষমতার সম্পূর্ণরূপে অভাব সম্বন্ধে বর্তমানে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আয়র্ল্যাণ্ডবাসী কেল্টদের মধ্যেও এই ধরণের পারিবারিক মণ্ডলী ছিল বলে ধারণা করা যাচ্ছে। ফ্রান্সের নিভার্নে অঞ্চলে এই প্রথা চলে "পার্সোনারী" নামে ফরাসী বিপ্লবের আমল পর্যন্ত এবং ফ্রাঁশ কঁৎ অঞ্চলে এখনো এই প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। লোয়ার জেলায় (Saone et Loire) ছাদ পর্যন্ত উচ্চ যৌথ কেন্দ্রীয়-হল সহ বড় বড় কৃষকদের বাড়ি এখনো দেখতে পাওয়া যায়। হলঘরের চারদিকে থাকে শয়নকক্ষসমূহ; ছয় থেকে আট ধাপযুক্ত সিঁড়ি ভেঙে এই সমস্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়; এইগুলোতে একই পরিবারের কয়েকপুরুষের লোক একত্রে বাস করে।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আমলে ভারতবর্ষে যৌথ-চাষ-আবাদ প্রথা সহ যৌথ পরিবারের যে অস্তিত্ব ছিল নে-আর্খুস্ ইতিপূর্বেই তা উল্লেখ করেছেন। তা আজও সেই একই জনপদে অর্থাৎ পাঞ্জাবে ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত আছে। কোভালেভস্কী স্বয়ং ককেশাসে একই প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। আলজিরিয়ার কাবিল জাতির মধ্যে এখনো এই প্রথা দেখতে-পাওয়া যায়। এমন কি, আমেরিকাতেও নাকি এই প্রথা প্রচলিত ছিল। জুরিটা কর্তৃক বর্ণিত প্রাচীন মেক্সিকোর "কালপুলি" নামক প্রতিষ্ঠানকে জুড়িতার প্রতিষ্ঠানরূপে

1. A. Heusler, Institutionen des deutschen Rechts, Bd 1—11, Leipzig, 1885-86—Ed.

প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে, কুনো অনেকটা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছেন (in Ausland, 1890 Nos,42-44), পেরুজয়ের সময়, ঐ দেশে মার্ক-প্রথার মত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল (ঐ প্রথাকে বলা হোতো "মার্কা")। এখানে মধ্যে মধ্যে জমি বিলি করা হতো এবং ব্যক্তিগতভাবে সকলে জমি চাষ করতো।

মোটের উপর, ভূমির উপর যৌথ মালিকানা ও যৌথ চাষ-আবাদ সহ পুরুষ-শাসিত যৌথ-পরিবার বলতে আমরা এতদিন যা বুঝে এসেছি, তার তুলনায় ইহা সম্পূর্ণরূপে নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। জননী-বিধি-শাসিত পরিবার থেকে বর্তমানে একবিবাহমূলক পরিবারে পরিবর্তনের যুগে প্রাচীন ভূখণ্ডের সভ্য জাতি ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যৌথ-পরিবার যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা যায় না। কোভালেভস্কী যে এ সম্বন্ধে আরো নতুন সিদ্ধান্ত করেছেন, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। তাঁর মতে, পরিবর্তন যুগের এই প্রথা থেকেই উত্তরকালে ব্যক্তিগত চাষ-আবাদ প্রথাযুক্ত মার্ক বা পল্লি-সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সাময়িকভাবে এবং পরে স্থায়ীভাবে চাষের জমি, চারণ-ভূমি বিলি করা হয়েছিল।

এই সমস্ত পরিবার-গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারিক জীবন কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে রুশদেশের কথা অন্ততপক্ষে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দেশে গৃহস্বামীর দারুণ অখ্যাতি আছে যে, সে পরিবারের তরুণীদের, বিশেষত, পুত্রবধূদের সঙ্গে গর্হিত আচরণ করে থাকে। অনেক সময়েই সে এদেরকে আপন অন্তঃপুরের অন্তর্ভুক্ত করে নিত। রুশ পল্লি-গাথায় এই সমাজ-বিধির পরিচয় পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে।

জননী-বিধি উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে একনিষ্ঠ-বিবাহ দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করে। এ-সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বহুবিবাহ ও বহুস্বামিত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। কোনো দেশে প্রথা দুটি পাশাপাশি প্রচলিত না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে উভয় বিবাহ-প্রথাই, ব্যতিক্রম ও ঐতিহাসিক বিলাস-সামগ্রীরূপে গণ্য হতে বাধ্য। সাধারণত, এইরকম, ঘটতে দেখা যায় না কোনো দেশেই। বহুবিবাহ থেকে বর্জিত পুরুষদের পক্ষে বহু-পত্নিত্ব থেকে পরিত্যক্ত নারীদের নিয়ে সান্ত্বনা লাভ অসম্ভবই মনে হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমনই হোক-না-কেন, সমাজে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমানই দেখা যায়। এই দুই কারণবশত প্রথা দুটো প্রচলিত সামাজিক প্রথায় উন্নীত হ'তে পারে নাই। বাস্তবিকপক্ষে, পুরুষের পক্ষে বহু-বিবাহের অধিকার ভোগ গোলামি

প্রথারই অভিব্যক্তি। কালেভদ্রে মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষেই এই অধিকার ভোগ সম্ভব। জনক-শাসিত সেমিটিক পরিবারে কেবলমাত্র পিতা ও বড় জোর তার এক জোড়া পুত্র বহু-বিবাহের অধিকার ভোগ করতে পারতো। অন্যান্য সকলকেই মাত্র এক-একটি পত্নী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। প্রাচ্য জগতের সর্বত্র এখনো এই দস্তুর; মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিত্তশালী ও অভিজাত এই বিশেষ অধিকার ভোগ করে। ক্রীতদাসীদের কিনে এনে তাদের ভেতর থেকেই প্রধানত স্ত্রী সংগ্রহ করা হয়। অধিকাংশ লোকই কিন্তু এক-পত্নিত্বের অধিকারেই সন্তুষ্ট আছে। ভারতবর্ষে ও তিব্বতে প্রচলিত বহু-স্বামিত্বের অধিকারও এই-রকম ব্যতিক্রম বিশেষ। দলগত বিয়ে থেকে যে কিভাবে এই প্রথার উদ্ভব হ'য়েছে তা নিয়ে গভীর গবেষণার দরকার। এই ধরণের গবেষণা কৌতূহলো-দ্দীপকও বটে। মোটের উপর, পুরুষদের হিংসা প্রবৃত্তির লীলা-নিকেতন মুসলমানদের হারেম প্রথার তুলনায় এই প্রথা অনেক বেশি সহজ-সাধ্য। অন্ততপক্ষে, ভারতবর্ষের নায়ার সমাজে তিন চার জন বা ততোধিক পুরুষ এক সঙ্গে একজন মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু প্রত্যেকেই আবার একই সময়ে অন্য তিন চার জনের সঙ্গে দ্বিতীয় স্ত্রী ভোগ করতে পারে। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, এমন-কি, তার বেশি পত্নি সম্ভোগও সহজ-সাধ্য। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাক্‌লেনান নূতন শ্রেণীর বিবাহ—**ক্লাব-বিবাহের** আবিষ্কার করে যান নি। এই সমস্ত ক্লাবের মধ্যে একই সময়ে একাধিক ক্লাবের সদস্য হওয়া যে পুরুষদের নিকট উন্মুক্ত ছিল, তা নিজেই বর্ণনা করেছেন। ক্লাব বিয়ের ব্যাপারটাকে কিন্তু প্রকৃত বহু-পত্নিত্বের অধিকার বলা যায় না; পক্ষান্তরে, জিরোতুলোঁ উল্লেখ করেছেন যে, ইহা বিশেষ ধরণের দলগত বিবাহ, যাতে পুরুষেরা বহু-পত্নিত্বের এবং নারী বহু-স্বামিত্বের অধিকার উপভোগ করে।

৪। একনিষ্ঠবিবাহমূলক পরিবার

ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বর্বরযুগের মধ্যস্তর থেকে উচ্চস্তরে পরিবর্তনের সময় জোড়-পরিবার থেকেই এই প্রথা উদ্ভূত হয়েছে। এই চরম বিজয় লাভ, সভ্যতার প্রারম্ভেরই অন্যতম নিদর্শন সূচনা করে। পুরুষের প্রাধান্যের উপরেই এর ভিত্তিমূল নিহিত। অবিসংবাদিত সন্তান উৎপাদনই এই ব্যবস্থার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। পিতার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হিসেবে এই সমস্ত সন্তান যাতে যথাসময়ে উত্তরাধিকার-সূত্রে তার সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারে তার জন্যই এইরূপ পিতৃত্বের প্রয়োজন। জোড়-পরিবারের সঙ্গে একনিষ্ঠবিবাহমূলক পরিবারের

পার্থক্য এই যে, এখানে বিয়ের বাঁধনটা ঢের বেশি শক্ত; স্বামী বা স্ত্রী ইচ্ছা করলেই এই বাঁধন ছিন্ন করতে পারে না। বর্তমানে নিয়ম দাঁড়িয়েছে এই যে, একমাত্র পুরুষই বিয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে স্ত্রী ত্যাগ করতে পারে। এখনো প্রথানুযায়ী পুরুষ দাম্পত্যে অবিশ্বস্ততার অর্থাৎ ব্যভিচারের অধিকার ভোগ করতে সক্ষম। (ফরাসী আইন, **কোড্ নেপোলিয়ান** পুরুষকে সুস্পষ্টভাবেই এই অধিকার দিয়েছে, যতক্ষণপর্যন্ত সে রক্ষিতাকে পরিবারের ভেতরে না আনে।) সমাজের বাড়তি বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকার আরো বেশি প্রয়োগ করে চলে। স্ত্রী যদি প্রাচীন যুগের যৌন-প্রথার কথা স্মরণ ক'রে তার পুন-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে তাহ'লে তাকে পূর্বেকার যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

গ্রীকদের মধ্যে আমরা এই নতুন পারিবারিক প্রথাকে সমস্ত কঠোর বিধি-নিষেধগুলোসহ মূর্তিমান অবস্থাতেই দেখতে পাই। অপরপক্ষে, মার্কসের মতে, পুরাবৃত্তে বর্ণিত দেবীদের সামাজিক মর্যাদা প্রাচীনতর যুগের অবস্থাই ব্যক্ত করে। সেই যুগে মেয়েরা তখনো অধিকতর স্বাধীনতা এবং অধিকার, সামাজিক মর্যাদাও উপভোগ করতো। বীরযুগে পুরুষের প্রাধান্য ও গোলাম বালিকাদের প্রতিযোগিতার ফলে দেখা যায় নারীর অনেকখানি অবনতি ঘটেছে। ওডিসি গ্রন্থখানা পড়লেই টেলিমেকাস কিভাবে তার মায়ের মুখ বন্ধ করে দেয় তার পরিচয় পাওয়া যায়। হোমারের কাব্য-সাহিত্যে দেখা যায়, তরুণী বন্দিনীরা বিজয়ীদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বস্তুতে পরিণত হয়েছে; সৈন্যাধ্যক্ষরা একে একে পদমর্যাদা অনুসারে নিজেদের জন্য সবচেয়ে সুন্দরী তরুণীদের বেছে নিচ্ছে। এই ধরণের এক ক্রীতদাসীকে নিয়ে আখিলেস্ ও আগামেম্‌ননের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করেই সমগ্র **ইলিয়াড** মহাকাব্য রচিত হয়েছে। হোমার কাব্যের প্রত্যেক বড় বড় বীর সম্বন্ধে যখনই বর্ণনা করা হয়েছে তখনই যে বন্দিনী কুমারীর সঙ্গে সে যুদ্ধ-শিবিরে শয্যাসুখ উপভোগ করেছিল, তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত তরুণীদের আবার তাদের আপন আপন বাড়িতে, স্বামীর গৃহে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এস্‌খিলেস্ কাব্যে আগামেম্‌নন্ কর্তৃক কাসান্দ্রাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমস্ত ক্রীতদাসীর গর্ভজাত পুত্রেরা পিতার সম্পত্তির অতি অল্প অংশেরই অধিকারী হয়

1. Calpulli: Aztec Family Community.—Ed.

এবং তাদেরকে স্বাধীন মানুষরূপেই গণ্য করা হয়। তিউক্রোস্ তেলামনের এইরূপ অবৈধ সন্তান; একে পিতার নামে পরিচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বিবাহিতা পত্নীকে এই সমস্ত উপদ্রব মুখ বুজে সহ্য করে সতীত্ব ও বিশ্বস্ততা ষোল আনাই রক্ষা করে চল্‌তে হ'তো। তবে বীর-যুগে গ্রীক স্ত্রী যে সভ্য যুগের তুলনায় বেশি সম্মানের অধিকারিণী ছিল তা সত্য। কিন্তু স্বামীর কাছে সে ছিল প্রকৃতপক্ষে তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের জননী, প্রধান গৃহকর্ত্রী, কেনা-দাসীদের অভিভাবিকা মাত্র। পুরুষ ইচ্ছা করলেই এই সমস্ত ক্রীতদাসীকে রক্ষিতারূপে ব্যবহার করতে পারতো এবং সে এইরকম করতেই অভ্যস্তও ছিল। একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে গোলামি-প্রথার অস্তিত্ব, অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে পুরুষের তাঁবে সুন্দরী তরুণী ক্রীতদাসীদের অস্তিত্ব—এই সমস্ত গোড়া থেকেই একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার উপর তার বিশেষ ধরণের ছাপটা অর্থাৎ এই প্রথা যে কেবলমাত্র নারীদের জন্য, পুরুষের জন্য নয়, এই বৈশিষ্ট্য সংযোজিত করে দেয়। আজো অবস্থা ঠিক এই রকমই রয়েছে।

পরবর্তী যুগের গ্রীকদের বেলায় আমাদের অবশ্যই ডোরীয় ও আয়োনীয়দের মধ্যেকার পার্থক্যটা বুঝতে চেষ্টা করা দরকার। স্পার্টা ডোরীয় সমাজের কেন্দ্রস্থল। এখানকার বৈবাহিক সম্পর্কগুলো নানা দিক দিয়ে হোমার-বর্ণিত বৈবাহিক-রীতিগুলোর চেয়েও পুরাতন। স্পার্টায়, সেখানে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুসারে, রাষ্ট্র কর্তৃক সংশোধিত এক প্রকার জোড়-বিবাহ প্রচলিত ছিল। দলগত বিয়ের বহু প্রতীক এই প্রথায় অব্যাহত ছিল। বিয়ের পর সন্তান না জন্মালে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা হ'তো। রাজা আনাক্‌সান্দ্রিদাস (খৃঃ পূঃ ৬৫০) নিঃসন্তান প্রথমা পত্নী থাকতেও দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করে একসঙ্গে দুই সংসার পরিচালনা করতেন। একই যুগের রাজা আরিস্টোনেস্ বন্ধ্যা দুই পত্নীর জীবিত অবস্থাতেই তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করেন। তবে পূর্বেকার দুই পত্নীর মধ্যে এক জনকে তিনি বিদায় করে দেন। অপর পক্ষে, কয়েকভাই মিলে যৌথভাবে একই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। কোন বন্ধু তার বন্ধুপত্নীকে পছন্দ হ'লে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে পারতো। কারো স্ত্রীকে, বিসমার্কের ভাষায়, কোন "জননাথের" কাছে ছেড়ে দিলে অন্যায় বিবেচিত হ'ত না, এমন-কি, সে অ-নাগরিক হলেও। প্লুটার্কের গ্রন্থের এক অনুচ্ছেদে দেখা যায়, স্পার্টাবাসিনী এক নারী এক নাছোড়বান্দা প্রণয়ীকে সাক্ষাৎকারের জন্য স্বামীর কাছে পাঠাচ্ছে। শোম্যানের মতে এই দৃষ্টান্ত আরো বেশি যৌন-স্বাধীনতারই পরিচায়ক।

মোটের উপর, প্রকৃত ব্যভিচার—স্বামীর অজ্ঞাতসারে গোপনে প্রণয় অভিসার সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। অপরপক্ষে, ঘর-গৃহস্থালিতে, বিশেষত, সমৃদ্ধির যুগে, গোলামি-প্রথাও অজ্ঞাত ছিল। স্বাধীনতায় বঞ্চিত "হেলট" অর্থাৎ গোলামরা কর্তার জমি-জমায় পৃথকভাবে বাস করতো। কাজেই, স্পার্টানদের হৃদয়ে এদের স্ত্রী ভোগ করার বাসনা খুব কমই জাগ্রত হওয়ার অবসর পেত। এই সমস্ত কারণবশত স্পার্টার মেয়েরা গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলের মেয়েদের তুলনায় যে অনেক বেশি মান-মর্যাদার অধিকারিণী হবে তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। প্রাচীন যুগের পণ্ডিতরা গ্রীক নারী-সমাজের মধ্যে কেবলমাত্র স্পার্টার নারী ও এথেন্সের খ্যাতনামা হেতেরে বারাঙ্গনাদের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করে থাকেন এবং এদের উক্তি ও মতামতগুলো লিখে রাখার যোগ্য বলে মনে করেন।

আয়োনীয় গ্রীকদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। এথেন্স এখানে আদর্শস্থানীয়। তরুণীরা কেবলমাত্র সুতাকাটা, কাপড় বুনা ও সেলাইয়ের কাজ এবং বড়জোর সামান্য-কিছু লেখাপড়া শিখতো। প্রকৃত পক্ষে, তারা পৃথকভাবেই বসবাস করতো এবং মেয়ে ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উপায়ও ছিল না। বাড়ির এক পৃথক মহলে মেয়েরা বাস করতো; মেয়ে-মহল থাকতো উপরতলায় অথবা বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগে। এখানে পুরুষের, বিশেষত, অজানা লোকজনের প্রবেশ আদৌ সহজ-সাধ্য ছিল না। বাড়িতে অভ্যাগত পুরুষদের সমাগম হ'লেই মেয়েরা অন্দর মহলে ঢুকে পড়তো। ক্রীতদাসীদের সঙ্গে না নিয়ে তাদের বাইরে বের হবার উপায় ছিল না। বাড়ির ভেতরেও তাদের নিয়মিত প্রহরার অধীন থাকতে হ'তো। আরিস্টোফেনিস বলেন, লম্পটদের ভয় দেখানোর জন্য মোলোশিয়ান শিকারী কুকুর রাখা হ'ত। এশিয়ার শহরগুলোর মেয়েদের পাহারা দেওয়ার জন্য অন্ততপক্ষে হিজ্‌ড়েদের নিয়োগ করা হোত। এমন কি, হেরোদোতাসের যুগেও চিওস্‌ দেশে নপুংসক তৈরি করা ও চালান দেওয়া রীতিমত ব্যবসাতে পরিণত হয়েছিল। ওয়াখ্‌সমুথের মতে কেবলমাত্র বর্বরদের জন্য নপুংসক সরবরাহ করা হয় নাই। ইউরিপিদেস গ্রন্থে নারীকে "অয়কুরেমা" নামে অভিহিত করা হয়েছে। শব্দটা ক্লীবলিঙ্গ। এই গ্রন্থ অনুসারে নারী ঘর-গৃহস্থালির তদারকির উপকরণমাত্র। সন্তান উৎপাদনই ছিল তার সবচেয়ে বড় ধান্ধা; তাছাড়া, সে এথেনীয়দের কাছে বড় জোর প্রধানা পরিচারিকারূপে গণ্য হোত। পুরুষ ব্যায়াম

অত্যাব করতো, সভাসমিতিতে যোগ দিত ; স্ত্রীর কাছে এই সমস্তই ছিল নিষিদ্ধ। পুরুষরা গোলাম নারীদের ভোগ করতে পারতো ; এথেন্সের সমৃদ্ধির যুগে সমাজে ব্যাপক বেশ্যাবৃত্তির প্রচলন ছিল ; রাষ্ট্র বেশ্যাবৃত্তিকে কু-নজরে দেখ্‌তো না ; স্পার্টার মেয়েরা চরিত্রবলে যেমন প্রাচীনকালে সুখ্যাতি লাভ করে, এই বেশ্যাবৃত্তির ফলে তেমনিই এথেন্সের মেয়েরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ ক'রে অন্যান্য সমাজের মেয়েদের বহুদূর অতিক্রম করে ; কিন্তু হেতেরে না হলে অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন না করলে মেয়েরা এইরূপ উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পেত না, ইহাই ছিল এথেনীয় পরিবারের সবচেয়ে অপযশ।

কালক্রমে এই এথেনীয় পরিবার এমন আদর্শে পরিণত হয় যা কেবলমাত্র আয়োনীয় সমাজের বাকি অংশটা নয়, ইউরোপীয় মহাদেশ ও উপনিবেশসমূহের সমস্ত গ্রীকরাও এই আদর্শে নিজেদের পারিবারিক সম্পর্কগুলো গঠন করে নেয়। কিন্তু তালাচাবি ও কড়া প্রহরা সত্ত্বেও গ্রীক নারীরা স্বামীদের ঠকাবার প্রচুর সুযোগ পায়। স্ত্রীদের প্রতি প্রণয়-ভালবাসা দেখানো পুরুষদের কাছে লজ্জার বিষয় বলে মনে হ'তো ; তারা দিনরাত হেতেরে প্রেমেই মজে থাকৃতো কিন্তু মেয়েদের অবনতি পুরুষদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে তাদেরকেও অবনত করে। অধঃপাতের চরম সীমায় নেমে তারা বালক-প্রেমে পর্যন্ত নিমজ্জিত হয় এবং পুং-মৈথুনের (গ্যানিমিডের) পুরাবৃত্ত অনুযায়ী নিজেদের এবং তাদের দেবতাদেরও অধঃপাতিত করে।

প্রাচীন যুগের সবচেয়ে উন্নত ও সবচেয়ে উৎকর্ষ-প্রাপ্ত জাতির মধ্যে যতদূর বিশ্লেষণ করা সম্ভব ততদূর বিশ্লেষণ ক'রে আমরা একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথা উদ্ভবের এই রকম ছবিই দেখতে পাই। ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম থেকে এই বিয়ে উদ্ভূত হয় নি, আর বাস্তবিক পক্ষে, যৌন-টানের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতিও নেই। সুযোগ-সুবিধে লাভই বিয়ের উদ্দেশ্য ; পূর্বের মত পরেও বিয়ের এই সনাতনী রূপটা অব্যাহত ছিল। স্বাভাবিক কোন কারণবশত নয়, স্রেফ অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ আদিম যুগের স্বাভাবিক ও যৌথ ধন-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের জয় লাভকে ভিত্তি করে তারই প্রথম অভিব্যক্তিরূপে এই পারিবারিক-প্রথা উদ্ভূত হয়। পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য, পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য একমাত্র তারই ঔরসজাত সন্তান প্রজনন—একনিষ্ঠ-বিবাহের যে ইহা একমাত্র উদ্দেশ্য, গ্রীকরা তা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করে। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোর বেলায় বিবাহ বোঝার মতই গণ্য হ'তো। ইহা ছিল

দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের নিকট অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এখেনে বিয়ে কেবলমাত্র বাধ্যতামূলকই করা হয়নি, তথাকথিত দাম্পত্য কর্তব্যগুলোর মধ্যে পুরুষদের জন্য সর্বনিম্ন একটা তালিকাও অবশ্যকরণীয়রূপে আইনজারি করা হয়েছিল।

কাজে কাজেই, ইতিহাসে কোনরকমেই নর ও নারীর সম্প্রীতির মধ্যে একস্ত্রী-বিবাহের অভ্যুদয় ঘটেনি। নর-নারীর সর্বোচ্য সম্প্রীতির সর্বোচ্চ রূপে তো একে কল্পনা করা যায়ই না। অপরদিকে, একপক্ষের অপর পক্ষের প্রাধান্যের উপরে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত নর ও নারীর মধ্যে যুদ্ধঘোষণারূপেই ইহা আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৪৬ সালে আমার ও মার্ক্সের লেখা এক পুরাতন অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে নিম্নরূপ লেখার সন্ধান পাই : "সন্তান জননের জন্য নর ও নারীর মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রম-বিভাগের সৃষ্টি হয়।" বর্তমানে আমি এর সঙ্গে আরো কিছু জুড়ে দিতে পারি : একনিষ্ঠ-বিবাহে নর ও নারীর মধ্যে যে বিরোধ বেড়ে চলে তাই ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী-সংগ্রামরূপে আত্মপ্রকাশ করে, প্রথম শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে। একনিষ্ঠ-বিবাহ বড় রকমের ঐতিহাসিক অগ্রগতিও বটে ; কিন্তু একই সময়ে, গোলামি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ এমন একটা যুগ সৃষ্টি করে যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এই যুগে প্রত্যেকটি অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক পশ্চাদ্‌গতিরও সূচনা করে। এখানে একটা দলের সমৃদ্ধি ও বিকাশ অন্যদলের দুঃখ-দৈন্য ও নিগ্রহের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন হয়। ইহা সভ্য সমাজের জীবকোষ বিশেষ, যার ভেতরে আমরা এমন-সব বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের প্রকৃতি লক্ষ্য করার অবসর পাই যা সভ্য-সমাজে পুরাপুরি বিকাশ লাভ করেছে।

জোড় পরিবার, এমন-কি, একনিষ্ঠবিবাহের জয় লাভের পরেও প্রাচীনযুগের যৌন-সম্ভোগের আপেক্ষিক স্বাধীনতা লোপ পায়নি মোটেই। "পুনালুয়াদল গুলোর ক্রমিক বিলোপ সাধনের সঙ্গে প্রাচীন দাম্পত্য প্রথা ক্রমশ সংকোচ-প্রাপ্ত হ'লেও অগ্রগামী সমাজে পারিবারিক প্রথাকে এখনো তা ঘিরে আছে। এমন-কি, সভ্যতার যুগে পর্যন্ত এর জের চলে এসেছে।......... শেষ পর্যন্ত ইহা নতুন হেতেরে প্রথায় অন্তর্হিত হয়েছে। সভ্যতার যুগেও এই প্রথা (হেতেরে) মানবজাতির অনুসরণ করে পরিবারের উপর কালো যবনিকার সৃষ্টি করেছে।" মর্গ্যান হেতেরে প্রথা বলতে বিয়ের আগে পুরুষ ও অবিবাহিতা

মেয়েদের যৌনি-সংসর্গ—এই রকমই অর্থ করেছেন। একনিষ্ঠবিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথার অস্তিত্ব ছিল এবং সকলেরই জানা আছে যে, সভ্যতার সমগ্র যুগে ইহা নানা আকারে দেখা দিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করেছে। দলগত বিয়ে থেকে, ধর্মীয় উৎসবাদিতে নারীর আত্মসমর্পণ-প্রথা থেকেই প্রত্যক্ষভাবে এই হেতেরে প্রথার উৎপত্তি। এইভাবে আত্মসমর্পণ করে নারী সতীত্বের অধিকার ক্রয়ে সক্ষম হয়। অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রয় পূর্বে ধর্মের অঙ্গরূপেই গণ্য হোত। ইহা সম্পন্ন হোত প্রণয়-দেবতার মন্দিরে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রথমে মন্দিরের তহবিলেই জমা হোত। আর্মেনিয়ার আনাইতিস্ দেবতা ও করিন্থের আফ্রেদিতে দেবীর ক্রীতদাসীরা, তথা ভারতীয় মন্দিরের দেবদাসীরা—তথাকথিত বায়াদেররা (পর্তুগীজ-"বায়লাদেরা" শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ—নর্তকী) জগতের সর্বপ্রথম বেশ্যা। প্রথম প্রথম এইরূপ দেবদাসী হওয়া প্রত্যেক নারীরই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কেবলমাত্র মন্দিরের পূজারিণীরাই অন্য সমস্ত মেয়ের প্রতিনিধিরূপে এই অধিকার ভোগ করতে থাকে। বিয়ের আগে মেয়েদের যে স্বাধীনভাবে যৌনসম্ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা থেকেই অন্যান্য জাতের মধ্যে হেতেরে প্রথার উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ দলগত বিয়ের প্রতীক বা জেররূপে ইহা অন্য আকারে দেখা দেয়। দূর অতীতে বর্বর যুগের উচ্চস্তর থেকে, ধন-সম্পত্তির অসাম্য ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, কেনা-গোলামদের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মজুরির বিনিময়ে গতর-খাটানো মজুরদলের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং এর আনুষঙ্গিক লেজুড় হিসেবে ক্রীতদাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মদানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনা নারীদের পেশাদার বেশ্যাবৃত্তিরও সৃষ্টি হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে দলগত বিয়ের কাছ থেকে দু-মুখো অবদান লাভ করে। সভ্যতা নামক বস্তুর সবকিছুই এমনি দু-মুখো, জটিলতাপূর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভরা ও পরস্পর-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ; একদিকে একনিষ্ঠবিবাহ প্রথা আর দিকে হেতেরে প্রথা আর তার চরম রূপ বেশ্যাবৃত্তি। হেতেরে প্রথা অপর পাঁচটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতই একটা প্রতিষ্ঠান, ইহা আদিম যুগের যৌন স্বাধীনতার জের বা লেজুড়স্বরূপ। পুরুষের সুখ-সুবিধের জন্যেই এর অস্তিত্ব। পুরুষ কেবলমাত্র এই প্রথা বরদাস্ত করেনি; সকলে, বিশেষত, শাসকশ্রেণী ফূর্তির সঙ্গেই এর মজা লুটেছে। মুখে কিন্তু এই প্রথার ভয়ানক নিন্দে করা হয়। আসল কথা এই যে, এজন্য পুরুষকে আদৌ নিন্দার ভাগী হতে হয় না, যত অভিসম্পাত শুধু নারীর মাথাতেই পড়ে। তাদের ঘৃণিত জীবরূপে গণ্য করে

সমাজচ্যুত করা হয়। সমাজের মূলবিধিরূপে নারীর উপর পুরুষের অবাধ প্রাধান্য আরেকবার এইভাবে ঘোষণা করা হয়।

একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় অসামঞ্জস্য দেখা দেয়—হেতেরে প্রথার সুখ-সম্ভোগকারী পুরুষ ও তার উপেক্ষিতা স্ত্রী। মানুষের হাতের একটা পুরা আপেল যেমন আধখানা খেয়ে ফেলার পর আর সেটা পুরা আপেল থাকেনা, ঠিক এই অসামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্যবস্থাতেও তেমনি এর একটা দিক পরিহার করে অপর দিক পাবার উপায় নেই; তা সত্ত্বেও, মানুষ অন্যভাবে চিন্তা করেছে, যে পর্যন্ত নারী তাকে এ সম্বন্ধে দস্তুরমত শিক্ষা না দেয়। একনিষ্ঠবিয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুটো স্থায়ী সামাজিক বস্তুরও উৎপত্তি হয়—স্ত্রীর উপপতি ও ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্বামী। পুরুষরা নারীদের উপর জয়লাভ করে, কিন্তু বিজিতারা উদারতা দেখিয়েই বিজেতাকে গৌরবমুকুট পরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং এর জন্যে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তা দমন করা অসম্ভব হয়। একনিষ্ঠ-বিবাহ ও হেতেরে প্রথার পাশাপাশি ইহা অপরিহার্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ছেলেমেয়ের জনকত্ব নির্ধারণ পূর্বের মত নৈতিক জ্ঞান-বিশ্বাসের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। সমাধানের অতীত এই অসামঞ্জস্যের প্রতিকারের জন্য "কোড্ নেপোলিয়নের" ৩১২ ধারায় পাঁতি দেওয়া হয়—"বিয়ের সময় নারীর গর্ভসঞ্চার হ'লে স্বামীই তার জনক বিবেচিত হবে।" একনিষ্ঠবিবাহের তিন হাজার বছরের চরম পরিণতি এই রকমই দাঁড়ায়।

সভ্যতার যুগের প্রারম্ভে মানবসমাজ কতকগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো বিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে বুকে করে নিয়েই অগ্রসর হয়। এই সমস্ত বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের সমাধান করা সমাজের সাধ্যের অতীত বা ঐগুলো অতিক্রম করার ক্ষমতাও তার নেই। একনিষ্ঠবিবাহমূলক পরিবার যেখানেই ঐতিহাসিক মূল সত্তাটা বজায় রেখে পুরুষের একাধিপত্যের মধ্যে নিহিত নারী-পুরুষের তীব্র বিরোধটা পরিস্ফুট করে তোলে, সেখানে, পরিবারের ভেতরেই, সমাজের ভেতর নিহিত দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্যগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান। যে বিবাহিত জীবন এই বিবাহ-প্রথার মৌলিক নিয়ম-কানুন অনুসারেই চলে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, আমরা কেবল সেইরূপ একনিষ্ঠবিবাহ-মূলক পরিবারের কথাই বলছি। সব রকমের বিয়ে যে এইরকম দাঁড়ায় না জার্মান রুচিবাগীশরা (Philistine)

তা সব চেয়ে বেশি জানে। রাষ্ট্রের মত বাড়িতেও তারা শাসন চালাতে অক্ষম। স্বামীর অযোগ্যতাবশত জার্মান-স্ত্রীরাই গৃহের কর্তৃত্ব অধিকার করে বসে। আত্ম-সান্ত্বনাস্বরূপ জার্মান স্বামীরা ফরাসী স্বামীদের চেয়ে নিজেদের অধিকতর ভাগ্যবান মনে করে। বাস্তবিকপক্ষে, ফরাসী পুরুষদের অবস্থা ছিল আরো বেশি কাহিল।

একনিষ্ঠ-বিবাহমূলক পরিবার গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীনযুগসুলভ কঠোর আকার ধারণ করলেও সবসময়ে এবং সব জায়গাতেই যে এমনতর ঘটে তা-নয়। গ্রীকদের মত সুমার্জিত-রুচিবিশিষ্ট জাত না হ'লেও বিশ্বজয়ী হিসাবে রোমানদের চিন্তাশক্তি ব্যাপকতর ছিল। রোমান-সমাজে মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ও মান মর্যাদা ভোগ করে। পত্নীর উপর জীবন-মরণের অধিকার দ্বারা পত্নীর বিশ্বস্ততা অর্থাৎ সতীত্ব অটুট রাখবে—রোমানদের ছিল এই রকম বিশ্বাস। তাছাড়া, রোমান নারীও রোমান পুরুষের মত স্বেচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারিণী ছিল; কিন্তু একনিষ্ঠবিবাহের সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ সম্ভব হয় ইতিহাসে জার্মানজাতির অভ্যুদয়ের পরে। কারণ, সম্ভবত এদের মধ্যে দরিদ্রতাবশত তখনো জোড়-পরিবার থেকে একনিষ্ঠবিবাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভূত হতে পারেনি। তাসিতুস-বর্ণিত তিনটে ব্যাপার থেকে আমরা এই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি: প্রথমত, জার্মানরা একটি মাত্র স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তো, নারীকেও রীতিমত সতীত্ব রক্ষা করে চল্‌তে হ'তো। গণ্যমান্য মানুষ ও উপজাতীয় সর্দাররা বহু পত্নী উপভোগ করতো। জোড়-পরিবার প্রথার কেন্দ্র আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজেও এই একই অবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, জননী-বিধি থেকে জার্মান সমাজ তখন সবেমাত্র জনক বিধিতে পা ফেলে থাকবে; কারণ, জননী-বিধি অনুসারে নিকটতম সগোত্র পুরুষ-আত্মীয় মায়ের ভাইকে তখন জার্মানরা বাপের চেয়েও নিকটতর আত্মীয় মনে করতো। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজেও এই রীতি। মার্ক্‌স্‌ প্রায়ই বলতেন যে, এদের মধ্যেই আমাদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা বুঝবার চাবিকাঠি রয়েছে। তৃতীয়ত, জার্মানরা নারীজাতিকে যথেষ্ট সম্মান করতো; সর্ব-সাধারণের কাজ-কর্মেও তাদের এক্তিয়ার ছিল। একনিষ্ঠবিবাহ প্রথার বিশেষত্ব পুরুষ-প্রাধান্যের সঙ্গে এই প্রথার পুরাপুরি বিরোধই দেখা যায়। এই সমস্ত কারণ-বশত জার্মানরা ছিল স্পার্টানদেরই জুড়িদার। স্পার্টার ডোরীয় সমাজেও আমরা দেখতে পাই, জোড়-পরিবার প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। কাজেই দেখা যায়, এদিক দিয়েও জার্মানদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায় এক নতুন শক্তি ও নতুন প্রভাব উদ্ভূত হয়। রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপরে বিভিন্ন

জাতির সংমিশ্রণে যে নতুন একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথা দেখা দেয় তাতে পুরুষের প্রাধান্যকে অনেকটা মোলায়েম করে নারীকে অন্ততপক্ষে বাইরের দৃষ্টিতে অনেকটা স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদা প্রদান করে। পৌরাণিক যুগে এইরকম কোনদিনই সম্ভব হয় নি। বাস্তবিকপক্ষে, এই সময়ে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দাঁড়ায় তাতে একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার শ্রেষ্ঠ অবদান ব্যক্তিগত যৌন-প্রেম এই প্রথার ভিতরে, এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রয়োজন-মত এর সঙ্গে বিরোধিতা করেও মাথা তুলবার অবকাশ পায়। দুনিয়ায় এতদিন এই ব্যক্তিগত প্রেম অজ্ঞাতবস্তুই ছিল।

জার্মানরা তখনো জোড়-পরিবারে বাস করতো এবং যতদূরসম্ভব জোড়-পরিবারের স্বধর্ম অনুসারে একনিষ্ঠ-বিবাহে নারীর মর্যাদা নির্ধারণ করে নিয়েছিল বলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। জার্মান চরিত্রে কোন চমকপ্রদ অলৌকিক নৈতিক পবিত্রতার পরিণতি হিসাবে তা উদ্ভূত হয় নি। একনিষ্ঠ-বিবাহের নৈতিক বিরোধগুলো থেকে কার্যত জোড়-পরিবার মুক্ত ছিল বলেই এ রকম সম্ভব হয়েছিল। অপরপক্ষে, দেশত্যাগের সঙ্গে, বিশেষত, দক্ষিণ-পূর্বে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী স্টেপস্ নামক তৃণভূমিতে সেখানকার যাযাবরদের সঙ্গে বিচরণের সময় জার্মানদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতিও ঘটে। এই সমস্ত যাযাবরের কাছ থেকে জার্মানরা ঘোড়-সওয়ারী বিদ্যা আয়ত্ত করে নিলেও তাদের অনেক জঘন্য অপ্রাকৃতিক দুর্নীতিও গ্রহণ করে। আমিয়ানুস্ তাইফেলিদের এবং প্রোকোপিয়ুস্ হেরুলী জাতির সম্বন্ধে বিবরণী লিপিবদ্ধ করার সময় এই কাহিনী জলন্ত ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন।

একমাত্র একনিষ্ঠ-বিবাহ-মূলক পারিবারিক প্রথা থেকে আধুনিক যুগের যৌনপ্রেমের উদ্ভব সম্ভব হলেও এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র বা প্রধানত এই পারিবারিক প্রথার মধ্যেই স্ত্রী ও স্বামীর পারস্পরিক টান ও ভালবাসারূপে আধুনিক যৌনপ্রেম উদ্ভূত হয়েছে। পুরুষ-প্রভুত্বের অধীনে একনিষ্ঠবিবাহে এই প্রেমের অবকাশ খুব কমই মিলতে পারে। ইতিহাসের সমস্ত সক্রিয় শ্রেণীর অর্থাৎ সমস্ত শাসকশ্রেণীর মধ্যে জোড়-পরিবারের আমল থেকেই বিবাহ-বন্ধ সুযোগ-সুবিধার সহায়করূপে গণ্য হয়ে আসে এবং বিয়ে-সাদী বাপ-মাই ঘটিয়ে এসেছে। যৌনগত টান বা কাম-প্রবৃত্তিতে সকল মানুষের (অন্ততপক্ষে, যদি তারা শাসকশ্রেণীভুক্ত হয় তাদের) অধিকার রয়েছে। যৌন-প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ ধরণের রূপ হিসাবে ইতিহাসে যৌন-প্রেমের যে প্রথম রূপ উদ্ভূত হয় তা,

অর্থাৎ মধ্যযুগের বীরদের প্রেম মোটেই দাম্পত্য প্রণয় নয়। ফ্রান্সের প্রোভেন্সাল সমাজে এই প্রেম ছিল সোজাসুজি ব্যভিচার। প্রেমের কবিতা রচনাকারী কবিরা ব্যভিচারের স্তব-স্তুতিতেই মুখর হন। জার্মান "টাগেলিডার" গ্রন্থের "আল্‌বা"গুলো (ভোরের গাথা) প্রোভেন্সালদের সেরা প্রেমের কবিতা। এই সমস্ত গাথায় চমৎকার ভাষাতেই প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়, কেমন করে কোন্ বিখ্যাত বীর তার প্রণয়িনী, অপরের স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছে। বাইরে দাঁড়িয়ে প্রহরী। প্রথম উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গেই সে বীরবরকে জাগিয়ে দেয়, যাতে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে সে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে। তারপর বিদায়ের পালা। কাব্যরস একেবারে চরমে উঠে। উত্তরাঞ্চলের ফরাসীরা, তথা, সুযোগ্য জার্মানরাও এই ধরণের প্রেমের কবিতা এবং এর জুড়িদার পরকীয়া প্রেম গ্রহণ করে। একই ধরণের অবৈধ বিষয় নিয়ে আমাদের এশেনবাখের বুড়ো উল্‌ফ্রাম্ তিনটে সরস গান রচনা করেন; বীররসাত্মক তিনটে লম্বা কবিতাও তিনি রচনা করেন। কিন্তু উষার গানগুলোকেই আমি শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করি।

আজকাল বুর্জোয়া বিয়ের দু' রকম প্রথা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ক্যাথলিক দেশগুলোয় বাপ-মা পূর্বের মত তাদের জোয়ান বুর্জোয়া ছেলেদের যোগ্যা ভার্যা জোগাড় করে দেয়। ফলে একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার সবকিছু গোঁজামিল ও অসামঞ্জস্য এতে ষোলকলায় বিকাশ লাভ করে। স্বামী মজে হেতেরে-প্রেমে, স্ত্রীও ব্যভিচারের সুখ ষোল আনা উপভোগ করে। যতদূরসম্ভব, এই জন্যই ক্যাথলিক গির্জা বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা বিলোপ করে। কারণ, মৃত্যুব্যাধির মত ব্যভিচারেরও যে ঔষধ নাই, ক্যাথলিক গির্জা—তা হাড়ে হাড়েই বোঝে। অপর পক্ষে, প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলোর দস্তুর এই যে, বুর্জোয়া পরিবারের ছেলেরা অল্প-বিস্তর স্বাধীনভাবে স্বশ্রেণীর ভেতরে স্ত্রী-বাছাইয়ের অধিকার ভোগ করে; কাজেই এই বিয়েতে প্রেমের ছিটে-ফোঁটা থাক্‌তে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট সুলভ ভণ্ডামি অনুসারে, অন্ততপক্ষে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে এইরূপ প্রেম-ভালবাসার অস্তিত্ব স্বীকার করে লওয়া হয়। এখানে পুরুষ তেমন সক্রিয়ভাবে হেতেরে-প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করে না। মেয়েদেরও ততটা ব্যভিচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক ধরণের বিয়েতেই দেখা যায়, মানুষের পূর্বতন প্রকৃতিটা বদলায় না। আর প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলোর নাগরিকদের অধিকাংশই নীতিবাগীশ ভণ্ডের দল (philistines)। এই দুই কারণবশত বড় বড় বিয়েগুলোর গড়

হিসেব নিলে দেখা যায় প্রোটেস্ট্যান্ট একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথা, দাম্পত্যজীবন আসলে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমিতেই পর্যবসিত হয়, যদিও বিবাহিত জীবনকে বর-কন্যার স্বর্গসুখরূপে কল্পনা করা হয়। এই দুই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায় উপন্যাসের পাতায়। ফরাসী উপন্যাসে ক্যাথলিক বিয়ের আর জার্মান উপন্যাসে প্রোটেস্ট্যান্ট বিয়ের নিখুঁত ছবি দেখতে পাওয়া যায়। উভয় প্রকার উপন্যাসেই দেখা যায়, "নায়ক তার অভীপ্সিত বস্তু লাভ করেছে।" জার্মান উপন্যাসে নায়ক লাভ করে তার মনের মত প্রেয়সী ; ফরাসী উপন্যাসে স্বামীর পোড়া কপালে জোটে তার পত্নীর পর-পুরুষে আসক্তি। এই দুই শ্রেণীর নায়কের মধ্যে কার বরাত বেশি মন্দ তা নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য নয়। কারণ জার্মান উপন্যাসের একঘেয়েমি ফরাসী বুর্জোয়ার পক্ষে অসহ্য ; তেমনি ফরাসী উপন্যাসের "নীতিহীনতাও" জার্মান রুচিবাগীশদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু "বার্লিন আজকাল রাজধানীতে পরিণত হচ্ছে" ; কাজে কাজেই, ব্যভিচার, হেতেরে প্রথা ইত্যাদি আজকাল এই শহরে নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত। সেই জন্য জার্মান উপন্যাসেও এই সমস্ত বস্তু প্রবেশ লাভ করতে আরম্ভ করেছে।

উভয়ক্ষেত্রেই বিয়ে উভয় পক্ষের শ্রেণীগত মর্যাদা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তদনুসারে সকলসময়েই সুযোগ-সুবিধা-মূলক সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত। উভয় ক্ষেত্রেই এই সুযোগ-সুবিধার বিয়ে প্রায়ই বেয়াড়া ধরণের বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়। কখনো কখনো স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই বেশ্যাবৃত্তির অপরাধে অপরাধী। তবে সাধারণত নারীকেই এই বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। বাজারের সাধারণ বেশ্যা থেকে বিবাহিতা নারীর পার্থক্য এই যে, সে দিন-মজুরের ঘণ্টা হিসাবে দেহ-বিক্রয় না করে চিরদিনের জন্যে নিজেকে বিক্রী করে গোলামে পরিণত হয়। সুযোগ-সুবিধা-মূলক সকল প্রকার বিয়ে সম্পর্কে ফুরিয়েরের খুব খাঁটি কথাই বলেছেন। তাঁর মতে : "ব্যাকরণে দুটো নেতিবাচক শব্দ যেমন সত্তাবাচক একটা শব্দের সৃষ্টি করে, তেমনি বিয়ের নীতিশাস্ত্রে দুটো বেশ্যাবৃত্তি পরস্পরের সঙ্গে মিলে (রাষ্ট্রের মঞ্জুরি লাভ করুক আর নাই-ই করুক) একটা পুণ্যের সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন-প্রেম কেবলমাত্র নিগৃহীত শ্রেণীগুলোর মধ্যে অর্থাৎ আজকালকার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই বস্তুরে পরিণত হতে পারে এবং হয়েছেও। এখানে চল্‌তি একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথার মূল ভিত্তিটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য একনিষ্ঠ-বিয়ে ও পুরুষ-প্রাধান্যের সৃষ্টি এখানে তার, সম্পূর্ণরূপে অভাব দেখা যায়। কাজেই, এখানে পুরুষ-

প্রাধান্য কলাবার উপযোগী কোনরূপ অনুপ্রেরণাও দেখা যায় না। আরো একটা ব্যাপার এই যে, পুরুষ-প্রাধান্য খাটানোর মত উপায়েরও অভাব হয়েছে। এই প্রাধান্য সংরক্ষণের উপযোগী বুর্জোয়া আইন-কানুন কেবলমাত্র পয়সাওয়ালা লোক আর শ্রমজীবীদের সঙ্গে তাদের কাজ-কারবার সম্পর্কেই বিধিবদ্ধ আছে। এই আইন-কানুনের সাহায্য নিতে হ'লে পয়সা খরচের দরকার। মজুরদের দৈন্যদশা; কাজেই, স্ত্রীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণের বেলায় তারা কি করে আইনের সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারে? এখানে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ব্যক্তিগত ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। বড় বড় শ্রমশিল্পগুলো ঘরের বৌদের বাইরে এনে মজুরের বাজারে ও কলকারখানায় ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রী এখন অনেক সময় পরিবারের রুজি-রোজগারেরও কর্তা। কাজেই নির্ধন শ্রমজীবীদের ঘর-সংসারে পুরুষ-প্রাধান্যের অবকাশ একরূপ নেই বললেই চলে। তবে একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথা প্রবর্তনের পর নারীর উপর যে নৃশংস ব্যবহার শিকড় গেড়ে বসেছে, তার কিছুটা অবশ্য এখানেও রয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত কারণবশত মজুর পরিবারকে আর খাঁটি এক-পতি-পত্নিত্ব মূলক বলা চলে না। পরস্পরের প্রতি প্রচুর প্রেম-ভালবাসা ও অনুরক্তি এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের সকল প্রকার আশীর্বাদ লাভ সত্ত্বেও নির্ধন শ্রমজীবীর পরিবার একনিষ্ঠ-বিবাহ-মূলক পরিবারের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে। কাজেকাজেই, একনিষ্ঠ-বিবাহ-মূলক পরিবারের চিরন্তনী সঙ্গী হেতেরে প্রীতি ও পরপুরুষে-আসক্তি এখানে একরূপ নেই বললেই চলে। নারী আবার বিবাহ-বন্ধন ছেদনের অধিকার ফিরে পায়; পরস্পরের সঙ্গে যখন বনিবনার অভাব হয় নারী ও পুরুষ তখন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগই শ্রেয় মনে করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, শ্রমজীবীদের বিয়েকে কেবলমাত্র ভাবাতত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে মোটেই নয়, একনিষ্ঠ-বিয়ে বলা চলে।

আমাদের আইনবিদ্‌রা অবশ্যই আজকালকার আইন-কানুনের মধ্যে এমন প্রগতি-ধারা দেখতে পান, যাতে মেয়েদের তরফ থেকে অভাব-অভিযোগের কোন কারণই থাক্‌তে পারে না। বৈধ বিয়ে চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। দুই পক্ষ স্বাধীনভাবে এই চুক্তি নিষ্পন্ন করবে। বিবাহিত জীবনে উভয় পক্ষেরই সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব থাক্‌বে—বর্তমান সভ্যজগতের আইন-কানুনগুলি এই শর্ত দুটো বেশি পরিমাণেই মেনে চলে। আইনজ্ঞগণ বলেন: "দাবি দুটো যদি যথাযথমত নিষ্পন্ন হয়, তাহলে মেয়েদের সমগ্র অভাব অভিযোগই পূরণ হবে।"

র‍্যাডিক্যাল রিপাবলিক্যান বুর্জোয়ারা যেরূপ যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে শ্রমিকদের মামলা ডিসমিস করে থাকেন, এই নমুনায় আইনজীবীদের যুক্তিও ঠিক সেই ধরণের। ধরে নেয়া হয় যে, উভয়পক্ষ স্বাধীনভাবেই শ্রম-বিষয়ক চুক্তি করে থাকে। আইনের চোখে কাগজে কলমে যখন উভয়েই সমান বলে স্বীকৃত, তখন চুক্তিটা উভয়েই স্বেচ্ছাক্রমে করেছে, এই রকম স্বীকার করে নেয়া হয়। পৃথক শ্রেণীগত মর্যাদার জন্য একপক্ষ যে শক্তিলাভ করে, একপক্ষ অপরপক্ষের উপর যে চাপ প্রয়োগ করে, তা নিয়ে অর্থাৎ উভয়পক্ষের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আইনের স্বধর্ম নয়। শ্রম-বিষয়ক চুক্তি বলবৎ থাকার সময় উভয়পক্ষেরই সমান অধিকার; বস্তুতপক্ষে, একপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না খোলাখুলিভাবে এই অধিকার ত্যাগ করে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা এই রকমই থাকে—এই রকম ধারণা করা হয়। বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে, শ্রমিককে সম-অধিকারের শেষ চিহ্নটুকুও মালিকের পায়ের তলায় বিসর্জন দিতে বাধ্য করে—এ সম্বন্ধেও চোখ-কান বুঁজে বসে থাকা বুর্জোয়া আইনের স্বধর্ম।

বিয়ের বেলাতেও দেখা যায়, উভয়পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে উহা রেজেস্টারী করার সঙ্গে সঙ্গেই আইনের কাজ শেষ হয়ে যায়। সবচেয়ে প্রগতি-পন্থী আইনও এর অতিরিক্ত কিছু নিষ্পন্ন করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। আইনের পটভূমির অন্তরালে, বাস্তব জীবনক্ষেত্রে স্বাধীন মত যে কিভাবে প্রদত্ত হয়, আইন বা আইনজ্ঞ সে-সম্বন্ধে আদৌ বিচার করে না। কিন্তু আইন-কানুনগুলোর একটু তুলনা-মূলক বিচারে প্রবৃত্ত হলেই এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তি যে প্রকৃতপক্ষে কি জিনিস আইনজ্ঞগণ তা দিব্য চক্ষুতেই দেখ্‌তে পাবেন। যে-সমস্ত দেশে সন্তান-সন্ততিরা আইনত বাপ-মার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে, অর্থাৎ সন্তানকে যে-সমস্ত দেশে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না সেই সমস্ত দেশে, অর্থাৎ জার্মানি, ফরাসী আইনযুক্ত দেশসমূহ ইত্যাদি আরো অনেক দেশে বিয়ে করার সময় বাপ-মার অনুমতি নিতে হয়, নইলে বিয়ে হতে পারে না। ব্রিটিশ আইন-কানুনযুক্ত দেশগুলোয় বিয়ের সময় আইনের দিক থেকে বাপ-মার অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু বাপ-মা উইল করে যাকে খুশি আপন সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে তাঁরা ত্যাজ্যপুত্র করতে পারেন অনায়াসে। কাজেই, দেখা যায়, সম্পত্তিযুক্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিয়ে সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ অসম্ভব।

এ-সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যেমন, ফ্রান্স ও জার্মানিও ঠিক তেমনি অবস্থাতেই আছে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে আইনের চোখে স্বামী ও স্ত্রীর সম-অধিকার স্বীকৃত হ'লেও অবস্থা ভাল দাঁড়ায়নি একটুও। প্রাক্তন সমাজব্যবস্থা থেকে উভয়পক্ষের আইনগত অসাম্য যেন আমরা উত্তরাধিকার থেকেই লাভ করেছি। নারীর উপর অর্থ নৈতিক অত্যাচারের কারণরূপে নয়, তার পরিণতি হিসেবেই এই অসাম্য দেখা দিয়েছে। পুরাতন যৌথ পরিবারে বহু দম্পতি তাদের ছেলেপিলে নিয়ে একত্রে বসবাস করতো। এখানে নারীর উপর অর্পিত ঘর-সংসার দেখাশুনার ভার পুরুষের কাজের হিস্যা আহার্য-আহরণের মতই সামাজিক ও সরকারী কাজ বলে বিবেচিত হ'তো। পিতৃ-বিধিশাসিত পরিবারে, বিশেষত, একনিষ্ঠ-বিবাহমূলক ব্যক্তিগত পরিবারে অবস্থা অন্য রকম দাঁড়ায়; ঘর-সংসার দেখা শোনা বা তদারকি সামাজিক ও সরকারী রূপ হারিয়ে ফেলে। সমাজের সঙ্গে কোন সংশ্রবই থাকে না। ইহা **বেসরকারী সেবায়** পরিণত হয়। স্ত্রী এখানে প্রধানা দাসীতে পরিণত হয়; সামাজিক ধন-সম্পত্তি উৎপাদনে কোন অংশই সে গ্রহণ করতে পারে না। আধুনিক যুগের বড় বড় কল-কারখানা আবার তাদের কাছে, এখানে কেবলমাত্র শ্রমিক মেয়েদের কাছে, সামাজিক ধন উৎপাদনের পথ উন্মুক্ত করে। কিন্তু এই পথ শ্রমজীবী মেয়েদের কাছেও এমনভাবে উন্মুক্ত হয় যে, যাতে ঘর-সংসারের দায়িত্ব পালন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানায় গতর খাটিয়ে রোজগার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নারী যেখানে কলকারখানায় যোগদান ক'রে স্বাধীনভাবে রোজগার করতে চেষ্টা করে সেখানে তাকে ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করতে হয়। কল-কারখানার মেয়েদের মত, ব্যাঙ্ক, অফিস, ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি পেশায় যোগদানকারী মেয়েদের কাছেও পারিবারিক জীবনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীর প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন পারিবারিকগোলামির উপরেই দণ্ডায়মান। ব্যক্তিগত পরিবারগুলাকে অণুরূপে নিয়েই বর্তমান সমাজ সংগঠিত। আজকাল অধিকাংশ-ক্ষেত্রে, বিশেষত, পয়সাওয়ালা শ্রেণীগুলোর ভিতর পুরুষকেই বাধ্য হয়ে রুজি-রোজগার দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করতে হয়। ফলে, বিশেষ কোন আইনগত মর্যাদা ও অধিকার লাভ না ক'রেও পুরুষ প্রাধান্য লাভ করে। পরিবারের ভিতর পুরুষ হচ্ছে বুর্জোয়া আর নারী গতর-খাটানো শ্রমিক। শ্রমশিল্পের দুনিয়ায় শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার চলে তার নির্মমতা ষোলকলায় পরিস্ফুট

হবে, পুঁজির মালিকরা যে-সব বিশেষ অধিকার ভোগ করছে সেই সমস্ত প্রত্যাহৃত হয়ে আইনের রাজ্যে মালিক ও শ্রমিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে কিন্তু দুই শ্রেণীর বিরোধিতাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি; অপরপক্ষে, দুই শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাতে শেষ মীমাংসা করতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবার সম্পর্কেও সত্যটা এইরূপ। স্বামী ও স্ত্রী যখন পুরাপুরি সমান অধিকার লাভ করবে তখনই আধুনিক পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাধান্যের বিশেষ রূপ ও উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সাম্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তখন সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাবে যে নারীর মুক্তিলাভের প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, সমগ্র নারীজাতির আবার সাধারণ শ্রমশিল্পের কাজে পুনঃপ্রবেশাধিকার লাভ ও তার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক অণু-কেন্দ্র হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারকেও ভেঙে ফেলতে হবে।

*
* *

আমরা তাহলে, মোটামুটি তিন প্রকারের বিবাহ-প্রথার প্রচলন দেখতে পাই। মানব-জাতির ক্রমবিকাশের তিনটে প্রধান স্তরের সঙ্গে এ-গুলোর সম্পর্ক রয়েছে। স্যাভেজ বা অ-সভ্য অবস্থার দলগত-বিয়ের রেওয়াজ, বর্বর যুগে জোড়-পরিবার এবং সভ্যতার যুগে একনিষ্ঠবিবাহ আর এর পরিপূরক হিসেবে ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি। বর্বরযুগের উচ্চ স্তরে জোড়-পরিবার ও একনিষ্ঠবিবাহ-মূলক পরিবারের মধ্যে ক্রীতদাসীদের প্রাধান্য ও বহুবিবাহ-প্রথার সৃষ্টি হয়েছে।

এ-পর্যন্ত আমরা যতদূর বিশ্লেষণ করলাম তাতে এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরায় প্রগতি-ধারার সঙ্গে এমন একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ রয়েছে, যাতে দেখা যায় যে, মেয়েরা ক্রমশ দলগত-বিয়ের যৌন-স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত হয়েছে; এবং পুরুষদের বেলায় তা ঘটেনি। বাস্তবিকপক্ষে, পুরুষ এখনো দলগত বিয়ের সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে। নারীর পক্ষে যা ভয়ংকর অপরাধ, যেজন্য নারীকে আইন ও সমাজের কাছে নির্মম শাস্তি ভোগ করতে হয়, পুরুষের কাছে তা সম্মানজনক কাজ; বড়জোর পুরুষকে এজন্য যৎসামান্য সামাজিক প্রত্যবায় ভোগ করতে হয়। পুরুষ তা হাসিমুখেই বরদাস্ত করে। বর্তমান যুগে ধনতান্ত্রিক-প্রথায় পণ্য উৎপাদনের কবলে অতীতের হেতেরে প্রথা রূপান্তরিত হয়ে এর সঙ্গে যতই খাপ খাইয়ে নেয় ততই ইহা প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়; ফলে সমাজের আরো বেশি নৈতিক অধোগতি সাধিত হয়।

মেয়েদের মধ্যে যে-সমস্ত হতভাগিনী বেশ্যাবৃত্তির কবলে পড়ে মাত্র তাদেরকেই অধোগামিনী করে। আর সাধারণত, আমরা যেরূপ ভাবি, এদের অধোগতির দৌড় তত বেশি নয়। অন্যপক্ষে, বেশ্যাবৃত্তি দুনিয়ার সমস্ত পুরুষকেই নীতি-ভ্রষ্ট করে; কাজে কাজেই, শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী বাগ্‌দানের সময়টা দাম্পত্যজীবনে ব্যভিচারের উপযোগী প্রাথমিক বিদ্যামন্দিরের কাজই করে থাকে।

বর্তমানে আমরা এমন এক সামাজিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়েছি, যখন বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি উহার পরিপূরক বেশ্যাবৃত্তির মত সুনিশ্চিতভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একজন ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, আর ঐ সম্পত্তি অন্য কারুর হাতে সমর্পণ না করে মাত্র তার ঔরস-জাত সন্তানের নামে উইল করার প্রয়োজন থেকেই একনিষ্ঠবিবাহ প্রথার উৎপত্তি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারীর দিক থেকেই এই প্রথা অবশ্য-প্রয়োজনীয়, পুরুষের দিক থেকে নয়; সেইজন্য নারীদের এই একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথা পুরুষের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বহুবিবাহের অধিকারে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেনি। আসন্ন-প্রায় সমাজ-বিপ্লব অন্ততপক্ষে উত্তরাধিকারের যোগ্য অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ, উৎপাদনের উপায়-সমূহ—সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে উইল ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এই সমস্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে সর্বনিম্ন কোঠাতেই নামিয়ে দিবে। অর্থনৈতিক কারণাবলী থেকেই যখন একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার উৎপত্তি, তখন এই সমস্ত কারণের অভাব ঘটলে এই প্রথাও কি লুপ্ত হয়ে যাবে না?

বেশ যুক্তি দেখিয়েই কেউ কেউ এর উত্তরে বলতে পারেন: লোপ পাবে না মোটেই, বরং পরিপূর্ণভাবেই বাস্তব পরিণতি লাভ করবে। কারণ, ধন-সম্পত্তি উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাজিক সম্পদে রূপান্তরসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মজুরি-জীবী শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেটারিয়েট শ্রেণীও লোপ পাবে। এই সঙ্গে মাপজোকের দ্বারা নির্ণয়ের যোগ্য নির্দিষ্টসংখ্যক কতকগুলো মেয়ের পক্ষে দেহ-বিক্রয়ের প্রয়োজনেরও অবসান ঘটবে অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি লোপ পাবে; ফলে, একনিষ্ঠ-বিবাহ প্রথা লোপ না পেয়ে পুরুষের পক্ষেও তা বাস্তবতায় পরিণত হবে।

প্রকৃত অবস্থা যেমনই দাঁড়াক না কেন, পুরুষদের অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বদলে যাবে। মেয়েদের অবস্থা, সমস্ত মেয়ের অবস্থাতেও রীতিমত পরিবর্তন ঘটবে। ধন-সম্পত্তি উৎপাদনের উপায়গুলো যৌথ-সম্পদে পরিণত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে এক-একটা পরিবার আর সমাজের অর্থনৈতিক-কেন্দ্র থাকবে না। সাধারণ ঘরকন্না তখন সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান ও শিক্ষা-দীক্ষাও সরকারী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। সমাজ বৈধ ও জারজ সকল শ্রেণীর সন্তানেরই লালন-পালনের ভার গ্রহণ করবে। কাজে-কাজেই "পরে কি ঘটবে" এই আশংকা আজকাল তরুণীদের পক্ষে বাঞ্ছিতের নিকট আত্ম-সমর্পণের পথে নৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই যে সবচেয়ে বড় সামাজিক বাধার সৃষ্টি করেছে, তা তখন অন্তর্হিত হবে। এতে কি ক্রমশ অধিকতর অবাধযৌনসংগম মাথা তুলতে থাকবে না? আর কুমারীদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে জনমত কি ক্রমশ মোলায়েম হতে থাকবে না? আর শেষ পর্যন্ত, বর্তমান জগতে একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথা ও বেশ্যাবৃত্তি, পরস্পরের সঙ্গে অপরিহার্য অসামঞ্জস্য-বিশিষ্ট অথবা পরস্পর-বিরোধী দুটো সামাজিক প্রথা—একই সামাজিক অবস্থার দুই মেরুরূপে প্রচলিত রয়েছে দেখতে পাই না? বেশ্যাবৃত্তি লোপ পাওয়ার সময় একনিষ্ঠবিবাহ প্রথাকেও কি অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাবে না?

এখানে আমরা ব্যক্তিগত যৌন-প্রেম নামে একটা নতুন বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করি। একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথা যখন বিকাশ লাভ করে, তখন তার মধ্যে অন্তত-পক্ষে ভ্রূণরূপে এই বস্তুটাও নিহিত ছিল।

মধ্যযুগের আগে ব্যক্তিগত দৈহিক প্রেমের অস্তিত্ব ছিল না। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, নিবিড় অন্তরঙ্গতা, একই ধরণের রুচি ও রীতি-নীতি ইত্যাদি যে নর-নারীর মধ্যে যৌন-সম্ভোগের ইচ্ছা জাগ্রত করতো এবং যার সঙ্গে সবচেয়ে নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেই অংশীদার সম্পর্কে নর-নারী যে উদাসীন থাকতে পারে না, তা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা আধুনিক যুগের যৌন-প্রেম থেকে বহু দূরবর্তী। সমগ্র মান্ধাতার আমল ধরে বাপ-মায়েরাই বিয়ে-সাদীর ব্যবস্থা করে, বর-কনেরা শান্ত শিষ্টভাবে বাপ-মার মনোনয়ন মেনে চলে। মান্ধাতার যুগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভালবাসা যদি ঘটেও থাকে, তা আন্তরিক ঝোঁক বা প্রবৃত্তিবশে না হয়ে বাস্তব কর্তব্য হিসাবেই ঘটেছে। এই ভালবাসা বিয়ের কারণ না হয়ে বিয়ের আনুষঙ্গিকরূপেই উপস্থিত হয়েছে। প্রাচীন যুগে আধুনিকযুগ-সম্মত প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক প্রচলিত সমাজের বাইরেই ঘটেছে। **থিওক্রিটুস্** ও **মোস্কুস্** অথবা **লোঙ্গুসের** ডাফনিস্ ও ক্লো নামক গ্রন্থে যে সমস্ত মেষপালকদের প্রেম-ঘটিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিরহ-মিলনের ব্যাপারসমূহ বর্ণনা করেন তারা সকলেই গোলাম। রাষ্ট্র ও স্বাধীন নাগরিকদের জীবন-

বেষ্টনীর সঙ্গে এদের কোন সংস্রব ছিল না। গোলাম ছাড়া যদিও প্রেম-ভালবাসার সাক্ষাৎ মিলে, তা ভেঙেপড়া প্রাচীন জগতের বিশ্লিষ্ট মাল-মশলা রূপেই ছড়িয়ে পড়ার অবসর পায়। আর প্রণয় চলে প্রচলিত সমাজের বহির্ভূত হেতেরে অর্থাৎ বিদেশিনী অথবা স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলাম নারীদের সঙ্গে। এথেন্স শহরে অবনত যুগের প্রাক্কালে আর রোমে সিজারের আমলে এই রকমই ঘটে। স্বাধীন নর-নারীদের মধ্যে প্রেম একমাত্র ব্যভিচাররূপেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। প্রাচীন যুগের প্রেম-সাহিত্যের নামজাদা কবি বুড়ো আনাক্রেয়ন আধুনিক যুগ-সম্মত যৌন-প্রেমের কোন ধারই ধারতেন না। এমন-কি, দয়িত পুরুষ কি নারী সে-সম্বন্ধে তাঁর খেয়াল ছিল না বললেই চলে।

আমাদের যৌন-প্রেম প্রাচীন যুগের পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত 'এরস', বা কাম-প্রবৃত্তি সাদা-সিধে ধরণের আসঙ্গ-লিপ্সা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ধরণের বস্তু। প্রথমত, যাকে ভালবাসা যায় প্রতিদানে সেও ভালবাসবে এই পূর্ব-সম্ভাবনার উপরেই আমাদের যৌন-প্রেম নির্ভর করে। এ-সম্বন্ধে পুরুষ ও নারী সমান মর্যাদার অধিকারী। প্রাচীন যুগের 'এরসের' সময় নারীর মত চাওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমাদের যৌন-প্রেম এমন নিবিড়ত্ব ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করে যে, উভয়পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদকে, সবচেয়ে বড় না হলেও, বড় রকমের দুর্ভাগ্য বলেই মনে করে। পরস্পরকে পাওয়ার জন্যে উভয়ে বড় রকমের বিপদবরণ, এমন-কি, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে প্রস্তুত; প্রাচীন যুগে কেবলমাত্র ব্যভিচারের মধ্যেই এইরকম ঘটতে পারতো। যৌন-সঙ্গম বিচার সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত এক নতুন নৈতিক মাপকাঠিও উদ্ভূত হয়। যৌন-সংসর্গ বৈধ কি অবৈধ—কেবলমাত্র এই প্রশ্নই আসেনা; পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা থেকে তা উদ্ভূত হয়েছে কিনা সে প্রশ্নও এসে পড়ে। সামন্ত অথবা বুর্জোয়া লোকাচারে অন্যান্য নৈতিক মাপকাঠির মত এই মাপকাঠিটাও যে তেমন সুবিধে করতে পারেনি তা বলাই বাহুল্য। সোজা কথায়, ইহা উপেক্ষিত হয়েছে। তা বলে আর পাঁচটা নৈতিক মাপকাঠির মত এই মাপকাঠিটার কিছু বেশি দুর্ভাগ্য ঘটেনি। আর পাঁচটা আদর্শের মত এইটেও কাগজে-কলমে এবং মুখে মুখে চলে। বর্তমানে এর বেশি প্রত্যাশা করাও যায় না।

যৌন-প্রেমের দিকে যাত্রা শুরু করেই প্রাচীন যুগ যেখানে ক্ষান্ত হয়ে পড়ে, মধ্যযুগ সেখান থেকেই অর্থাৎ ব্যভিচারের মধ্য দিয়েই যৌন-প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা ইতিপূর্বেই মধ্যযুগীয় বীরযুগসুলভ প্রেম-কাহিনী বর্ণনা

করেছি। এই প্রেম "উষা-সঙ্গীত" নামক প্রেম-গাথাগুলোতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বিয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলাই এই প্রেমের উদ্দেশ্য। এই প্রেম ও বিয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেমের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে বীরবরদের যুগ কখনই সেই পার্থক্যটা দূর করতে সক্ষম হয় নি; এমনকি, তরলমতি ল্যাটিনদের ভেতর থেকে ধর্মপ্রাণ জার্মানদের ভেতরে গিয়েও দেখি, নিবেলুঙ এনলিড্ গ্রন্থে ক্রিমহিল্ড যদিও গোপনে সিগ্‌ফ্রিড্‌কে প্রাণভরে ভালবাসে তবুও গান্থার যখন তাকে বলে যে, একজন অজ্ঞাতনামা বীরবরের হাতে তাকে সমর্পণ করবে বলে তিনি স্থির করেছেন, তখন সে সোজাসুজি এই উত্তর দেয়, "আমাকে জিগ্যেস্ করার কোনই দরকার নেই। আপনার আদেশ শিরোধার্য। আপনি যার হাতে সমর্পণ করবেন, তাকেই আমি স্বামী বলে গ্রহণ করবো।" নায়িকার মাথার মধ্যেই এলো না যে, এই ব্যাপারে তার প্রেম-ভালবাসাও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। গান্থার ব্রুনহিল্ডকে এবং ইট্‌জেল ক্রিমহিল্ডকে বিয়ে করতে চায়, যদিও কেউ কাউকে দেখেনি। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় "গুড্রুনে"। এখানে আয়র্লণ্ডের সিগ্‌বেণ্ট নরওয়ের মেয়ে উতিকে চায়, কিন্তু সে তাকে কখনো দেখেনি; হেগেলিনজেনের হিটেল আয়র্লণ্ডের হিল্‌ডেকে চায়; পরিশেষে মুরল্যাণ্ডের সিগ্‌ফ্রিড্, অর্মানির হার্টমুট ও সীল্যাণ্ডের হারাভিগ্ গুড্রুনের প্রেমলাভের জন্য সমবেত হয়। গুড্রুন্ হারভিগ্‌কে বরণ করে নেয়। এখানে নায়িকা সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে স্বামী বেছে নেবার অধিকার লাভ করে। নিয়মানুযায়ী মধ্যযুগে বাপ্‌মায়েরাই তরুণ রাজকুমারদের জন্যে পাত্রী ঠিক করতো। এর ব্যতিক্রম ঘট্‌বার উপায় ছিল না। রাজ-রাজড়া, নবাব-জমিদারদের বিয়ে ছিল দস্তুরমত রাজনৈতিক সমস্যা। নতুন নতুন মৈত্রী সম্পর্ক ও শক্তিবৃদ্ধির উপায় হিসাবেই তাঁদের বিয়ে নিষ্পন্ন হ'তো। রাজবংশের স্বার্থই এখানে বড় কথা; ব্যক্তির ইচ্ছা ও ভালো লাগার-না-লাগার কোন প্রশ্নই এখানে উঠতে পারতো না। কাজেই এখানে কি করে আশা করা যায় যে, বিয়ের বেলায় প্রেম সবচেয়ে বড় স্থান দখল করবে?

মধ্যযুগের শহরগুলোর গিল্ড-সদস্যের অবস্থাও একই রকমের ছিল। গিল্ড-চার্টারসমূহ এবং সে সবের নানা প্রকার বিশেষ চুক্তি তাকে রক্ষা করতো। অন্যান্য গিল্ডের সদস্য এবং তার নিজের গিল্ডের অন্যান্য সদস্য, ঠিকা কারিগর, শিক্ষানবিশ ইত্যাদির সঙ্গে যে সব কৃত্রিম পার্থক্য আইনত তাদের আলাদা

করে রাখত সেই সমস্ত কারণ বশত তাকে অতি সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে তার মনোমত প্রার্থী খুঁজতে হতো। এই জটিল ব্যবস্থার মধ্যে তাকে ব্যক্তিগত ঝোঁক বা আগ্রহ ত্যাগ করে মাত্র পারিবারিক স্বার্থের উপর নজর রেখেই যোগ্যতম পাত্রী নির্ণয় করে নিতে হ'তো।

কাজেই দেখা যায়, মধ্যযুগের শেষ সীমা পর্যন্ত বিবাহরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানটা গোড়ার ন্যায় একই অবস্থায় ছিল। অধিকাংশক্ষেত্রেই বিয়ে বরকনের মতামতের অপেক্ষা না করেই নিষ্পন্ন হ'তো। সমাজের আদিম প্রভাতে শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সমগ্র দলের স্বামী কিংবা স্ত্রীরূপে গণ্য হতো। দলগত বিয়ের শেষ পরিণতির সময়েও অবস্থা অনেকটা এই রকমই ছিল। তবে দলের পরিধিটা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে। জোড়-পরিবারের দস্তুর, মায়েরাই ছেলেমেয়েদের বিয়ে-সাদী নিষ্পন্ন করবে। নতুন দম্পতিকে গোষ্ঠী বা উপজাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই বিয়ের উদ্দেশ্য। যৌথ সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয় নিয়ে যখন জনক-বিধি ও একনিষ্ঠ-বিবাহপ্রথা প্রাধান্য লাভ করে, তখন পূর্বের যে-কোন সময়ের তুলনায় অর্থনৈতিক কারণগুলোই বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। খোলাখুলি কেনা-বেচার আকারের বিবাহ-প্রথা অন্তর্হিত হয়; কিন্তু বর ও কনের উভয়েরই ক্রমশ এই রকমের একটা বাজার দর নির্ধারিত হয়, যেখানে পাত্র পাত্রীর গুণাগুণের পরিবর্তে, কার কতটা বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাই বাজারদর যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠিতে পরিণত হয়। অন্যসব কারণ ও সুবিধে-অসুবিধে ধামাচাপা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি যৌনটান বা প্রেম-ভালবাসাই যে বিয়ে-সাদীর শ্রেষ্ঠ মানদণ্ডে পরিণত হবে শাসকশ্রেণীগুলোর বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে তা ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতবস্তু। এই সমস্ত বড় জোর উপন্যাসের রাজ্যে অথবা নিগৃহীত শ্রেণীগুলোর মধ্যে ঘটতে পারত, কিন্তু নিপীড়িত শ্রেণীগুলো তখন ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য ছিল না।

নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর পুঁজিতান্ত্রিক প্রথায় পণ্য উৎপাদনের মালিকরা যখন বিশ্ব-বাণিজ্য ও ব্যাপক শিল্প-প্রচেষ্টার মারফতে বিশ্বজয়ের অভিযানে ব্যাপৃত তখন তারা অবস্থাটা ঠিক এই রকমই দেখতে পায়। কেহ কেহ মনে করতে পারেন, এই ধরণের বিবাহ-প্রথা তখন অতিমাত্রায় সুবিধাজনক বলেই তা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসের পরিহাসের আদি-অন্ত নেই; তাই পুঁজিবাদ বিবাহ-প্রথাতেও ভাঙনের সৃষ্টি করে বসে। সমস্ত জিনিসকে

পণ্য দ্রব্যে পরিণত ক'রে পুঁজিবাদ চির-আচরিত প্রাচীন রীতিনীতিগুলো ভেঙে ফেলে তার জায়গায় সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি অর্থাৎ স্বাধীন চুক্তির সৃষ্টি করে। ইংরেজ আইন-তত্ত্বজ্ঞ এইচ, এস, মেইন্‌ বলেন, প্রাচীন যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের পার্থক্য এই যে, প্রাচীন যুগে মানুষ সনাতনী রীতিনীতি অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতো, কিন্তু এখন লোকে সংসারধর্ম পালন করে চুক্তি দ্বারা। মানুষ এখন স্বাধীনভাবে জীবনের শর্তগুলো বেছে নিয়ে চুক্তি করতে অভ্যস্ত। এই নতুন মত প্রচারের সময় মেইন্‌ মস্ত বড় যুগান্তকারী আবিষ্কারের দাবি করেন। "সাম্যবাদীর ফতোয়া" নামক গ্রন্থে কিন্তু এই তত্ত্বের যতটুকু সত্য তা অনেক আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়।

কিন্তু চুক্তি এমন সব লোকজনের মধ্যে নিষ্পন্ন হতে পারে যারা স্বাধীনভাবে নিজেদের দেহ, কর্ম-প্রচেষ্টা ও অধিকৃত বিষয়াদি হস্তান্তর করতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম-অধিকারের ভিত্তিতে কাজ-কারবার পরিচালনে সক্ষম। এই ধরণের "স্বাধীন" ও "সম-অধিকার" যুক্ত লোকজন সৃষ্টি করা পুঁজি-প্রথায় ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান কর্তব্যরূপেই গণ্য হয়। প্রথম প্রথম আধা-আধি আত্ম-বিস্মৃতভাবে এবং ধর্মের অনুপ্রেরণায় সম্পন্ন হ'লেও লুথার ও ক্যালভিন্‌ প্রচারিত ধর্ম-সংস্কারে খোলাখুলিভাবে বলা হয় যে, সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে মানুষ যে-সব কাজ করে একমাত্র সেইগুলোর জন্যই তাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে। জোর করে অধর্মাচরণে বাধ্য করার চেষ্টায় বাধা দেওয়া নৈতিক কর্তব্যরূপেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বিয়ে-সাদীর যেভাবে যোগাড়-যন্ত্র হয়ে আসছে, তার সঙ্গে এই নীতি বা আদর্শের কি করে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে? বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা অনুসারে বিবাহ আইনঘটিত ব্যাপার, চুক্তি মাত্র। এই চুক্তির স্থান সকলের উপরে; কারণ, দুটো মানুষের দেহ ও মন সারাজীবনের জন্য গ্রথিত করাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানের দিক থেকে সত্য সত্যই স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবেই এই চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। উভয়পক্ষের সম্মতি-ব্যতিরেকে ইহা নিষ্পন্ন হয় না। কিন্তু সকলে বেশ ভাল ভাবেই জানে, কি-ভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং যবনিকার অন্তরালে কারা বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করে। কিন্তু অন্য সমস্ত চুক্তির বেলায় প্রকৃত স্বাধীনতার যখন এত বেশি প্রয়োজন, তখন এই চুক্তির বেলাতেই বা তা হ'বে না কেন? বিয়ের বাঁধনে যে দু'জন তরুণ নিজেদের আবদ্ধ করবে, তাদেরও কি ইচ্ছামত নিজেদের, তাদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে না?

বীরত্ব-প্রথা থেকে কি যৌন-প্রেম দস্তুরে পরিণত হয় নি? আর বীরবরদের ব্যভিচার-দুষ্ট প্রণয়ের পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কি যৌন-প্রেমের খাঁটি বুর্জোয়া রূপে পরিণত হয় নি? বিবাহিত নর-নারীর পরস্পরকে ভালবাসা যদি কর্তব্যে পরিণত হয়, তা'হলে প্রেমিক ও প্রেমিকার পক্ষে অন্য কাউকে বিয়ে না করে পরস্পরকে বিয়ে করাই কি একমাত্র কর্তব্য নয়? বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, তথা অন্যান্য সেকেলে বিয়ের দালাল ও ঘটকদের অধিকারের চেয়ে প্রণয়ীদের এই অধিকার কি বড় নয়? ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার অধিকার যখন গির্জায় ও ধর্মের ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছে, তখন নবীনদের দেহ, মন, সম্পত্তি, সুখ ও দুঃখ সমস্ত নিয়ে প্রবীণরা যে ইচ্ছামত ছিনিমিনি খেলবেন —এই অন্যায় অধিকারের কাছেই বা তা থেমে যাবে কেন?

যে-যুগে সমস্ত প্রাচীন সামাজিক বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে গিয়ে চির-আচরিত ধ্যান-ধারণাগুলির ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে, সেই যুগে এই সমস্ত প্রশ্ন উদ্ভূত না হয়েই পারে না। এক আঘাতেই দুনিয়ার আয়তন দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। একটা গোলার্ধের সিকি ভাগের পরিবর্তে গোটা ভূমণ্ডলই পাশ্চাত্য ইউরোপীয়ানদের চোখের সামনে খুলে যায়, তারা দু'হাতে দুনিয়ার বাকি সাত পোয়াও লুফে নেবার জন্য অগ্রসর হয়। তাদের মাতৃভূমির সংকীর্ণ সীমান্ত-রেখার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধরাবাঁধা চিন্তাধারার হাজার বছরের পুরাতন সীমান্ত-রেখাও ভেঙে পড়ে। মানুষের বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি, উভয়েরই সামনে সীমাহীন দিগ্‌বলয় আত্ম-প্রকাশ করে। ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ, মেক্সিকো ও পতোসীর স্বর্ণ ও রৌপ্য খনি যখন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, তখন কি আর মিথ্যা মান-মর্যাদার মোহ ও পুরুষপরম্পরায় সমাগত গিল্ড-অধিকারগুলা তরুণকে আটকে রাখতে পারে? বুর্জোয়াদের কাছে তখন দিগ্‌বিজয়ের যুগ; ইহা ভাবোন্মাদনা ও প্রেমের স্বপনে ভরপুর; কিন্তু এই সমস্তই ছিল বুর্জোয়া ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান এবং শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত।

ক্রমশ অবস্থা এই রকম দাঁড়ায় যে, নবজাগ্রত বুর্জোয়া-সমাজ, বিশেষত, যে-সমস্ত দেশে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি শিথিল হয়ে পড়ে সেই সমস্ত প্রোটেস্ট্যান্ট দেশের বুর্জোয়ারা বিবাহ-চুক্তির স্বাধীনতা ক্রমবর্ধমান হারে মেনে নিয়ে পূর্ব-বর্ণিত রীতিতে তা সম্পন্ন করতে থাকে। বিবাহের শ্রেণীগত রূপই অব্যাহত থাকে, তবে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই নর-নারী অনেকটা স্বাধীনভাবে

স্বামী-স্ত্রী মনোনয়নের অধিকার লাভ করে। পারস্পরিক যৌন-প্রেম এবং স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত স্বাধীন চুক্তি ছাড়া বিয়ে যে খাঁটি অধর্মাচরণ, কাগজে-কলমে, নীতি-শাস্ত্রে ও কাব্য-সাহিত্যে তা অভ্রান্তরূপেই প্রচার করা হয়। এক কথায়, প্রেমযুক্ত বিবাহ মানুষের অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়; আর কেবলমাত্র পুরুষের বেলায় নয়, ব্যতিক্রম হিসেবে নারীর বেলাতেও এই অধিকার স্বীকৃত হয়।

কিন্তু একটা বিষয়ে মানুষের এই অধিকারটার সঙ্গে তার আর পাঁচটা তথা-কথিত অধিকারের গরমিল রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, শেষোক্ত অধিকারগুলো যখন শাসকশ্রেণী, বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—নিগৃহীত শ্রেণী, শ্রমিকরা যখন এইগুলো থেকে মুখ্যত বা গৌণত বঞ্চিত—তখন আর একবার ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। শাসকশ্রেণী প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির দ্বারা শাসিত; কাজেই তাদের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতার সঙ্গে বিয়ের চুক্তি খুব কমই ঘটবার অবসর পায়। অপর পক্ষে, নিগৃহীত শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীন চুক্তির ভিত্তিতে বিয়ে রীতিমত দস্তুরে পরিণত হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে পণ্য উৎপাদন-প্রথা এবং উহার সহকারী অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধগুলো বিয়ের বর বা কনে বাছাইয়ের বেলায় এখনো বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সমস্ত বিলুপ্ত করার পর ধন-সম্পত্তির লেন-দেনের যে নতুন বিধি-ব্যবস্থা কায়েম হবে, একমাত্র তারই আমলে বিবাহ-প্রথায় পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব হ'তে পারে। কারণ, অবস্থা এই রকম দাঁড়ালে বিয়ে করার সময় পারস্পরিক আসক্তি ছাড়া অন্য কোন মতলব বা উদ্দেশ্যেরই অবকাশ থাকবে না।

যদিও বর্তমানে কেবলমাত্র মেয়েদের মধ্যেই যৌন-প্রেমের সার্থকতা দেখা যায়, তাসত্ত্বেও যেহেতু ইহা একা-একা ভোগ করার জিনিস, সেইজন্য যৌন-প্রেমকে ভিত্তি করে যে-সমস্ত বিয়ে নিষ্পন্ন হয়, সে-গুলো স্বভাবতই একনিষ্ঠ-বিবাহ। বাখোফোন্ যখন বলেন যে, দলগত বিয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিয়ে প্রবর্তন নারীর প্রয়াসেই সম্ভব হয়েছে তখন তিনি খাঁটি সত্য কথাই বলেন। পুরুষের চেষ্টাতেই জোড়-বিয়ে পরে একনিষ্ঠ-বিয়েতে রূপান্তরিত হয়। ইতিহাসের দিক থেকে তাতে, মূলত, নারীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং পুরুষের পক্ষে তার বিশ্বাসঘাতকতার পথই পরিষ্কৃত হয়। অর্থনৈতিক বাধ্য বাধকতা অর্থাৎ নিজের ভরণ-পোষণ, বিশেষত, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নারী স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা

বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়। এই বাধ্য-বাধকতা অবসান হ'লে নারী আবার পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে; তাতে কিন্তু অবস্থা খারাপ দাঁড়াবে না মোটেই। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এতে নারী বহু-স্বামী-ভোগ-কারিনী হবে না; পুরুষই তখন খাঁটি একপত্নিক হ'য়ে পড়বে।

ধন-সম্পত্তির লেন-দেনের যে সম্পর্কগুলোর উপরে একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি, এই প্রথা থেকে সেই সমস্ত কুলক্ষণগুলোই দূর হয়ে যাবে। এই সমস্ত বিশেষত্বের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে, পুরুষের প্রাধান্য; দ্বিতীয়টা, বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্যতা। বিবাহে পুরুষের প্রাধান্য তার অর্থনৈতিক প্রাধান্যের বলেই ঘটে। আর্থিক-প্রাধান্য লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাধান্যও লোপ পাবে। বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য—এই ধারণা যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভেতরে একনিষ্ঠ-বিয়ের উৎপত্তি, আংশিকভাবে তারই ফলে ঘটে। আংশিকভাবে এই ধারণা প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য দায়ী। আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গেই যে একনিষ্ঠ-বিয়ের নিগূঢ় সম্পর্ক, এই তথ্যটা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে না পেরে মানুষ ধর্মের ফতোয়া জারি করে বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্যতাও জারি করে। আজকাল কিন্তু এই অচ্ছেদ্য বন্ধন শতধা ছিন্ন হয়েছে। প্রেম-ভালবাসার উপর নির্ভরশীল বিয়েই যদি একমাত্র নীতি-সম্মত হয়, তাহ'লে বিবাহিত যে জীবনে প্রেম আছে, কেবলমাত্র তাই-ই ন্যায়ধর্ম-সঙ্গত। কিন্তু ব্যক্তিগত যৌন-প্রেমের দৌড় ও পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। বিশেষত, পুরুষের বেলায় প্রায়ই নড়চড় ঘটতে দেখা যায়। প্রেম-ভালোবাসার যদি অবসান ঘটে, বিশেষত, আর একটা নতুন ঘোরালো প্রেম তার স্থান দখল করে, তা'হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ উভয় অংশীদার, তথা সমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক। মানুষ তখন অযথা বিবাহ-বন্ধন-চ্ছেদরূপ জঘন্য মামলা-মোকদ্দমার পাঁক থেকেও মুক্তি পাবে।

পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য-উৎপাদন প্রথার আসন্নপ্রায় বিলুপ্তির পর যৌন-সম্পর্কগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা যা আন্দাজ করতে পারি তা প্রধানত নেতি-মূলক; অর্থাৎ যৌন-সম্পর্কের কোন্ কোন্ দফাগুলো লোপ পাবে তারি হদিশ বলতে পারি। কিন্তু নতুন কি পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ বংশধররাই এই সমস্যার সমাধান করবে; অর্থাৎ অনাগত যুগের যে সব পুরুষ পয়সার বলে নারীর দেহ ক্রয় বা প্রভাব বিস্তারের অন্যান্য সামাজিক পন্থার সঙ্গে অপরিচিত এবং প্রকৃত ভালবাসা ছাড়া অন্য-কোন কারণে পুরুষের নিকট আত্ম-বিক্রয়, তথা, আর্থিক শাস্তির ভয়ে প্রেমিকের নিকট আত্মদানে অসম্মতি প্রকাশ যে-সমস্ত নারীর নিকট

অজ্ঞাত তারাই এই প্রশ্নের সম্যক উত্তর দান করবে। পৃথিবী যখন এই ধরণের নর-নারীতে ভরে যাবে, তখন তাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে আজকাল আমরা যে রকমই ভাবি না কেন, তা তারা থোড়াই কেয়ার করবে। তারা তাদের নিজস্ব লোকাচার ও নিজস্ব জনমত গড়ে তুলবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ সেভাবে চলছে কিনা তাও বিচার করবে। এই হচ্ছে সেই যুগের আদর্শ।

এখানে আবার মর্গ্যানকে নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাঁর কাছ থেকে আমরা বহুদূর চলে এসেছি। সভ্যতার যুগে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা তাঁর কেতাবে স্থান পায়নি। কাজেই, এই যুগে একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথা কি রকম দাঁড়িয়েছে তা তিনি সংক্ষেপেই আলোচনা করেছেন। তিনিও একনিষ্ঠ-বিবাহ-মূলক পরিবারে নর-নারীর সাম্য অবস্থার দিকে আরো এক ধাপ প্রগতি লক্ষ্য করেন ; কিন্তু এই গন্তব্যস্থলে যে উপনীত হওয়া গিয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি কোন-কিছু উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি বলেন, মানব পরিবার পরপর চারটে ক্রমিক স্তর পার হয়ে এসে এখন পঞ্চম স্তরে পা দিয়েছে। এই বাস্তব অবস্থা যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তা'হলে, ভবিষ্যতে এই স্তরটাও স্থায়ী থাকবে কি না, স্বভাবত এই প্রশ্নই আসে। এর একমাত্র উত্তর, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এরও প্রগতি রূপ পরিগ্রহ করবে ; সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সেটাও পরিবর্তিত হবে। অতীতে ঠিক এই রকমই ঘটেছে। অগ্রগতির তালে তালে এরও প্রগতি রূপ পরিগ্রহ করবে। সামাজিক প্রথা-প্রসূত এই প্রথায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হবে। সভ্যতার যুগের সূচনার পর একনিষ্ঠ-বিবাহ-মূলক পরিবারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। আধুনিক যুগে এই উন্নতি বা সংস্কারের রীতিমত পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই, অনায়াসে আন্দাজ করা যায় যে, আরো অনেক-কিছু অগ্রগতি সম্ভবপর এবং শেষপর্যন্ত নর-নারীর সাম্য অবস্থাই রূপ পরিগ্রহ করবে। দূর ভবিষ্যতে একনিষ্ঠ-বিবাহ-যুক্ত পরিবার যদি সমাজের নয়া চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়, তা হ'লে, এর পরবর্তী স্তর যে কিরূপ আকার ধারণ করবে বর্তমানে তার স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব।"

তৃতীয় অধ্যায়

ইরোকোয়াদের গোষ্ঠী-প্রথা (জেন্‌স্)

মর্গ্যানের আরেকটা আবিষ্কারও আমাদের চোখে পড়ে। ইহা, অন্ততপক্ষে, বংশগত পারিবারিক প্রথা থেকে আদিম যুগের পারিবারিক প্রথা পুনর্গঠনের মতই মূল্যবান। জীব-জানোয়ারের নামে পরিচিত আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান উপ-জাতির মধ্যে গোত্রজ কেন্দ্রগুলো আসলে গ্রীকদের **"জেনিয়া"** ও রোমানদের **"জেন্তেসেরই"** জুড়িদার। মূল আমেরিকান প্রথা থেকেই পরে গ্রীক ও রোমান প্রথার উৎপত্তি হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজ জেনস, ফ্রাত্রী, ট্রাইব বা উপজাতি ইত্যাদি স্তরে সাজানো ছিল। আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজের স্তর-বিন্যাসও ঠিক একই ধরণের। সভ্যতার যুগে পা বাড়াবার পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত বর্বর জাতিই জেন্‌স প্রথার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। এমন কি, তার-পরেও অবস্থা একই রকম ছিল। মর্গ্যান্‌-প্রচারিত এই সমস্ত তথ্য এক কলমের খোঁচায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের জটিলতম সমস্যাগুলো জলের মত সোজা করে ফেলে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে আদিম যুগে সামাজিক কাঠামোর মূল বিশেষত্বগুলো কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধেও মর্গ্যান্‌ বহু মূল্যবান অভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেন। একবার বুঝে নিতে পারলে জলের মত সোজা মনে হ'লেও, মাত্র অল্পদিন আগে মর্গ্যান ইহা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। ঐ গ্রন্থে তিনি এই গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হন নি। মর্গ্যানের যুগান্তকারী সর্বশেষ আবিষ্কার নিজেদের কৃতিত্বে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদদের মূষিকের মতই হতবাক্‌ করে ফেলেছে।

মর্গ্যান্‌ **গোত্রজ** কেন্দ্রগুলোকে ল্যাটিন শব্দ **জেনস্‌** নামে বিবৃত করেন। এই শব্দটা এবং গ্রীক্‌ শব্দ **"জেনোস"**, সাধারণ আর্য ভাষার ধাতু "গণ" (জন), (জার্মান "কেন্‌") থেকে উৎপন্ন। এই শব্দের অর্থ উৎপন্ন করা। **জেন্‌স্‌, জেনোস,** সংস্কৃত **জন**, গথিক **কুনি**, (উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী) পুরাতন নর্স ও অ্যাংলো-স্যাক্‌সন্‌ **কিন্‌** ইংরাজী **কিন্‌**, মিডল হাই জার্মান **কুন্নো**—এই সমস্ত শব্দই বংশ, উৎপত্তি ইত্যাদির পরিচায়ক। ল্যাটিন্‌ **জেন্‌স** ও গ্রীক **জেনোস** শব্দ বিশেষভাবে এক-একটা **গোত্রজ** কেন্দ্রকে বুঝায়। এইরূপ কেন্দ্রের সকলেই এক পূর্ব-পুরুষ থেকে উৎপন্ন বলে নিজেদের পরিচয় প্রদান ক'রে গর্ব অনুভব

করে। এরা সকলেই কতকগুলো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বিশেষ ধরণের সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ধরণ-ধারণ এতদিন পর্যন্ত আমাদের ঐতিহাসিকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আসছে।

পুনালুয়া পরিবার সম্বন্ধে আলোচনার বেলায় আমরা ইতিপূর্বেই জেন্‌সের মৌলিক গঠন ও ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছি। পুনালুয়া বিবাহ-প্রথা এবং এতদ্‌-সংশ্লিষ্ট ধ্যান-ধ্যারণাসমূহ অনুসারে জেন্‌সের প্রতিষ্ঠাতা কোন আদি-জননীর সমস্ত বংশধরদের নিয়ে ইহা সংগঠিত। এই ধরণের পারিবারিক প্রথায় পিতৃত্ব অনিশ্চিত বলে একমাত্র নারীগত বংশতালিকাই এখানে প্রচলিত। ভাইদের সঙ্গে বোনদের বিয়ে নিষিদ্ধ; তারা বিয়ে করবে অন্য বংশের মেয়েদের। অন্য বংশের মেয়েদের গর্ভে যে সব সন্তান জন্মাবে তারা, জননী-বিধি অনুসারে পিতার জেনসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সেইজন্য এক এক পুরুষে কেবলমাত্র মেয়েদের গর্ভজাত সন্তানরাই জ্ঞাতিজ কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে। পুত্রদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের মায়ের গোষ্ঠীর সামিল গণ্য হবে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য, ট্রাইব বা উপজাতির মধ্যে এই বংশগত গ্রুপ বা দলটা যখন আর পাঁচটা দল থেকে পৃথকভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন এর অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়?

এই সমস্ত মূল-গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তস্বরূপ মর্গ্যান ইরোকোয়াদের ভেতর প্রচলিত, বিশেষত, সেনেকা উপজাতির গোষ্ঠীগুলো নিয়ে আলোচনা চালান। এই উপজাতি আটটা জেন্টেস্ অর্থাৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটা-একটা জানোয়ারের নাম অনুসারে-এগুলোর নামকরণ নিষ্পন্ন হয়েছে; যথা :—

(১) নেকড়ে বাঘ, (২) ভালুক, (৩) কচ্ছপ, (৪) বীভর, (৫) হরিণ, (৬) স্নাইপ্ (লম্বা ঠোঁটওয়ালা জলচর পাখি), (৭) হেরণ (পাখি) ও (৮) বাজপাখি। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রথাগুলো প্রচলিত আছে:

(১) গোষ্ঠী আপন সাথেম (শান্তি সময়ের গোষ্ঠীপতি) ও সর্দার (রণনেতা) নির্বাচন করে। গোষ্ঠীর সদস্যদের ভেতর থেকেই সাথেম নির্বাচিত হয়। সাথেমের পদ গোষ্ঠীর বেষ্টনীর ভেতরে বংশানুক্রমিকও বটে; কারণ, সাথেমের আসন শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করতে হয়। রণ-নেতা গোষ্ঠীর বাইরে থেকেও বেছে নেয়া যেতে পারে; আর এই পদ কিছু সময়ের জন্য শূন্য থাকতেও পারে।

ইরোকোয়াদের মধ্যে জননী-বিধির প্রচলন। কাজেই, পুত্রসন্তান অন্য গোষ্ঠীর লোক। সেইজন্য পিতার পর পুত্র সাখেম মনোনীত হতে পারে না। কাজে-কাজেই, প্রাক্তন সাখেমের ভাই বা তার ভাগনে প্রায়ই সাখেমের পদ গ্রহণ করে থাকে। নির্বাচনের সময় নর-নারী সকলেই ভোট দেয়। নির্বাচনের পর আরো সাতটা জেন্সের অনুমোদন লাভের দরকার। অনুমোদন লাভের পর সমগ্র ইরোকোয়া কনফেডারেসী বা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ পরিষদ ধুমধামের সঙ্গে নতুন সাখেমকে তার পদে অভিষিক্ত করে। এই প্রথার প্রকৃত তাৎপর্য কি তা পরে বোঝা যাবে। গোষ্ঠীর মধ্যে সাখেমের অধিকার অনেকটা পিতার অধিকার, খাঁটি নৈতিক অধিকার ছাড়া অন্য কিছুই নয়। গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার চালানোর সকল প্রকার উপায় থেকে সে বঞ্চিত। পদবলে সে সেনেকাদের জাতীয় পরিষদ এবং নিখিল ইরোকোয়া যুক্তরাষ্ট্র-পরিষদেরও সদস্য। রণ-নেতা কেবলমাত্র যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে হুকুম চালাবার অধিকারী।

(২) গোষ্ঠী ইচ্ছা করলে যে-কোন সময়ে সাখেম বা রণনেতাকে পদচ্যুত করতে পারে। নর-নারী সকলে মিলে এই কার্য সম্পন্ন করে। পদচ্যুতির পর সাখেম বা রণনেতা গোষ্ঠীর মধ্যে মামুলি বা সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করে। জাতীয় পরিষদ গোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধেও সাখেমদের বরখাস্ত করতে পারে।

(৩) কোন সদস্যই গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ে করতে পারে না। এইটাই গোষ্ঠীর মৌলিক বিধান; এই বিধানের বাঁধনেই গোষ্ঠী আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে। যে রক্ত-সম্পর্কের জোরে এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি গোষ্ঠী গড়ে তুলে, এই বিধিনিষেধ তার নেতি-মূলক অভিব্যক্তি মাত্র। এই সোজা তথ্যটা আবিষ্কার ক'রে মর্গ্যান্ সর্বপ্রথম গোষ্ঠীর গুপ্তরহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। এর আগে গোষ্ঠী সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান যে কিরূপ অসার ও তুচ্ছ ছিল, অসভ্য ও বর্বরদের সম্বন্ধে লিখিত পূর্বেকার বিবরণীগুলো পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিবরণীতে গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান-গঠনকারী বিভিন্ন দলকে নিতান্ত মূর্খের মত কোনরকমের ভেদ-রেখা না টেনে উপজাতি, গোষ্ঠী, থাম্ ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে। এইগুলো সম্পর্কে সময়ে সময়ে বলা হয়েছে যে, এইরকম দলের মধ্যে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এই ধরণের অদ্ভুত তথ্যসমূহ প্রচারের ফলে যে ধোঁয়ার রাজ্যের সৃষ্টি হয় তার সুযোগ গ্রহণ ক'রে মিঃ ম্যাকলেনান নেপোলিয়নী ফতোয়া জারি করে ঘোষণা করেন: উপজাতিগুলো দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক

শ্রেণীর উপজাতিগুলোর বিশেষত্ব এই যে, উপজাতির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ (**exogamous**) ; অপর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন উপজাতির নর-নারীর পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে করতে পারে (**endogamous**)। এই অপূর্ব আবিষ্কারের পর তিনি এই দুই আজগুবি শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টা অর্থাৎ বহির্বিবাহযুক্তশ্রেণী না অন্তর্বিবাহযুক্তশ্রেণীটা প্রাচীনতর, তাই নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমজ্জিত হন। মর্গ্যান্ কর্তৃক গোষ্ঠীপ্রথা আর বংশগত প্রথার উপর এর ভিত্তিমূল এবং সম-রক্তজদের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ আবিষ্কারেরপর এই 'গোবর গণেশের গবেষণা" বন্ধ হয়ে যায়। ইরোকোয়াদের মধ্যে গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ এখনো রীতিমত বলবৎ দেখা যায়।

(৪) মৃতব্যক্তির সম্পত্তির উপর গোষ্ঠী সদস্যদের অধিকার বলবৎ হয়। সম্পত্তি গোষ্ঠীর ভেতরেই থাক্‌বে, এই হচ্ছে দস্তুর। ইরোকোয়াদের সম্পত্তির দৌড় বিশেষ-কিছুই নয়। এইজন্য কোন ইরোকোয়া মরলে তার নিকট-আত্মীয়েরাই তার সম্পত্তি ভোগ-দখল করে। পুরুষের বেলায় ভাই, বোন আর মামারা সম্পত্তির হকদার হয় ; মেয়ের বেলায় তার সম্পত্তি ভোগদখল করে তার নিজের ছেলেমেয়ে আর বোনরা ; ভাইয়েরা মৃত বোনের সম্পত্তির ত্রিসীমানার মধ্যে ঘেঁষতে পারে না। এই সমস্ত কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখল করতে পারে না। ছেলেমেয়েরাও বাপের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

(৫) গোষ্ঠীর সদস্যেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা ও রক্ষা করতে বাধ্য ছিল ; বিশেষত, বহিঃশত্রু কোন সদস্যের ক্ষতি করলে সকলে মিলে শোধ নিতে চেষ্টা করতো। ব্যক্তি আপন নিরাপত্তার জন্য সমস্ত গোষ্ঠীর রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষা করতো এবং কাজের সময় সাহায্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক্‌তো। ব্যক্তির কোন ক্ষতি করলে সমস্ত গোষ্ঠীরই ক্ষতি করা হয়। এই থেকে, অর্থাৎ গোষ্ঠীর রক্তের বাঁধন থেকে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্বের উৎপত্তি। ইরোকোয়ারা ষোল-আনা এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। বাইরের কোন লোক গোষ্ঠীর কোন সদস্যকে খুন করলে সমগ্র গোষ্ঠী তার রক্ত দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতো। প্রথমত, মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হতো। হত্যাকারীর গোষ্ঠীর লোকেরা সভা করে মীমাংসার শর্তগুলো নিহত ব্যক্তির গোষ্ঠী-পরিষদের নিকট

দাখিল করতো। এই সঙ্গে রীতিমতভাবে দুঃখ-প্রকাশ এবং বহুমূল্য উপহারও প্রেরণ করা হ'তো। এই সমস্ত গৃহীত হ'লে গোলযোগের নিষ্পত্তি হ'য়ে যেতো। অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী এক বা ততোধিক প্রতিশোধ-গ্রহণকারী নিয়োগ করতো; এরা হত্যাকারীর অনুসরণ করে তাকে খুন করে ফেল্‌তো। এই কাজ সম্পন্ন হ'লে খুনী ব্যক্তির গোষ্ঠীর তরফ থেকে অভিযোগ করার কোন কারণ থাক্‌তো না। এইখানে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হ'য়ে যেত।

(৬) গোষ্ঠীর কতকগুলো বিশেষ ধরণের বা বিশেষ শ্রেণীর নাম থাকে, যেগুলো সমগ্র উপজাতির মধ্যে একমাত্র এই গোষ্ঠীই ব্যবহার করতে পারে। কাজেকাজেই, কোন ব্যক্তির নাম শুন্‌লেই সে কোন্ গোষ্ঠীর লোক তা সহজেই ধরা পড়ে। গোষ্ঠীগত নাম গোষ্ঠীভূত অধিকারসমূহও ভোগ করে থাকে সহজ-সিদ্ধভাবে।

(৭) গোষ্ঠী বিদেশীয়দের দত্তকরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে সমগ্র উপ-জাতিরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। যে-সব যুদ্ধ-বন্দীদের খুন করা হ'তো না, সেনেকারা তাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতো; ফলে তারা উপজাতিরও অন্তর্ভুক্ত হ'তো এবং গোষ্ঠীগত ও উপজাতীয় অধিকারসমূহের পুরাপুরি অধিকারী হ'তো। গোষ্ঠীর কোন সদস্য দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করতো। দত্তকগ্রহণকারী পুরুষ হ'লে নবাগতকে ভাই বা বোন বলে আর দত্তকগ্রহণকারী নারী হ'লে বিদেশীকে ছেলে বা মেয়ে বলে গ্রহণ করতো। অতঃপর সমগ্র উপজাতি উৎসব-আড়ম্বরের মধ্যে এই দত্তকগ্রহণ অনুমোদন করতো। সময় সময় কোন গোষ্ঠী লোকহীন হ'লে অপর কোন গোষ্ঠীর সম্মতি নিয়ে সেই গোষ্ঠীকে পুরাপুরিভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিত। ইরোকোয়াদের মধ্যে গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিকরণ উপজাতির গণ-পরিষদে অনুষ্ঠিত হ'তো। সেইজন্য ইহা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

(৮) ইণ্ডিয়ান সমাজের গোষ্ঠীগুলোয় মধ্যে বিশেষ ধরণের কোন ধর্মীয় উৎসবাদি দেখা যায় না। যা-কিছু পাল-পার্বণ গোষ্ঠীর ক্রিয়া-কলাপেরই অন্তর্ভুক্ত। ইরোকোয়াদের মধ্যে, তাদের ছটা বার্ষিক উৎসবের সময় অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথেম্ ও রণ-নায়করা পদাধিকার বলেই "ধর্মসংরক্ষকদের" মধ্যে আসন গ্রহণ করে পুরোহিতরূপে কাজ করতো।

(৯) গোষ্ঠীর পৃথক সর্বজনীন সমাধিক্ষেত্রও ছিল। নিউইয়র্ক ষ্টেটের ইরোকোয়াদেরও পূর্বে নিজস্ব গোরস্থান ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার চারদিকে

শ্বেত নর-নারীর বসতি স্থাপিত হওয়ায় এখন উহা লোপ পেয়েছে। অন্যান্য ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে, বিশেষত, ইরোকোয়াদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তুস্কারোরাসদের মধ্যে এখনো সর্বজনীন গোরস্থানের রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায়। এরা খৃস্টান হ'লেও সমাধিক্ষেত্রে প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট সারির ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য মা ও তার ছেলেমেয়েদের একই সারিতে গোর দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে বাপের কোন স্থান নেই। ইরোকোয়াদের ভেতরেও কবর দেওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির সমগ্র গোষ্ঠী উপস্থিত হ'য়ে শোক প্রকাশ করে; কবর তৈরি করে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বক্তৃতা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে।

(১০) প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটা পরিষদ থাকে। গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকে নিয়ে এই গণতান্ত্রিক পরিষদে প্রত্যেকেই সমান ভোটের অধিকারী। এই পরিষদে সাখেম্, রণ-নায়ক ও অন্যান্য "ধর্ম-সংরক্ষক" (পুরোহিত) নির্বাচিত হয়, আবার এই পরিষদই এদেরকে পদচ্যুত করে। পূর্বে এই পরিষদ গোষ্ঠীর নিহত লোকজনদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের মূল্য নির্ধারণ অর্থাৎ রক্তের প্রতিশোধ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো; বিদেশীয়দের পোষ্যরূপে গ্রহণও এই পরিষদ কর্তৃক নিষ্পন্ন হ'তো। এককথায়, গোষ্ঠীর সার্বভৌম ক্ষমতা এই পরিষদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

ইণ্ডিয়ান সমাজের এক-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর এই সমস্ত ক্ষমতা ছিল। "প্রতিটি ইরোকোয়া গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারী, আর এরা সকলেই পরস্পরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাধ্য। সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তিগত অধিকারসমূহ সম্পর্কেও তারা ছিল সকলেই সমান; সাখেম বা রণ-নায়করা কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না; রক্তের-বাঁধন দ্বারা সকলেই এক ভ্রাতৃ-মণ্ডলের ভেতরে ঐক্য-সংবদ্ধ। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ও স্বাধীনতা প্রকাশ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ না হ'লেও এইগুলো গোষ্ঠীর মূল আদর্শে পরিণত ছিল। গোষ্ঠী ছিল সমাজ-ব্যবস্থার একক কেন্দ্র; এই ভিত্তির উপরেই ইণ্ডিয়ান সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা-প্রীতি ও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ যে ইণ্ডিয়ান চরিত্রের সর্বজনীন বিশেষত্ব, এই সমস্ত ব্যাপারে তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।"

ইউরোপিয়ানরা যখন আমেরিকা আবিষ্কার করে তখন উত্তর-আমেরিকার গোটা ইণ্ডিয়ান সমাজ জননী-বিধি-শাসিত গোষ্ঠীসমূহ দ্বারা সংগঠিত ছিল। মাত্র অল্পসংখ্যক কয়েকটা উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠী-প্রথা লোপ পেয়েছিল। উদাহরণ

স্বরূপ ডাকোটা উপজাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর কয়েকটি, যথা, ওজিবা, ও মাহা প্রভৃতি উপজাতি জনক-বিধি দ্বারা শাসিত হ'তো।

পাঁচ-ছটার বেশি গোষ্ঠীবিশিষ্ট বহু ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে দেখা যায়, তিন, চার, বা ততোধিক গোষ্ঠী এক-একটা বিশেষ শ্রেণীতে মিলিত হয়েছে। মর্গ্যান্ বিশ্বস্তভাবে ভারতীয় শব্দটার গ্রীক প্রতিশব্দ দ্বারা তরজমা করে এই বিশেষ শ্রেণীর নাম দিয়েছেন "ফ্রেত্রী" (ভ্রাতৃমণ্ডলী)। সেনেকা উপজাতি এইরূপ দুটো ফ্রেত্রীতে বিভক্ত; ১ থেকে ৪ পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলো প্রথম ফ্রেত্রীর আর ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলো দ্বিতীয় ফেত্রীর অন্তর্ভুক্ত। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালালে দেখা যায়, উপজাতি প্রথমে যে-সমস্ত গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়, ফ্রেত্রীগুলো তাছাড়া অন্য কিছুই নয়। গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ে যখন নিষিদ্ধ হয়, তখন স্বাধীনভাবে টিকে থাকার জন্যে প্রত্যেক উপজাতিকে অন্ততপক্ষে দু'টো গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতে হয়। উপজাতি যেমন বেড়ে চলে, প্রত্যেক গোষ্ঠীও তেমনি দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্ত নুতন গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে পৃথক গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করে আর মূল গোষ্ঠীটি শেষপর্যন্ত ফ্রেত্রীরূপে চল্‌তে থাকে। সেনেকা ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এক ফ্রেত্রীর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলা পরস্পরের নিকট ভ্রাতৃ-গোষ্ঠীরূপে গণ্য এবং অন্যান্য ফ্রেত্রীর গোষ্ঠীগুলো তাদের জ্ঞাতিভাই বা কুটুম্ব গোষ্ঠীরূপে গণ্য। আমেরিকান বংশগত প্রথায় এই সমস্ত শব্দ যে বাস্তব ও রীতিমত অর্থ-বোধক শব্দে পরিণত তা আমরা ইতিপূর্বেই বেশ টের পেয়েছি। প্রথমত কোন সেনেকাই ফ্রেত্রীর মধ্যে বিয়ে করতে পারতো না। কিন্তু এই বাধানিষেধ বহু পূর্বেই লোপ পেয়ে এখন মাত্র গোষ্ঠীর বেষ্টনীর ভেতরে বলবৎ আছে। সেনেকাদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে "ভালুক" আর "হরিণ" এই দুটো ছিল মূল গোষ্ঠী; বাদ-বাকি গোষ্ঠীগুলো কালক্রমে এই দুই গোষ্ঠীর শাখারূপেই পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে। এই নতুন প্রথা সমাজে শিকড় গাড়ার পরে অবশ্য প্রয়োজনমত এর অনেক রদ-বদল হয়। ফেত্রীর অন্তর্ভুক্ত কোন কোন গোষ্ঠী লোপ পেলে অন্যান্য ফ্রেত্রী থেকে গোটাকয়েক গোষ্ঠী পুরাপুরি টেনে এনে লুপ্ত গোষ্ঠীগুলার অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন ফেত্রীর জন-সংখ্যার সমতা রক্ষা করা হয়। এই জন্য বিভিন্ন উপজাতির বিভিন্ন ফ্রেত্রীর মধ্যে একই নামের গোষ্ঠী ঠাঁই পেতে দেখা যায়।

ইরোকোয়াদের মধ্যে ফ্রেত্রী আংশিকভাবে সামাজিক এবং আংশিকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও বটে। (১) বল খেলার সময় এক ফ্রেত্রী অপর ফ্রেত্রীর বিরুদ্ধে

প্রতিযোগিতার নামে। প্রত্যেক ফ্রেত্রী আপন আপন বাছা বাছা খেলোয়াড়দের ম্যাচে নামায়। প্রত্যেক ফেত্রীর অন্যান্য লোকজন দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আর জয় লাভ সম্বন্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে বাজিও চল্‌তে থাকে। (২) উপজাতীয় পরিষদে প্রত্যেক ফ্রেত্রীর সাখেম ও লড়াইয়ের নায়ক একত্রে বসে। দুই দল পরস্পরের দিকে মুখোমুখি হ'য়ে আসন গ্রহণ করে। প্রত্যেক বক্তা আপন ফ্রেত্রীর সদস্যদের লক্ষ্য করে বক্তৃতা করে। (৩) কোন উপজাতির মধ্যে যদি হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং নিহত ও হত্যাকারী ভিন্ন ভিন্ন ফ্রেত্রীর সদস্য হয়, তাহ'লে নিহত ব্যক্তির গোষ্ঠী ভ্রাতৃ-গোষ্ঠীদের নিকট আবেদন করে। ফলে, সমগ্র ফ্রেত্রীর পরিষদের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে মীমাংসার জন্যে অপর ফ্রেত্রীকে অনুরূপ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্যে অনুরোধ করা হয়। এখানে দুহিতৃস্থানীয়া দুর্বল গোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর সাফল্য লাভের আশায় ফ্রেত্রী মূল গোষ্ঠীরূপেই আত্ম-প্রকাশ করে। (৪) খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘট্‌লে বিরোধী ফ্রেত্রীকে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যোগাড়-যন্ত্র করতে হয়। মৃতের ফ্রেত্রী এই সময় উপস্থিত থেকে শোক প্রকাশ করে। সাখেমের মৃত্যু ঘট্‌লে বিরোধী ফ্রেত্রী সাখেমের পদ শূন্য হয়েছে বলে ইরোকোয়াদের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করে। (৫) সাখেম নির্বাচনের সময়েও ফ্রেত্রী-পরিষদ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়। ভ্রাতৃস্থানীয় গোষ্ঠিগুলো এই নির্বাচন গতানুগতিকভাবে মেনে নিলেও অপর ফ্রেত্রী আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধী ফ্রেত্রী পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। অধিবেশনে যদি আপত্তির প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহ'লে নির্বাচন নাকচ হ'য়ে যায়। (৬) ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পূর্বে কতকগুলো গুপ্ত-ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। শ্বেতাঙ্গরা এইগুলোর নাম দিয়েছিল "ঔষধাগার"। সেনেকাদের মধ্যে দু'টো ধর্মীয় ভ্রাতৃ-মণ্ডলী কর্তৃক এই সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তো। এই অনুষ্ঠানের ভেতরে নতুন নতুন সদস্যদের দীক্ষা দিয়ে ভর্তি করাও হ'তো। দু'টো ফ্রেত্রীর প্রত্যেকটিতে এক একটি করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। (৭) শ্বেতাঙ্গদের অভিযানের সময় ত্লাস্কালার (Tlascala) চারটে দিক চারটে বংশের হাতে ছিল। বংশ চারটে যে চার-চারটে ফ্রেত্রী তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই বলা চলে যে, জার্মান ও গ্রীক সমাজের মত ইণ্ডিয়ান ফ্রেত্রীগুলোও লড়াইয়ের কেন্দ্র ছিল। এই চার বংশের লোকজন বিভিন্ন দলে সমবেত হ'য়ে আপন আপন ইউনিফর্ম প'রে, নিজস্ব পতাকা উড়িয়ে আপন আপন দলপতির অধীনে লড়াই করতে যেত।

একাধিক গোষ্ঠি যে-ভাবে ফ্রেত্রী গঠন করে, একাধিক ফ্রেত্রী নিয়ে তেমনি উপজাতির অস্তিত্ব সমঝাতে হ'বে। কখনো কখনো উপজাতি যখন দুর্বল বা সংখ্যাশক্তিতে হীন হ'য়ে পড়ে তখন মধ্যবর্তী যোগসূত্র ফ্রেত্রী লোপ পেতে দেখা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান উপজাতির বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ লক্ষণগুলো কি ?

(ক) ইহার নিজস্ব জনপদ ও নিজস্ব নাম। প্রকৃত বসবাসের জায়গা ছাড়া প্রত্যেক উপজাতির শিকার ও মাছ ধরার উপযোগী যথেষ্ট জমি-জমা থাকতো। এর পরে থাকতো পার্শ্ববর্তী উপজাতির এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ নিরপেক্ষ (বে-ওয়ারিশ) জমি। পার্শ্ববর্তী উপজাতি দুটোর ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে এই নিরপেক্ষ জমির আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট হ'তো। কিন্তু উপজাতি দুটোর ভাষার মধ্যে যদি খুব বেশি পরিমাণে গরমিল থাকতো তাহলে নিরপেক্ষ জমির আয়তন যথেষ্ট বড় হ'তো। জার্মানদের সীমান্তবর্তী জঙ্গল, সিজার বর্ণিত সুয়েভী কর্তৃক তাদের এলাকার চারদিকে সৃষ্ট পতিত জমি, ডেন ও জার্মানদের মধ্যে 'ইজার্ণ হোল্ট' (Danish *jarnved, limes Danicus*) স্থাকৃসন বনানী এবং জার্মান ও স্লাভদের মধ্যে 'ব্রানিবর' এই ধরণের নিরপেক্ষ এলাকা ছিল। "ব্রানিবর" থেকেই ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই সমস্ত অনির্দিষ্ট সীমান্তের মধ্যবর্তী এক-একটা জনপদ এক-একটা উপজাতির যৌথ এলাকা-রূপে গণ্য হ'তো। পার্শ্ববর্তী উপজাতিগুলোও এই সীমানা-চৌহদ্দি মেনে চলতো। শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রত্যেক উপজাতি আপন আপন জনপদ রক্ষা করতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জন-সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেলে সীমান্তরেখার অনিশ্চয়তা নিয়ে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে। উপজাতিগুলোর নাম নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। কোন উপজাতি ইচ্ছা করে বা বিশেষ চিন্তা করে নিজেদের নাম স্থির করে—এইরূপ ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। সময়ে সময়ে এমনও ঘটে যে, প্রত্যেক উপজাতির লোকজন নিজেদের উপজাতিকে যে নামে অভিহিত করে, পার্শ্ববর্তী উপজাতিরা তার বদলে তাদের অন্য নামে ডেকে থাকে। কেল্টরাই প্রথমে জার্মানদের জার্মান নামে অভিহিত করে।

(খ) প্রত্যেক উপজাতির বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ভাষা। উপজাতি ও ভাষার সীমানা প্রায় সমান সমান। অল্পদিন আগেও নতুন নতুন উপজাতি গড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ভাষার সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে। আমেরিকার আজও

এই ঘটনা ঘটছে। যখন দু'টো ক্ষীয়মান উপজাতি মিলে এক হ'য়ে গিয়েছে, তখন দেখা যায়, একই উপজাতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বিভিন্ন ভাষা চলছে। তবে এই ঘটনা অপেক্ষাকৃত বিরল। আমেরিকার উপজাতিগুলোর গড় সংখ্যাশক্তি ২,০০০-এরও নীচে, তবে চেরোকী উপজাতির জনসংখ্যা ২৬,০০০। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একই ভাষা-ভাষী এত বড় উপজাতি আর দেখা যায় না।

(গ) বিভিন্ন গোষ্ঠীকর্তৃক নির্বাচিত সাখেম ও রণ-নায়কদের গদীনসিন করার অধিকার, এবং

(ঘ) এমন-কি, গোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে আবার পদচ্যুত করার অধিকার। এই সব সাখেম ও রণ-নায়ক উপজাতীয় পরিষদেরও সদস্য; কাজেই, উপজাতি এই অধিকার ভোগের অধিকারী। বিভিন্ন উপজাতিকে নিয়ে যেখানেই কনফেডারেশী বা রাষ্ট্র-সম্মেলন গড়ে উঠেছে, সেখানে এই অধিকার ও একৃতিয়ার শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের তাঁবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

(ঙ) একই ধরণের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা (পুরাতত্ত্ব) ও উপাসনা পদ্ধতি। "বর্বরদের স্তর হিসেবে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরাও ধর্মপ্রাণ মানুষ।" এদের পুরাবৃত্ত নিয়ে এখনো কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হয় নি। এরা মানুষের আকারে নানাপ্রকার দেব-দেবীর কল্পনা করে থাকে। নানাপ্রকার ভূত-প্রেতই তাদের দেব-দেবী; কিন্তু বর্বর অবস্থার নিম্নস্তরে ছিল বলে প্রতিমা গড়ার রেওয়াজ তখনো এদের মধ্যে আরম্ভ হয় নি। প্রকৃতি-পূজা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা এদের ধর্মীয় বিশেষত্বে পরিণত। বহু-দেবত্বের দিকে এরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে তাদের নিয়মিত উৎসব ও নির্দিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ড, বিশেষত, নাচ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক উপজাতি পৃথকভাবে আপন-আপন উৎসব ও পাল-পার্বণ পালন করতো।

(চ) সর্বজনীন কাজকর্ম পরিচালনের জন্য উপজাতীয় পরিষদ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাখেম ও রণ-নায়কদের নিয়ে এই পরিষদ সংগঠিত। এরা সকলেই খাঁটি প্রতিনিধিস্থানীয়; কারণ ইচ্ছা করলেই এদের পদচ্যুতও করা যেতো। পরিষদের অধিবেশন বসতো প্রকাশ্যে; জাতির অন্যান্য সদস্যরা পরিষদের চারদিকে স্থান গ্রহণ করতো। এরাও স্বাধীনভাবে আলোচনায় যোগদান ক'রে তাদের মতামত জানাতে পারতো। পরিষদ এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো।

প্রত্যেকেই আপন আপন অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপনের অধিকারী ছিল। মেয়েরাও তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি খাড়া করে তাঁদের মতামত জানাতে পারত। ইরোকোয়াদের মধ্যে চরম-সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। জার্মান মার্ক-সম্প্রদায়গুলোর ভেতরেও নানাবিষয়ে এই রকম সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তের রেওয়াজ ছিল। প্রধানত, অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক পরিচালনই ছিল উপজাতীয় পরিষদের বিশেষ ধান্ধা। ইহা দূতের আদান-প্রদান করতো এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের অধিকারও এর করায়ত্ত ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হলে সাধারণত স্বেচ্ছা-সেবকরাই তা চালাতো। কোন একটা উপজাতির সঙ্গে যে-সব উপজাতির সন্ধি হয় নি তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে চিরন্তনী যুদ্ধের অবস্থা চলছে, ইহাই ছিল সনাতন রীতি। খ্যাতনামা যোদ্ধারাই ব্যক্তিগতভাবে এই সব শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার ভার গ্রহণ করতো। এরা যুদ্ধের নাচ্ শুরু করতো। যুদ্ধে যোগদানে ইচ্ছুক সকলেই এই নাচে যোগ দিত। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধ-দল গঠন করে অবিলম্বে যুদ্ধ-যাত্রা করা হ'তো। উপজাতীয় এলাকা আক্রান্ত হ'লেও স্বেচ্ছা-সেবকরাই তা রক্ষার ভার গ্রহণ করতো। যোদ্ধদলের যুদ্ধ-যাত্রা ও যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন দুই-ই মহা-সমারোহের ভেতর সম্পন্ন হ'তো। এই ধরণের অভিযান চালাবার সময় উপজাতীয় পরিষদের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। এই ধরণের অনুমতি চাওয়াও হ'তো না, দেওয়াও হ'তো না। তাসিতুস্-বর্ণিত জার্মান যোদ্ধদলও ঠিক এই ধরণের চিজ্ ছিল। তবে জার্মানদের বেলায় এই পার্থক্য দেখা যায় যে, এই সমস্ত যোদ্ধা অনেকটা পেশাদার জীবে পরিণত। শান্তির সময়েও এরা পৃথকভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতো। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধের সময় এদের সঙ্গে যোগদান করতো। ইণ্ডিয়ানদের যোদ্ধদলগুলি প্রায়ই ছোটখাটো আকারের ছিল। এমন-কি, বহু দূরবর্তী স্থানেও বড় বড় অভিযানগুলো মুষ্টিমেয় যোদ্ধাদের দ্বারাই পরিচালিত হ'তো। ব্যাপক অভিযান পরিচালনের উদ্দেশ্যে এই ধরণের ছোট ছোট যোদ্ধদলগুলো একত্রে মিলিত হলেও প্রত্যেকটি দল আপন আপন দলপতির হুকুম মেনে চলতো। এই সমস্ত দলপতির বৈঠক যুদ্ধ-পরিচালনায় অল্পবিস্তর ঐক্যবিধানের ব্যবস্থা করতো। আমিয়ানুস্ মার্সেলিনুস্ লিখিত বিবরণীতে আমরা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "আপার রাইনের" আলামান্নী জার্মানদের ভেতরও এই ধরণের যুদ্ধ-প্রণালীর পরিচয় পাই।

(ছ) কোন কোন উপজাতির মধ্যে এক-একজন প্রধান সর্দারের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু এর ক্ষমতা ও অধিকার নিতান্ত সীমাবদ্ধ। ইনি একজন সাথেম মাত্র। জরুরী অবস্থায় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে ইনি সামরিক ব্যবস্থাদি করে থাকেন। পরে অবশ্য উপজাতীয় পরিষদের অধিবেশনে চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শাসন-ক্ষমতাযুক্ত অফিসার পদ সৃষ্টির প্রথম যৎসামান্য চেষ্টাচরিত্ররূপেই এই উপজাতীয় সর্দারদের অভ্যুদয় ঘটলেও অবস্থা বেশিদূর গড়ায়নি মোটেই। সমস্তক্ষেত্রে না হ'লেও অধিকাংশক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষরাই এই ধরণের অফিসারে পরিণত হওয়ার অবকাশ পেয়েছে।

আমেরিকাবাসী অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান উপজাতির অতিরিক্ত কোনরূপ সঙ্ঘ-জীবন গড়ে উঠতে সমর্থ হয়নি। ছোট ছোট উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে এরা বসবাস করে। নিরপেক্ষ বিস্তৃত পোড়ো জমি বা বনভূমি প্রত্যেকটি উপজাতির এলাকাকে অপর উপজাতির এলাকা থেকে পৃথক করে রাখে। অবিশ্রান্ত পারস্পরিক সংগ্রামের ফলে এদের শক্তি ক্ষয় হয়; ফলে বিস্তৃত এলাকা অল্প-সংখ্যক মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হয়। জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে এখানে-সেখানে মাঝে মাঝে কুটুম্বস্থানীয় উপজাতিগুলির মধ্যে মৈত্রী সংঘ গড়ে উঠ্‌লেও প্রয়োজন মিটার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবে কোন কোন অঞ্চলে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত উপজাতিগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার স্থায়ী উপজাতিসঙ্ঘে মিলিত হয়। এইভাবে আধুনিক ধরণের জাতিরূপে গড়ে উঠার দিকে প্রথম চেষ্টা বা প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরোকোয়াদের মধ্যে এই উপজাতি-সঙ্ঘ সর্বোচ্চ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ডাকোটা উপজাতির শাখারূপে মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরে ছিল এদের আদিম বসবাস। নানাস্থানে পরিভ্রমণের পর এখন তারা নিউইয়র্ক স্টেটে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। সেনেকা, কায়ুগা, ওনোণ্ডাগা, ওনাইডা ও মো-হক—এই পাঁচটা উপজাতিতে এরা বিভক্ত। মাছ, শিকার-লব্ধ প্রাণীর মাংস ও আদিম ধরণের শাক-সব্‌জী ছিল এদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। খুঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা গাঁয়ে এরা বাস করতো। এদের সংখ্যা বড় জোড় ২০,০০০। কতকগুলো গোষ্ঠী পাঁচটা উপজাতিতেই বর্তমান। একই ভাষা থেকে উদ্ভূত পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত পাঁচটা উপভাষায় এরা কথাবার্তা বলে। সুবিস্তীর্ণ একই এলাকা পাঁচটা উপজাতি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এই অঞ্চলটা নতুন করে দখল করা হয়।

কাজেই, যে সব অধিবাসীকে স্থানচ্যুত করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে এদের পারস্পরিক সহযোগিতা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটা নিয়মিত স্থায়ী লীগ বা উপজাতিসঙ্ঘ গড়ে উঠে। নব-লব্ধ শক্তির স্বাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এরা আক্রমণধর্মী বা মারমুখো হয়ে উঠে। ১৬৭৫ সনে এরা ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করে। তখন এরা পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাগুলো জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের বিতাড়িত করে অথবা করদাতা অধীন উপজাতিতে পরিণত করে। মেক্সিকো, নিউ মেক্সিকো ও পেরু এই তিন দেশের অধিবাসী ছাড়া আমেরিকার অন্যান্য সমস্ত ইণ্ডিয়ান তখন পর্যন্ত বর্বর-যুগের নিম্নস্তর অতিক্রম করতে পারে নি। ইরোকোয়া উপজাতি-সঙ্ঘ এই সমস্ত ইণ্ডিয়ানের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই উপজাতি সঙ্ঘের মূল বিশেষত্বগুলো নিম্নরূপ ছিল :—

(১) পূর্ণ সাম্য এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে প্রত্যেকটি জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে এই একবংশজাত পাঁচটা উপজাতির চিরন্তন রাষ্ট্রসম্মেলন গড়ে উঠে। রক্তের বাঁধন অর্থাৎ জ্ঞাতিসম্পর্ক এই রাষ্ট্র-সম্মেলনের ভিত্তিমূল। পাঁচটা উপজাতির মধ্যে তিনটে জনক-উপজাতিরূপে গণ্য। এরা পরস্পরের ভ্রাতৃস্থানীয়। বাকি উপজাতি দুটি সন্তান-উপজাতি ; এরাও পরস্পরের ভাই। প্রাচীনতম তিনটে উপজাতির জীবন্ত প্রতিনিধি পাঁচটা উপজাতির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। অপর তিনটে গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটে উপজাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির সদস্যগণ পাঁচটা উপজাতির মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলে জানে। কথিত ভাষার সামান্য সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ভাষার ঐক্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উপজাতিগুলো একই মূল বংশ থেকে উৎপন্ন।

(২) এই রাষ্ট্র-সম্মেলনের কার্য-নির্বাহক প্রতিষ্ঠানটা ছিল পঞ্চাশ জন সাখেমকে নিয়ে গঠিত পরিষদ। এদের সকলেরই ছিল সমান ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদা। সম্মেলন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে এই পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তরূপে গণ্য হ'তো।

(৩) এই রাষ্ট্র-সম্মেলন গঠনের সময় সমস্ত উপজাতি ও গোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত এই পঞ্চাশ জন সাখেম, রাষ্ট্র-সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন পদের বাহকরূপে গণ্য হতো। কোন সাখেমের পদ শূন্য হ'লে তার গোষ্ঠী থেকে এই পদ পূরণ করা হতো। গোষ্ঠী কোন সাখেমকে পদচ্যুত

করতেও পারতো। কিন্তু সাখেমকে পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত করা-না-করা রাষ্ট্র-সম্মেলনের পরিষদের মরজির উপরেই নির্ভর করতো।

(৪) রাষ্ট্র-সম্মেলনের সাখেমরা আপন আপন উপজাতির সাখেমও বটে। উপজাতীয় পরিষদেও এদের আসন ছিল এবং সেখানে ভোট দিতে পারতো।

(৫) রাষ্ট্র-সম্মেলন পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়ার প্রয়োজন।

(৬) ভোট দেওয়া হ'তো উপজাতি হিসেবে; কাজে কাজেই, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক উপজাতি ও পরিষদের সমস্ত সদস্যের ভোট সওয়ার প্রয়োজন হ'তো।

(৭) পাঁচটা উপজাতীয় পরিষদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র-সম্মেলন পরিষদের বৈঠক আহ্বান করতে পারতো; রাষ্ট্র-সম্মেলন পরিষদ নিজের ইচ্ছায় আপন অধিবেশন বসাতে পারতো না।

(৮) সমবেত জনসাধারণের সমক্ষে পরিষদের অধিবেশন বসতো। প্রত্যেক ইরোকোয়াই কথা বলার অধিকারী ছিল। একমাত্র পরিষদই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো।

(৯) রাষ্ট্র-সম্মেলনের কোন স্থায়ী অধ্যক্ষ বা কোন প্রধান কর্ম-সচিব ছিল না।

(১০) অপরপক্ষে, পরিষদের দু'জন প্রধান রণ-নায়ক ছিল। এরা সমান ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল (স্পার্টার দুই রাজা ও রোমের দুই কন্সাল)।

এইরকম সামাজিক ব্যবস্থার ভেতরই ইরোকোয়ারা চারশ' বছরের অধিক সময় যাপন করেছে এবং এখনও এই ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে। আমি এ-সম্বন্ধে মর্গ্যানের বিবরণী কিছুটা সবিস্তারেই বর্ণনা করেছি; কারণ রাষ্ট্র-বর্জিত সমাজের ধারণ-ধারণ যে কিরূপ এখানে আমরা তার সম্যক পরিচয় লাভ করেছি। রাষ্ট্র জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণরূপে একটি পৃথক সত্ত্বের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জার্মান পণ্ডিত মাওয়ার মার্ক বা জার্মান পল্লি-স্বরাজকে রাষ্ট্রের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য-বিশিষ্ট খাঁটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করে ঠিক কথাই বলেছেন।—পরে অবশ্য এই পল্লি-স্বরাজকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র জিনিসটা গড়ে উঠে। এইজন্য তিনি তাঁর সমগ্র লেখায় প্রাচীনতম পল্লি-স্বরাজ, গ্রাম, শহর ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র-শক্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই বর্ণনা করেন। উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আমরা দেখেছি, একটিমাত্র আদি সম্মিলিত উপজাতি কিভাবে একটা সুবিশাল মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে, কি করে বিভিন্ন উপজাতি বিভক্ত হয়ে কতকগুলো জাতিতে পরিণত হয়; তাবাগুলো এমনি

বদলে যায় যে, অন্যান্য উপজাতির কাছে ক্রমেই তা দুর্বোধ্য হয়ে উঠে; মূল ভাষার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। গোষ্ঠীও অনেকগুলো পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। মূল গোষ্ঠীটা ফ্রেত্রীরূপে কোনমতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। বহু দূরবর্তী এবং পৃথক হয়ে পড়েছে এমন উপজাতিগুলোর মধ্যেও প্রাচীন গোষ্ঠী-গুলোর নাম কিন্তু আদৌ বদলায়নি। অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে নেকড়ে ও ভল্লুক নামের গোষ্ঠী এখনো দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে যে সমাজ-কাঠামোর পরিচয় দেওয়া গেল, তা ইণ্ডিয়ান সমাজের সমস্ত উপজাতির পক্ষেই প্রযোজ্য। অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান উপজাতিই কিন্তু একবংশীয় উপজাতিগুলোকে নিয়ে রাষ্ট্র-সম্মেলনের ধাপ পর্যন্ত উঠ্‌তে পারেনি।

গোষ্ঠীকে সমাজের একক কেন্দ্ররূপে ধরে নেবার পর, এই কেন্দ্র থেকে গোষ্ঠী ফ্রেত্রী ও উপজাতি নিয়ে গঠিত সমাজ-ব্যবস্থা যে স্বভাবত এবং সেইজন্য বাধ্য হয়ে গড়ে উঠ্‌বে তা আমরা বেশ বুঝতে পারছি। বংশগত সম্পর্কের বিভিন্ন তারতম্য বা পরিমাণ অনুসারে গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতি নামক দলগুলো গড়ে উঠে। প্রত্যেকটিই স্ব-প্রতিষ্ঠিত ও আপন আপন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। কিন্তু প্রত্যেকটি বাকি দল বা প্রতিষ্ঠান দুটোর পরিপূরক হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করে, নিম্নস্তরে অবস্থিত বর্বরদের সমস্ত সরকারী কাজকর্ম তার ভেতরেই সীমাবদ্ধ। কাজে কাজেই, যে জাতির মধ্যেই আমরা গোষ্ঠীকে সামাজিক কেন্দ্ররূপে দেখতে পাই সেখানেই আমরা পূর্ব-বর্ণিত উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ পেতে পারি। যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য ও নিদর্শনাদি মিলে,—যেমন গ্রীক ও রোমানদের সম্পর্কে—সেখানেই আমরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ পেতে পারি। আর কেবলমাত্র তাই নয়; তথ্য ও সূত্র থেকে জাতীয় কাঠামোর আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যদি গোলযোগও উপস্থিত হয়, তা হ'লেও আমেরিকান সামাজিক ব্যবস্থা থেকে বেশ সহজেই আমরা প্রকৃত অবস্থা যে কিরূপ ছিল তা বুঝে নিতে পারি। এই পথে গবেষণা চালালে ইতিহাসের অনেক সন্দেহের নিরসন এবং অনেক দুর্বোধ্য হেঁয়ালির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

বাল্যোচিত সরলতার আধার কি সুন্দর এই গোষ্ঠী-প্রথা! সৈন্য নেই, পুলিশ ও শান্ত্রী নেই। অভিজাত, রাজা, গবর্ণর, ও বিচারক, কারাগার ও মামলা মোকর্দমারও একান্ত অভাব। তবুও সমস্ত কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। ঝগড়া-বিবাদ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সমগ্র সমাজদেহও এতে নাড়া দিয়ে উঠে,

মীমাংসাও করে সমগ্র সমাজ, গোষ্ঠী বা উপজাতিরূপে। কখনো কখনো গোষ্ঠী-গুলো নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেয়। বিবাদ-বিসম্বাদ যখন চরম অবস্থায় পৌঁছে একমাত্র তখনই রক্তপাত করে প্রতিশোধ গ্রহণের বিভীষিকা উপস্থিত হয়। এরকম খুব কমই ঘটে। আমাদের মৃত্যুদণ্ডকে এই রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের সভ্যতা-সম্মত সংস্করণ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু নতুন সংস্করণে সভ্যতার সুবিধা-অসুবিধাগুলোও এসে জুটেছে। বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি কাজ যৌথভাবে সম্পন্ন হ'তো। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে যৌথভাবে ঘর-গৃহস্থালি চালাতো। জমি ছিল উপজাতীয় সম্পত্তি। এক-একটা পরিবার কেবলমাত্র সাময়িকভাবে ছোট-খাটো গৃহ-সংলগ্ন বাগান নিজের তাঁবে রাখতে পারতো। এই সমস্ত কারণ সত্বেও এখনকার দিনে শাসনকার্যে যে জটিলতা ও নানাপ্রকার বিভাগ-উপবিভাগ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তখন তার নাম-গন্ধও ছিল না; যাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ তারা নিজেদের মধ্যেই নিষ্পত্তি করে নিত। অধিকাংশক্ষেত্রে বহু শতাব্দীর প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিবাদ-বিসম্বাদ আগে থেকেই নিষ্পন্ন হয়ে যেত। দরিদ্র ও অভাব-গ্রস্তের এখানে কোন অস্তিত্ব নেই। বৃদ্ধ, রুগ্ন ও যুদ্ধে অসমর্থদের সম্পর্কিত দায়িত্বগুলো সম্বন্ধে পরিবার ও গোষ্ঠী উত্তমরূপেই অবগত ছিল। সকলেই সমান ও স্বাধীন। মেয়েরাও এই শাশ্বত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। এখানে গোলামেরও স্থান নেই; এক উপজাতি আরেক উপজাতিকে পরাধীনতার নাগপাশেও বাঁধতে জানে না। ১৬৫১ সনে ইরোকোয়ারা যখন ইরি ও আরো কয়েকটা "নিরপেক্ষ উপজাতিকে" পরাজিত করে তখন তারা বিজিতদের সম-অধিকারের ভিত্তিতেই নিজেদের রাষ্ট্র-সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। পরাজিত উপজাতিরা যখন আপত্তি জানায় একমাত্র তখনই তাদের মুলুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ধরণের সমাজ যে কিরূপ নর-নারী সৃষ্টি করতে সক্ষম তা শ্বেতাঙ্গদের কাছেই জানতে পারা গিয়েছে। যে-সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সরলপ্রাণ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মিশবার অবকাশ পেয়েছে তারাই ইণ্ডিয়ানদের আত্ম-মর্যাদাবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অতুলনীয় সাহস দেখে পরম বিস্ময় বোধ করেছে।

সম্প্রতি আফ্রিকায় আমরা এই ধরণের সাহসের পরিচয় পেয়েছি। জুলু কাফির ও নিউবিয়ানদের মধ্যে গোষ্ঠী-প্রথা এখনো লোপ পায়নি। মাস দুয়েক আগে * নিউবিয়ানদের মত, বছর কয়েক আগে জুলু কাফিরদের কাছে আমরা

* জুলুদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয় ১৮৭৯ সনে ও নিউবিয়ানদের সঙ্গে ১৮৮৩ সনে।

এমন সাহসের পরিচয় পেয়েছি, যা ইউরোপীয়ান বাহিনীর কাছেও সম্ভব নয়। নিকট পাল্লায় লড়াই করতে বন্দুকধারী ইংরেজ পদাতিকদের সমকক্ষ কেউই না। এ হেন জবরদস্ত পল্টনের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের মধ্যে কেবলমাত্র সড়কী ও বর্শা প্রহরণ নিয়ে এরা সঙ্গীনের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। অস্ত্র-শস্ত্রের ঘোরতর ব্যবধান; এরা সামরিক সার্ভিস ও ড্রিলের ধার ধারেনা। তবুও এরা ইংরেজ সিপাহীদের ব্যূহভাগে ঘোরতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এমনকি, কয়েকবার ব্যূহ ভেদ পর্যন্ত করে। ইংরেজেরা বলে যে, এক এক কাফ্রি ২৪ ঘন্টায় ঘোড়ার চেয়েও বেশি চলে। এতেই বোঝা যায়, এদের সহনশক্তি ও ক্ষমতা কত বেশি। জনৈক ইংরেজ চিত্রশিল্পী বলেন, কাফ্রির সবচেয়ে ছোট মাংসপেশীগুলোও চাবুকের ছিলার মত শক্ত ও দৃঢ়।

শ্রেণী-বিভাগের পূর্বে মানুষ ও সমাজের অবস্থা এই রকমই ছিল। তাদের সঙ্গে যদি আমরা অম্মকার অধিকাংশ সভ্য মানুষের তুলনা করতে বসি, তা'হলে প্রাচীন যুগের গোষ্ঠী সদস্যের সঙ্গে বর্তমান যুগের শ্রমজীবী ও ছোটখাটো চাষীদের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্যই না দেখতে পাওয়া যায়।

এই হলো একদিক্‌কার কাহিনী। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পতন যে সুনিশ্চিত তাতে আমাদের বিস্মিত হ'লে চলবে না। ইহা কোনদিনই উপজাতির গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। বিভিন্ন উপজাতি-ঘটিত রাষ্ট্র-সম্মেলন গঠন প্রচেষ্টার ভেতরে যে এর পতনের সূচনা দেখা যায়, শীঘ্রই তা বুঝতে পারা যাবে, এমনকি বোঝাও যায়, ইরোকোয়াদের অন্য উপজাতিগুলোকে অধীনস্থ করার চেষ্টার ভেতরে। উপজাতির বাইরে হ'লে আইনেরও বাইরে। নির্দিষ্ট কোন সন্ধি-চুক্তির ব্যবস্থা না থাক্‌লে উপজাতির সঙ্গে উপজাতির লড়াই চল্‌তো। যুদ্ধ চল্‌তো এমন নিষ্ঠুরভাবে, পশুদের মধ্যেও যা কল্পনা করা যায় না। আত্ম-স্বার্থের খাতিরে অবশ্য পরে নৃশংসতার ভাবটা কমে আসে। পূর্ণ-বিকাশ-প্রাপ্ত গোষ্ঠীজীবন যে কিরূপ বস্তু, আমেরিকায় আমরা তা দেখতে পেয়েছি। এই জীবনের আওতায় ধন-সম্পদ-উৎপাদন থাকে নিতান্ত নীচের কোঠায়। সেইজন্য বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক ছড়িয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। কাজে কাজেই, মানুষ ছিল পুরাপুরি প্রকৃতির গোলাম। প্রকৃতিকে সে রহস্যময়ী দেবী বলেই মনে করতো। তার নিতান্ত ছেলে-মানুষী ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে এই ভাব বেশ পরিস্ফুট। মানুষ ছিল তার উপজাতি দিয়ে ঘেরা। বাইরের উপজাতি ও নিজের সঙ্গে যত

সম্পর্ক এই সীমানার মধ্যেই ছিল আবদ্ধ। উপজাতি, গোষ্ঠী ও ঐগুলোর সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ছিল পবিত্র। এই পবিত্রতা নষ্ট করার উপায় ছিল না। ব্যক্তির চোখে, এই সমস্ত প্রকৃতি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর শক্তিরূপে গণ্য হ'তো। মানুষ দেহ-মনে-প্রাণে এই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেই চলতো। এই যুগের মানুষ আমাদের কাছে যত খাসাই মনে হোক-না-কেন, এদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। মার্কস্ এইজন্যেই বলেন, আদিম সমাজের সঙ্গে এদের নাড়ীটা যেন এখনো সংযুক্ত রয়েছে। এই সমস্ত আদিম জন-সংঘের শক্তি বিধ্বস্ত করার প্রয়োজন ছিল, যথাসময়ে তাহা লোপও পেয়েছে। কিন্তু এমন কতকগুলি শক্তি এই শক্তিকে চুরমার করে, যে-গুলো গোড়া থেকেই আমাদের কাছে অবনতির পরিচায়ক বলে মনে হয়। প্রাচীন গোষ্ঠী সমাজের নৈতিক মহত্ব থেকে মানুষ বহু নীচে পতিত হয়। হীনতম স্বার্থ—জঘন্য লোভ, পৈশাচিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, হীন অর্থের লালসা ও স্বার্থপরের মত যৌথ ধন-সম্পদ লুণ্ঠন—নতুন সভ্য শ্রেণীগত সমাজের আগমনী সূচনা করে। চুরি-জুয়াচুরি, বলাৎকার, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা—এই সমস্ত জঘন্যতম উপায় অবলম্বন ক'রে প্রাচীন শ্রেণীহীন গোষ্ঠী-সমাজ ধ্বংস করা হয়। কিন্তু এর বদলে আড়াই হাজার ব'ছর ধরে যে নতুন সমাজ চালু হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুর উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে মুষ্টিমেয় সংখ্যা-লঘুরাই সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে এই বৈষম্য আরো বেশি পরিস্ফুট।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীক গোষ্ঠী-প্রথা

মান্ধাতার আমল থেকে গ্রীক্ ও পেলাসজিয়ান এবং একই ধরণের উপজাতিসম্ভূত অন্যান্য জাতিদেরও আমেরিকানদের মতই একই ধরণের সামাজিক গঠনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যেও গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী, উপজাতি এবং উপজাতি-সম্মেলনের অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে অনেক সময় ফ্রেত্রীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ ডোরীয় সমাজের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে হয়ত উপজাতি-সম্মেলনও গড়ে উঠার অবসর পায় নি। কিন্তু সর্বত্র গোষ্ঠী সামাজিক একক-কেন্দ্ররূপে বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসে যখন গ্রীকদের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, তখন তারা ছিল সভ্যতার প্রথম স্তরে; কাজেই, গ্রীক ও পূর্ব-বর্ণিত আমেরিকান উপজাতিদের মধ্যে গোটা দুই যুগের ক্রমোন্নতির ব্যবধান ছিল। কাজেই পৌরাণিক যুগের গ্রীকরা ইরোকোয়াদের চেয়ে ঢের বেশি উন্নত ছিল। গ্রীকদের গোষ্ঠীপ্রথা ইরোকোয়াদের সেকেলে গোষ্ঠী প্রথার মত ছিল না মোটেই; দলগত বিয়ের ছাপও ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে থাক্‌বে। জননী-বিধির স্থানে ঠাঁই পেয়েছিল জনক-বিধি; ফলে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত সম্পত্তি গোষ্ঠী-কাঠামোয় প্রথম ভাঙনের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম ভাঙন থেকে কালক্রমে দ্বিতীয় ভাঙনেরও সৃষ্টি হয়। পুরুষ-বিধি প্রচলিত হওয়ার পর ধনী উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তি তার স্বামীর হাতে অর্থাৎ তার বিয়ের পর অন্য গোষ্ঠীতে চলে যায়; কাজেই, গোষ্ঠীবিধির ভিত্তিমূলটাই লোপাট করা হয়। এরূপক্ষেত্রে কনের সম্পত্তি গোষ্ঠীর বেষ্টনীর ভেতর আট্‌কিয়ে রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে তাকে স্ব-গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে করবার জন্য অনুমতিমাত্র নয়, হুকুম পর্যন্ত জারি করা হয়।

গ্রোট-লিখিত "গ্রীসের ইতিহাস" পাঠে জানা যায় যে, গ্রীসদেশের, বিশেষভাবে, এথেনীয় সমাজের গোষ্ঠীজীবন নিম্নলিখিত আইন-কানুনগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল:—

(১) সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসবসমূহ; নির্দিষ্ট কোন দেবতার সম্মানের জন্যে পৌরহিত্যের একচেটে বিশেষ অধিকার। এই দেবতা গোষ্ঠীপতিরূপে গণ্য। এই হিসেবে দেবতা ছিল বিশেষ পদবীযুক্ত।

(২) সর্বজনীন গোরস্থান (ডেমোস্থেনিসের "ইউবুলিদেস্" দ্রষ্টব্য)।

(৩) পারস্পরিক উত্তরাধিকার।

(৪) বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সাহায্য, সংরক্ষণ ও সমর্থনের পারস্পরিক বাধ্য-বাধকতা।

(৫) অনাথ ও উত্তরাধিকারিণী মেয়েদের সম্পত্তি রক্ষা ও কতকগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ভেতরেই বিয়ে করার পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার।

(৬) অন্ততপক্ষে কতকগুলো ক্ষেত্রে যুক্ত যৌথ সম্পত্তি ভোগদখল। এবং তার নিজের আর্কন (ম্যাজিস্ট্রেট) এবং ধনাধ্যক্ষ। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ফেত্রী ছিল শিথিল ধরণের প্রতিষ্ঠান। এখানেও গোষ্ঠীর মত কতকগুলো পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার ছিল। বিশেষত ফেত্রীর কোন সদস্যের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং কতকগুলো ধর্মীয় পালপার্বণ সমবেতভাবে অনুষ্ঠানের সময় এই সমস্ত দায়িত্ব ও অধিকার বিশেষভাবে প্রতিপালিত হ'তো; এক-একটা উপজাতির ফ্রেত্রীগুলোও বছরের মধ্যে কয়েকটা নির্দিষ্ট তিথিতে একত্র মিলে ধর্ম-উৎসবাদি পালন করতো। এই সময় অভিজাতকুল (ইউপাত্রিএদেস্) থেকে নির্বাচিত উপজাতি-নেতা (ফিলোবাসিলিউস্) কর্তৃত্ব করত।

গ্রোট্ এই পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন। মার্ক্স এই সঙ্গে নিম্নরূপ কতকগুলো কথা জুড়ে দেন: "গ্রীক গোষ্ঠী-প্রথায় অসভ্য (যথা ইরোকোয়াদের) অবস্থার পরিচয় অভ্রান্ত অবস্থাতেই দেখতে পাওয়া যায়।" আরো কিছুদূর গবেষণা চালালে মার্ক্সের মতবাদ আরো বেশি সত্য বলে প্রতীতি জন্মাবে।

কারণ, গ্রীক গোষ্ঠী-প্রথায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোও বর্তমান ছিল:—

(৭) জনক-বিধি অনুসারে বংশ-পরিচয়।

(৮) কেবলমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছাড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। রীতিমত অর্ডিনান্স জারি করে এই ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই বিয়ের প্রাচীন প্রথা যে গ্রীক-সমাজেও প্রচলিত ছিল তাহা বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিয়ের পর নারী তার গোষ্ঠীর ধর্মীয় রীতিনীতি ত্যাগ করে সটান তার স্বামীর গোষ্ঠীর ধর্মকর্ম গ্রহণ করে, তার স্বামীর ফ্রেত্রীরও অন্তর্ভুক্ত হয়। বিয়ের সনাতন প্রথা অনুসারেই এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এই প্রথা এবং "দিকায়ার্কাস্" গ্রন্থের বিখ্যাত অনুচ্ছেদ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-সাদী করাই ছিল দস্তুর। বেকার তাঁর "চারিক্লস্" গ্রন্থে প্রত্যক্ষভাবেই অনুমান করে নিয়েছেন যে, স্বগোষ্ঠীর ভেতরে কাউকেই বিয়ে করতে দেওয়া হ'তো না।

(৯) বাইরের লোককে গোষ্ঠীর ভেতরে পোষ্যরূপে গ্রহণ। পরিবারই পোষ্য গ্রহণ করতো। তবে এজন্য সর্বজনীন উৎসব-আড়ম্বরের ব্যবস্থা করতে হ'তো। পোষ্য গ্রহণ কিন্তু কালে-ভদ্রে ঘটতো।

(১০) সর্দার-নির্বাচন ও তাদেরকে পদচ্যুত করার অধিকার। এই সর্দারকে বলা হ'তো আর্কণ। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই এক-একজন আর্কণ থাকতো। কিন্তু এই আর্কণ পদ কোন সময়েই কোন বিশেষ পরিবারের বংশগত হতে দেখা যায় নি। বর্বর যুগের শেষ স্তর ছাড়া খাঁটি বংশগত উত্তরাধিকার কায়েম হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ, যেখানে ধনী নির্ধন সকলেরই গোষ্ঠীর ভেতরে সম্পূর্ণ সমান অধিকার ছিল তার সঙ্গে ওটার কোনই সামঞ্জস্য নেই।

কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গ্রোট্ নহেন, নীয়েবুর ও মোমসেন প্রমুখ পূর্ববর্তী প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিকগণ সকলেই গোষ্ঠী সমস্যা সমাধানে অক্ষম হয়েছেন। গোষ্ঠী-প্রথার কতকগুলো লক্ষণ ও বিশেষত্ব সম্পর্কে নির্ভুল পরিচয় প্রদান করলেও ওঁরা গোষ্ঠীকে সকল সময়েই কতকগুলো **পরিবারের সমবায়** বলে মনে করেন। কাজেই, তাঁরা গোষ্ঠীর স্বরূপ ও উৎপত্তি সম্পর্কে আদৌ নির্ভুল ধারণা করতে পারেন নি। প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রথায় পরিবার কোন কালেই একক সামাজিক কেন্দ্ররূপে গণ্য হয় নি। পরিবারকে এইভাবে ধারণা করাও চলেনা। কারণ, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই দুটো বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক। পুরাপুরি-ভাবে গোষ্ঠী ফ্রেত্রীর অন্তর্ভুক্ত; ফ্রেত্রীও তেমনি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরিবারের অর্ধেকের মালিক পুরুষের গোষ্ঠী; আর বাকি আধখানার মালিক নারীর গোষ্ঠী। রাষ্ট্র ও সরকারি আইন-কানুনে পরিবারকে স্বীকার করে না। বর্তমানে মাত্র দেওয়ানী আইন-কানুনে এর অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তাহ'লে হবে কি? আমাদের ইতিহাস অসঙ্গত ধ্যান-ধারণার উপরেই গজিয়ে উঠেছে। একনিষ্ঠ-বিবাহমূলক পরিবার সভ্যতার প্রায় সম-সাময়িক হওয়া সত্বেও ঐতিহাসিকগণ একনিষ্ঠ-বিবাহ-মূলক পরিবারকে মূল একক কেন্দ্ররূপে ধরে নিয়ে তাকে অবলম্বন করেই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে—এই রকম প্রচার করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে এই মতবাদ অকাট্যরূপেই প্রচারিত হ'য়ে আসছে।

মার্ক্স্ এর সঙ্গে তাঁর নিজের অভিমত জুড়ে দিয়ে বলেন, "গ্রোট মহাশয়ের এটাও লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, পুরাতত্ত্বের ভেতর দিয়ে গ্রীকরা তাদের গোষ্ঠীগুলোর সন্ধান পেলেও গোষ্ঠীগুলো পুরাতত্ত্বের চেয়েও পুরাতন। গোষ্ঠী-গুলোই দেবদেবীদের কাহিনীযুক্ত পুরাতত্ত্বসমূহ গড়ে তুলে।"

খ্যাতনামা ও নির্ভর-যোগ্য সাক্ষী হিসাবে মর্গ্যান গ্রোট্ সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃত করাই শ্রেয়: মনে করেছেন। গ্রোট্ আরো বলেন যে, এথেনীয় সমাজের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী আপন আপন কল্পিত পূর্বপুরুষের নাম গ্রহণ করে। সোলনের পূর্ববর্তী যুগে, এমন কি, তার পরেও উইলের ব্যবস্থা না থাক্‌লে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হ'নে যেতো। কোন লোক খুন হ'লে, প্রথমত, তার আত্মীয়-স্বজন, তারপর গোষ্ঠীর সমস্ত লোক এবং শেষপর্যন্ত ফ্রেত্রীর লোকজন সকলেই বিচারালয়ে হাজির হয়ে আসামীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতো: "গোষ্ঠী ও ফ্রেত্রীর ভিত্তির উপরেই প্রাচীন এথেনীয় সমাজের অধিকাংশ আইন-কানুন গড়ে উঠে।"

একই পূর্বপুরুষ থেকে গোষ্ঠীর উৎপত্তি সমঝাতে গিয়ে "ইস্কুলে পড়া নীতিবাগীশেরা" (মার্ক্‌স্) গলদ-ঘর্ম হয়ে পড়েছেন। আদি পুরুষকে নিছক কাল্পনিকরূপে ঘোষণা করে ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন কতকগুলো পরিবার যে কিভাবে গোষ্ঠীরূপে গড়ে উঠ্‌লো তা বুঝাতে গিয়ে তাঁরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু তাহলে হবে কি? গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্বরূপ যেন-তেন-প্রকারেণ বুঝাতেই হবে। কিন্তু এই অসম্ভব সাধন করতে গিয়ে তাঁরা কেবলমাত্র কথার তুবড়ীই ছুটিয়েছেন। "বংশ-লতিকা গাঁজাখুরি গল্প, কিন্তু গোষ্ঠী বাস্তব জিনিস।" শতচেষ্টা করেও তাঁরা এর বেশি-কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। গ্রোট শেষপর্যন্ত বলেন, (প্রক্ষিপ্ত অংশগুলো মার্ক্সের) "আদিপুরুষ থেকে গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বড় বেশিকিছু শুনা যায় না। কারণ কেবলমাত্র বিশিষ্ট ও সম্মানীয় কোন কোন ব্যাপারে কালেভদ্রে এ-সম্বন্ধে সাধারণ্যে আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু বড় বড় গোষ্ঠীগুলোর মত, **ছোট খাটো** গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও [ছোটখাটো গোষ্ঠীর বেলাতেও? এ-যে তাজ্জব ব্যাপার, গ্রোট মহাশয়!] সর্বজনীন ক্রিয়াকাণ্ডের রেওয়াজ ছিল [বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, গ্রোট মহাশয়!] এবং অতি-মানব আদি পুরুষ ও বংশলতিকার অস্তিত্ব দেখা যায়: সমস্ত গোষ্ঠীরই আদর্শ ও বুনিয়াদ একই ধরণের [গ্রোট্ মহাশয়! গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে ইহা নেহাৎ **আদর্শমাত্র** নয়। গোষ্ঠীর পক্ষে ইহাই হচ্ছে ঐহিক ও বাস্তব]"

এ-সম্বন্ধে মর্গ্যান্ যে উত্তর দেন মার্ক্‌স্ তার সারমর্ম নিম্নরূপ-ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন: 'মান্ধাতার আমলের গোষ্ঠী-প্রথা অনুযায়ী শোণিত-সম্পর্কের রীতি-নীতি-গুলো অন্যান্য জাতীয়দের মত গ্রীকদের মধ্যেও একদা প্রচলিত ছিল। কাজেই,

গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধ্যানধারণা গ্রীকদের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। নিতান্ত প্রয়োজনবশে শৈশব অবস্থা থেকেই সকলে তা শিখে রাখতো। পরে যখন একনিষ্ঠ-বিবাহমূলক পরিবার দেখা দেয়, তখন ইহা সকলেই ভুলে যায়। গোষ্ঠীর নাম থেকে পরে বংশ-লতিকার সৃষ্টি হয়। এর তুলনায় একনিষ্ঠ-বিবাহমূলক পরিবারের বংশ-তালিকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকররূপে গণ্য হয়। এই নাম থেকে বেশ বোঝা যায়, যাদের মধ্যে এর প্রচলন তারা নিশ্চয়ই এক বংশসম্ভূত। কিন্তু গোষ্ঠীর বংশধারা এতদূর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত যে, লোকজনের পক্ষে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় বা তা প্রমাণ করা একরূপ অসম্ভবই বিবেচিত হয়। মাত্র বিশেষ বিশেষ কতকগুলো ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাচীন আদিপুরুষদের বংশধরদের পক্ষে নিজেদের সম্পর্ক-নির্ধারণ সম্ভব হতে পারে। দত্তক গ্রহণের দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে বংশ নামই এক আদিপুরুষদের প্রমাণ, চরম প্রমাণই বটে। এরূপ অবস্থায় গ্রোট্ বা নীবুরের মত গোষ্ঠীর ভেতরকার সম্পর্কগুলো অস্বীকার করা বা ঐগুলো সম্পূর্ণরূপে আজগুবি বা কল্পনা-প্রসূত মনে করা 'আদর্শ' বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার-গৃহের গ্রন্থকীটদের পক্ষেই শোভা পায়। একনিষ্ঠ-বিবাহের আমলে গোষ্ঠীগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা দূর অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় আর এইগুলোর সাক্ষাৎ বা পরিচয় পুরাতত্ত্বের কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই, পণ্ডিত-মূর্খরা সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, কাল্পনিক বংশলতিকা থেকেই বাস্তব গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে।"

আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত প্রথার মতই ফ্রেত্রী ছিল দুহিতৃ-স্থানীয় কয়েকটি গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত জননী-গোষ্ঠী; এই জননী-গোষ্ঠী একই-আদি পুরুষের নিশানা বলে দিয়ে দুহিতৃ-স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্য-সংবদ্ধও করতো। গ্রোটের মতে "হেকেতাউসে"র ফ্রেত্রীর সম-সাময়িক গোষ্ঠীগুলো ষোল পুরুষ উর্ধ্বে অবস্থিত কোন আদি দেবতার বংশধর।" কাজেই এই ফ্রেত্রীর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের ভ্রাতৃস্থানীয় ছিল। কবি হোমারও এক বিখ্যাত অনুচ্ছেদে ফ্রেত্রীকে সামরিক কেন্দ্ররূপে উল্লেখ করেছিলেন। এই অনুচ্ছেদে নেস্টর আগামেম্নকে উপদেশ দেন: "ফ্রেত্রী ও উপজাতি হিসেবে সৈন্য সমাবেশ কর। এতে ফ্রেত্রী ফ্রেত্রীকে আর উপজাতি উপজাতিকে সাহায্য করতে পারবে।"

ফ্রেত্রীর কোন লোক বিদেশীর হাতে মারা পড়লে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও ফ্রেত্রীর ছিল। এতেই বোঝা যায়, অপেক্ষাকৃত আদিযুগে ফ্রেত্রীর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের কর্তব্যও ছিল। তাছাড়া ফ্রেত্রীর সাধারণ মন্দির

ও পাল-পার্বণেরও ব্যবস্থা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে, প্রাচীন আর্যজাতিসুলভ প্রকৃতি-পূজা থেকে গ্রীক পুরাতত্ত্ব ফ্রেত্রী ও গোষ্ঠীগুলোর কল্যাণে এবং এইগুলোর আওতাতেই গড়ে উঠে। ফ্রেত্রীরও একজন অধ্যক্ষ সর্দার থাক্‌তো। একে বলা হ'তো "ফ্রেত্রিয়ার্কোস্"। দ্য কুলাঁজের মতে, প্রত্যেক ফ্রেত্রীর পরিষদও ছিল। পরিষদ রীতিমতো বিধি-নিষেধ জারি করতো এবং বিচারালয় ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করতো। পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রের আমলে গোষ্ঠী উপেক্ষিত হ'লেও ফ্রেত্রীর হাতে কতকগুলো সরকারী কাজ-কর্মের ভার অর্পিত ছিল।

পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ফ্রেত্রী নিয়ে এক-একটা উপজাতি গড়ে উঠ্‌তো। এট্টিকা প্রদেশের চারটে উপজাতি, প্রত্যেক উপজাতি তিন-তিনটে ফ্রেত্রী আর প্রত্যেক ফ্রেত্রী ত্রিশটা হিসেবে গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই ধরা বাঁধা গঠন-প্রণালী দেখে মনে হয়, স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হস্তক্ষেপ ক'রে এক নতুন শ্রেণী-বিভাগের পত্তন করা হয়। কিন্তু কখন এবং কি জন্য এই হস্তক্ষেপ করা হয়, গ্রীক ইতিহাস সে-সম্বন্ধে নীরব। গ্রীকদের নিজেদের স্মৃতির দৌড়ও বড়জোর "বীরযুগ" পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে।

গ্রীকরা অপেক্ষাকৃত অপরিসর এলাকায় ঘেঁষাঘেঁষিভাবে বাস করতো। এইজন্য আমেরিকার জঙ্গল-সমাকীর্ণ ভূভাগে কথিত ভাষাগুলোর মধ্যে যেভাবে পার্থক্য ঘটবার অবসর পায় গ্রীক মুলুকে তেমন ঘটবার অবসর পায় নি। তাসত্ত্বেও দেখা যায় গ্রীস দেশেও মাত্র একই মূলভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপজাতিগুলা বৃহত্তর উপজাতি সমবায়ে মিলিত হয়। ছোট্ট এট্টিকা প্রদেশেরও নিজস্ব ভাষা ছিল। পরে এই ভাষাই গ্রীক গদ্য-সাহিত্যের চলতি ভাষায় পরিণত হয়।

হোমারের কাব্য-সাহিত্যে আমরা গ্রীক উপজাতিগুলোকে ছোট ছোট জাতিতে সংঘবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। জাতিগুলোর মধ্যে গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই ছিল। এর মধ্যেই গ্রীকরা দেওয়াল-ঘেরা নগরে বাস করতে আরম্ভ করে। পশুযূথের বংশবৃদ্ধি, কৃষির প্রসার ও হাতে-তৈরি শিল্প-দ্রব্যের রেওয়াজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বেড়ে চলে। জনগণের মধ্যে ধন-সম্পদের পার্থক্যও বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠে। কাজেই, আদিম যুগের স্বাভাবিক গণতন্ত্রের মধ্যে অভিজাতসম্প্রদায় মাথা তুলতে আরম্ভ করে। সবচেয়ে ভাল জমি দখল করা, বিশেষত, লুট-তরাজের

গোত্তে ছোট ছোট জাতিগুলোর মধ্যে দিনরাত লড়াই লেগেই থাকে। যুদ্ধ-বন্দীদের গোলামে পরিণত করার রেওয়াজও তখন গ্রীক-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই সমস্ত উপজাতি ও ছোট ছোট জাতিগুলোর শাসনপ্রণালী নিম্ন ধরণের ছিল :—

(১) স্থায়ী শাসন-ক্ষমতা কাউন্সিলের (বুলে) হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রথমত, খুব সম্ভব গোষ্ঠীপতিদের নিয়ে ইহা গঠিত হ'লেও পরে যখন গোষ্ঠীর সংখ্যা খুব বেড়ে যায় তখন মনোনয়ন-প্রথা কায়েম করা হয়। ফলে, অভিজাতরা নিজেদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আরো বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ লাভ করে। দিয়োনিসুয়ুস্ বীরযুগের কাউন্সিলকে অভিজাতদের (ক্রাতিস্টয়) দ্বারা গঠিত বলে বর্ণনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একমাত্র কাউন্সিলই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল। এস্‌খিলুস্ নাটকে দেখা যায়, থিবস্ দেশের কাউন্সিলে এতেওক্‌লসের মৃতদেহ সম্মানের সঙ্গে গোর দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু পলিনিসেসের শব কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রের পত্তন হওয়ার পর কাউন্সিল সিনেট সভায় পরিণত হয়।

(২) গণ-পরিষদ (আগোরা) :—ইরোকোয়াদের মধ্যে আমরা দেখেছি, কাউন্সিল বা পরিষদের অধিবেশনের সময় নর-নারী সকলেই তার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। এরা শৃঙ্খলার সঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রে পরিষদের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে। হোমার যুগের গ্রীকদের মধ্যেও এইভাবে দাঁড়ানোর প্রথা গড়ে উঠে। প্রাচীন জার্মান ভাষায় তাকে বলা হয় 'উম্‌স্টাণ্ড্'। প্রাচীন জার্মান সমাজের দস্তুরও ছিল এই ধরণের। জরুরী বিষয়গুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাউন্সিলই আগোরার অধিবেশন আহ্বান করে। প্রত্যেক পুরুষেরই অধিবেশনে কথা বলার অধিকার ছিল। জোরে চেঁচিয়ে বা হাতের ইশারায় মতামত জ্ঞাপন করা হ'তো। যে-কোন বিষয়ে আগোরার সিদ্ধান্তই চরমরূপে গণ্য হ'তো। কারণ শোম্যান তাঁর 'গ্রীকের পুরাবৃত্ত' নামক গ্রন্থে বলেন, "যদি কোন কাজে সমস্ত লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন হ'তো তা'হলে তাদেরকে যে কিভাবে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করা হ'তো, হোমার তার কোন দিশেই দেখান নি।" বাস্তবিক পক্ষে তখনকার দিনে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষই ছিল যোদ্ধা। জনগণ থেকে তখন পৃথক এমন কোন রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়নি, যে শক্তি জনগণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। আদিম গণতন্ত্র তখনো পূর্ণমাত্রায় শক্তিমান। কাউন্সিল ও বাসিলিউসের শক্তি ও মর্যাদা

সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হ'লে এই বাস্তব তথ্যটা মনের মধ্যে আনতে হবে।

(৩) সৈন্যবাহিনীর নায়ক (বাসিলিউস্)।—এ-সম্বন্ধে মার্ক্স্ নিম্নরূপ সমালোচনা করেন: "ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের অধিকাংশ রাজ-রাজড়াদের আজন্ম দাস। এঁরা বাসিলিউসকে আধুনিক যুগের সার্বভৌম-ক্ষমতাযুক্ত রাজা মনে করেছেন। ইয়াংকী গণতন্ত্রী (রিপাবলিকান) মর্গ্যান এই মতবাদের প্রতিবাদ করেন। ঠাট্টা হ'লেও মিষ্টভাষী গ্লাডস্টোন ও তাঁর "যুভেন্তুস্ মুন্দি" গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি খাঁটি সত্য কথাই বলেন। মিঃ মর্গ্যান বলেন, "মিঃ গ্লাডস্টোন্ পাঠকদের কাছে বীরযুগের গ্রীক সর্দারদের রাজ-রাজড়া ও ভদ্রলোক বলে বর্ণনা করলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্রের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত প্রথা বা আইনের সংজ্ঞা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে না হলেও পর্যাপ্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে।" বাস্তবিকপক্ষে গ্লাড্স্টোন নিজে ভালভাবেই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে না হ'লেও পর্যাপ্তভাবে নির্ধারিত এই আইনটা না থাকলেই ভাল হ'তো।"

ইরোকোয়া ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সর্দারদের পদ যে কতটা বংশ-পরম্পরাগত ছিল তা আমরা অনেক আগেই দেখেছি। সাধারণত, গোষ্ঠীর আবেষ্টনীর মধ্যে এই সমস্ত পদই ছিল নির্বাচন-সম্মত। এই হিসেবে এই সমস্ত পদ সম্পর্কে গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক অধিকার ছিল বলা যেতে পারে। কালক্রমে এই সমস্ত শূন্য পদ পূরণের সময় গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ভাই অথবা ভাগিনেয়ের দাবি সকলের আগে গণ্য হয়। তবে কোন কারণ বশত অযোগ্য বিবেচিত হলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াতো। জনকবিধি-শাসিত গ্রীকদের ভেতরে বাসিলিউস্ পদ সাধারণত পুত্র বা পুত্রদের মধ্যে একজনকে দেওয়া হতো। এর অর্থ এই যে, গণভোটের দ্বারা পুত্রের পক্ষে এইরূপ অধিকারের দাবিটা স্বীকৃত হয়। বংশানুক্রমিক অধিকার হিসেবে পুত্র যে সোজা মৃত জনকের পরিবর্তে বাসিলিউস পদ দখল করে তার কোন প্রমাণই পাওয়া যায়না। এখানে ইরো-কোয়া ও গ্রীকদের মধ্যে গোষ্ঠীর আবেষ্টনীর ভেতর নির্দিষ্ট কতকগুলো অভিজাত পরিবারের সূত্রপাত আর গ্রীকদের মধ্যে ভাবী যুগের বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব পদ বা রাজতন্ত্রের প্রথম সূচনা দেখা যায় এইমাত্র। মোটের উপর, এইরূপ সম্ভাবনাই দেখা যায় যে, গ্রীকদের মধ্যে জনসাধারণই বাসিলিউস্ নির্বাচন করতো অথবা অন্ততপক্ষে, তাদের শাসনযন্ত্র কাউন্সিল বা আগোরার সমর্থন নতুন বাসিলিউসের

পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল। রোমানদের মধ্যে 'রাজা' অর্থাৎ রেক্সকেও এইভাবে নির্বাচিত হতে হ'তো।

ইলিয়াদ্ গ্রন্থে জন-শাসক আগামেম্ননকে গ্রীকদের সর্বোচ্চ রাজারূপে মনে করা যায় না। এক অবরুদ্ধ শহরের সাম্‌নে ফেডারেল আর্মীর সর্বোচ্চ সেনাপতিরূপেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটে। গ্রীকদের মধ্যে যখন দলাদলি সৃষ্টি হয় তখন ওদিসিউস তাঁর এই গুণ সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষায় বলেন: বহু লোকের সেনাপতিত্ব ভাল জিনিস নয়; একজন সেনাপতিত্বের ভার গ্রহণ করুক, ইত্যাদি। (এর সঙ্গে রাজ-মহিমাবিষয়ক অংশটা পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।) "ওদিসিউস্ এখানে গবর্ণমেণ্টের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেননি; রণক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সেনাপতির আদেশ মেনে চলার জন্যে তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন। ট্রয় নগরীর সম্মুখে সমুপস্থিত গ্রীকদের মধ্যে আগোরার কার্যকলাপ পুরাপুরি গণতান্ত্রিকই রয়ে গিয়েছে। আখিলেস যখন লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টনের কাহিনী বর্ণনা করেন, তখন তিনি আগামেম্নন বা অপর কোন বাসিলিউসের হাতে ভার অর্পণ না করে আখায়েনের পুত্রদের অর্থাৎ জনসাধারণের হাতেই বাঁটোয়ারার ভার দেন। "জিউস-সম্ভূত" বা জিউস-প্রতিপালিত ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যেও কোন কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ প্রত্যেক গোষ্ঠীই কোন-না-কোন দেব-বংশ-সম্ভূত। উপজাতির নেতা কোন "উচ্চ দেবতার" বংশজাত এই মাত্র যা ব্যতিক্রম। এখানে নেতাকে জিউসবংশসম্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়। এমন কি, ব্যক্তিগতস্বাধীনতা-বর্জিত মানুষ, যথা শূকর-পালক ইউমিউস্ এবং আরো অনেকেও দেবতার বংশধর (দিওই ও থিওই)। ইলিয়াদের তুলনায় নবীনতর "ওদিসি" গ্রন্থেও একই ধরণের মতবাদ প্রচলিত। ওদিসি গ্রন্থেও দূত মুলিয়ুস ও অন্ধগায়ক দেমোদোকাসকেও "বীর" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রীক লেখকগণ হোমার-বর্ণিত তথাকথিত রাজপদকে বাসিলিয়ারূপে উল্লেখ করেছেন (কারণ, সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্বই রাজপদের প্রধান বিশেষত্ব)। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, একই সময়ে কার্যরত কাউন্সিল ও পরিষদ সহ বাসিলিয়া কেবলমাত্র সামরিক গণতন্ত্রের পরিচয়ই প্রকাশ করে।" (মার্কস্)

সামরিক দায়িত্ব ছাড়া বাসিলিউস্ পুরোহিত ও বিচারকের কাজও করতো। তবে বিচারের কাজ যে কিভাবে চালাত তার কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। উপজাতি বা উপজাতি-সঙ্ঘের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিরূপে বাসিলিউস পৌরহিত্যেরও অধিকারী ছিল। কিন্তু কোন স্থানে তার শাসন-ক্ষমতার

পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি পদাধিকার বলে কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, এই মাত্র বলা যায়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বাসিলিউস শব্দের রাজা বা 'কিং' শব্দ দিয়ে তর্জমা করা ঠিকই হয়েছে। কারণ, 'কিং' (কুনিং) শব্দ 'কুনি' বা 'কুন্নে' শব্দ থেকে উৎপন্ন। শেষোক্ত দুটো শব্দেরই অর্থ গোষ্ঠীপতি। কিন্তু বর্তমান যুগে 'রাজা' শব্দ বলতে আমরা যা বুঝি বাসিলিউস শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করলে মহাভ্রমে পতিত হতে হবে। থুসিডাইডস্ প্রাচীন যুগের বাসিলিয়াকে 'পাত্রিকে' অর্থাৎ গোষ্ঠী-সম্ভূত বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, বাসিলিয়ার এক্তিয়ার ও অধিকার রীতিমত সীমাবদ্ধ ছিল। এরিস্টটল্ বীরযুগের বাসিলিয়াকে স্বাধীন জনগণের উপর নেতৃত্বরূপে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে বাসিলিউস ছিল লড়াইয়ের নায়ক, বিচারক ও সর্বোচ্চ পুরোহিত; সে পরবর্তী-যুগ-সম্মত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী ছিল না মোটেই। (১)

কাজেই দেখা যায় যে, বীরযুগের গ্রীক জাতীয় কাঠামোর ভেতরে প্রাচীন গোষ্ঠী-বিন্যাস পুরোপুরি জীবন্ত অবস্থাতেই রয়েছে। কিন্তু এর ভেতরে গোষ্ঠী-প্রথার বিলুপ্ত হওয়ার সূচনাও পরিস্ফুট হয়ে উঠে: জনক-বিধি ও সম্পত্তির উপর সন্তান-সন্ততির অধিকার বর্তাবার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যে ধনসঞ্চয় করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। ফলে, পরিবার গোষ্ঠীর বিরোধী প্রতিষ্ঠানরূপে মাথা তুলতে আরম্ভ করে। বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ও রাজতন্ত্রের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ধন-সম্পদের অসাম্য গোষ্ঠীর গঠনতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করতে আরম্ভ করে। প্রথমত যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হ'তো; পরে উপজাতি,

---

(১) গ্রীক বাসিলিউস তথা আজতেক সামরিক সর্দারদের আধুনিক যুগের রাজারূপে গণ্য ক'রে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। স্পেনীয়দের রিপোর্টই এর জন্য দায়ী। প্রথমত, ভ্রান্ত ধারণার ও অতিরঞ্জিত ধারণার বশবর্তী এই সব রিপোর্ট লিখিত হ'লেও শেষে স্পেনীয়রা ইচ্ছে করেই মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। মর্গ্যান্ সর্বপ্রথম এই সব রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি রীতিমতভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, মেক্সিকোবাসীরা নিউ-মেক্সিকোর পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে উন্নতর হ'লেও বর্বর অবস্থার মধ্যস্তরে ছিল। এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ রিপোর্টগুলো থতালে দেখা যায়, মেক্সিকোবাসীদের অবস্থা নিম্নরূপ: তিনটে উপজাতি নিয়ে গড়া উপজাতি-সঙ্ঘ; কতকগুলো উপজাতি এই সঙ্ঘের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে কর জোগায়। এই সমস্ত উপজাতি ফেডারেল কাউন্সিল ও ফেডারেল সামরিক নেতা দ্বারা শাসিত হ'তো। স্পেনীয়রা এই নেতাকেই "সম্রাট্" বলে প্রচার করে।"— (এঙ্গেলসের টীকা।)

এমন কি, গোষ্ঠীর লোকজনকেও গোলামে পরিণত করা দস্তুরে পরিণত হয়। নানা উপজাতির মধ্যে সনাতনী সংগ্রাম ক্রমশ গবাদি পশু, গোলাম ও ধন-সম্পদ অধিকারের উদ্দেশ্যে জলপথ ও স্থলপথের নিয়মিত লুঠ-তরাজে পরিণত হয়। যুদ্ধ-হাঙ্গামা ক্রমে ধনলাভের উৎসরূপে গণ্য হয়, ধন-সম্পদ ক্রমে পরমার্থের মর্যাদা লাভ করে। গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে ধন-রত্ন আহরণ ন্যায়-সঙ্গত বলে গণ্য হয়। কিন্তু একটা জিনিসের তখনো অভাব ছিল। গোষ্ঠী-প্রথার সমষ্টিগত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তির নব-অর্জিত ধন-রত্ন উপভোগের ব্যবস্থা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পূর্বে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হ'লেও তাহা রীতিমত পবিত্র ও মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যরূপে প্রচার করার মত কোন প্রতিষ্ঠান তখনো কায়েম হয় নি। সম্পত্তি আহরণের প্রত্যেকটি কলা-কৌশল সর্ব-সম্মতরূপে গ্রহণ ক'রে ক্রম-বর্ধমান গতিবেগে ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা আর মানব-সমাজকে কতকগুলো চিরন্তনী শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে ধনিক শ্রেণীগুলো কর্তৃক সর্বহারা শ্রেণীগুলোর শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করবার মত কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টাও মানব-সমাজে রূপ পরিগ্রহ করেনি।

অবশেষে এই প্রতিষ্ঠানটি দেখা যায়। মানুষ রাষ্ট্র আবিষ্কার করে।

পঞ্চম অধ্যায়

এথেনীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, কেমন ক'রে গোষ্ঠী-কাঠামোর শাখা-প্রশাখা-গুলোর এইরূপ আংশিক রূপান্তর সাধন হয় এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠী-কাঠামোর বাকি অংশটা ছেঁটে ফেলে এবং শেষপর্যন্ত খাঁটি রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষই বা কোন্ উপায়ে সমগ্র গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানটার উচ্ছেদ সাধন ক'রে তার স্থান দখল করে বসে ? গোষ্ঠীর আমলে সত্যিকার "সশস্ত্র জনগণ" গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির ভেতর দিয়ে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতো। সশস্ত্র "সরকারবাহিনী" ক্রমশ এদের স্থান অধিকার করে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের সেবা করাই এই বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য এবং তাদের অঙ্গুলি সঞ্চালনে জন-সাধারণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও এই সমস্ত সৈন্যের কর্তব্যে পরিণত। কি করে যে এই সমস্ত প্রথা কায়েম হয় অন্ততপক্ষে, তার প্রাথমিক পরিচয় প্রাচীন এথেন্সে যে-ভাবে মিলতে পারে এমন আর কোথাও সম্ভব নয়। মর্গ্যান্ এই সব পরিবর্তনের মোটামুটি আভাস দেন। এর আর্থিক পটভূমি ও তার কারণ বিশ্লেষণ এর সঙ্গে আমাকেই যোগ করতে হয়েছে।

বীরযুগেও এথেনীয় গ্রীকদের চারটে উপজাতি এট্টিকা প্রদেশে পৃথক পৃথক অঞ্চলে বাস করতো। চারটে উপজাতি বারোটা ফ্রেত্রীতে বিভক্ত ছিল। এই বারোটা ফ্রেত্রীই সিক্রপসের বারোটা শহরে পৃথকভাবে বসবাস করতো। শাসন-প্রণালী ছিল বীরযুগ-সম্মত : গণ-পরিষদ, গণ-কাউন্সিল ও বাসিলিউস্। লিখিত ইতিহাসের প্রতি যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, তাতে দেখা যায়, জমি-জমার রীতিমত ভাগাভাগি, আর ঐ সব জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। বর্বর অবস্থার উচ্চস্তরের শেষভাগে যতটা সম্ভব সেইভাবে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে এবং তদনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যও কায়েম হয়েছে। খাদ্যশস্য ছাড়া মদ এবং তেলও উৎপন্ন হতে আরম্ভ হয়; ইজিয়ন সাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য ফিনিশীয়দের হস্ত থেকে ক্রমশ এথেনীয়দের করায়ত্ত হয়ে পড়ে। জমিজমার ক্রয়-বিক্রয় এবং কৃষি ও কুটির-শিল্প, ব্যবসা ও জাহাজ পরিচালনা ইত্যাদির ভেতরে ক্রমিক শ্রমবিভাগ ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির লোকজনের সংমিশ্রণ ঘট্‌তে আরম্ভ করে। এক দেশের লোক হ'লেও ফ্রেত্রী ও উপজাতির এলাকার মধ্যে এই সমস্ত দলের বহির্ভূত

লোকজন এসে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। নতুন বাসভূমিতে এরা বিদেশী-রূপে গণ্য হয়। শান্তির সময়ে প্রত্যেক ফ্রেত্রী ও উপজাতি এথেন্সে অবস্থিত কাউন্সিল বা বাসিলিউসের মতামতের অপেক্ষা না করেই নিজেদের কাজকর্ম নির্বাহ করতো। কিন্তু একই এলাকায় বাস করেও ফ্রেত্রী বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন-কোন লোকের পক্ষে এই শাসন-কার্যের অংশ গ্রহণ কোনমতেই সম্ভব ছিল না।

প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রথার সু-শৃঙ্খল কার্য-ক্রমের ভেতরে ইহা এমন বৈসুরের সৃষ্টি করে যে, বীরযুগেও এর প্রতিকারোপায় অবলম্বনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এই সময় থিসিউসের শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হয়। নয়া শাসন-প্রণালীর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে এথেন্সে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র পত্তন—অর্থাৎ বিভিন্ন উপজাতি এতদিন স্বাধীনভাবে যে-সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে এসেছে তার কতকাংশ সর্বজনীন বলে ঘোষণা করে এথেন্সে অবস্থিত এক সাধারণ কাউন্সিলের হাতে ঐ সমস্ত কাজের ভার দেওয়া হয়। এই নতুন এক ধাপ কার্যক্রম দ্বারা এথেনীয়রা এতদূর অগ্রসর হয়, যা আমেরিকার কোন ইণ্ডিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। প্রতিবেশী উপজাতিগুলোকে নিয়ে একটা সাদাসিধে উপজাতি-সংঘ রূপে গড়ে না উঠে এথেনীয়রা একটা একক জাতিরূপে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। এইভাবে সর্বজনীন এথেনীয় বেসামরিক আইন গড়ে উঠে, যার স্থান ছিল উপজাতি ও গোষ্ঠীর আইনের অনেক উপরে। এথেনীয় নাগরিকগণ এইভাবে আপন আপন উপজাতীয় এলাকার বাইরেও নির্দিষ্ট অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণ লাভ করে। গোষ্ঠী-প্রথায় এইভাবে প্রথম ভাঙনের সৃষ্টি হয়। কারণ সমগ্র এট্টিকা প্রদেশের কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এথেনীয় গোষ্ঠী-শাসন প্রণালীরও বহির্ভূত লোকজনকে নাগরিকরূপে স্বীকার করে লওয়ার প্রাথমিক উপায়টারও এইভাবে সৃষ্টি হয়। থিসিউসের দ্বিতীয় বিধি অনুসারে গোষ্ঠী-ফ্রেত্রী-উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত লোককে "ইউপাত্রিদেস্" অর্থাৎ অভিজাত, "গেওমরয়" অর্থাৎ চাষী এবং "দেমিউর্গি বা কারিগর এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সরকারী পদ একমাত্র অভিজাতদের হাতেই ন্যস্ত করা হয়। সরকারী পদ ছাড়া অভিজাতদের নতুন কোন একতিয়ারই ছিল না। কাজেই নতুন শ্রেণী-বিভাগ আদৌ কার্যকরী বিবেচিত হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ আইনগত ভেদাভেদেরও সৃষ্টি করা হয় না। তবুও লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমশ নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান মাথা তুলতে আরম্ভ করে। ক্রমে পদগুলি ঐ সমস্ত পরিবারের যেন একচেটিয়া

অধিকারে পরিণত হয়। পরে এইসব পরিবার আপন আপন গোষ্ঠীর বাইরে সমবেত হয়ে কায়েমী-স্বার্থ-বিশিষ্ট দলে পরিণত হয়। রাষ্ট্রও পরে এই দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়; চাষী ও কারিগরের শ্রম-বিভাগ ও প্রাচীন দলবিভাগ গোষ্ঠী ও উপজাতির ঘোরতর পরিপন্থী হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীগত সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চরম অবস্থায় ঠেকে। গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে কতকগুলো লোককে কায়েমী স্বার্থ বা অধিকারবিশিষ্ট এবং বাকি লোকজনকে সর্বহারায় পরিণত ক'রে রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অতঃপর শেষোক্ত দলটিকে দু'টো উৎপাদক শ্রেণীতে ভাগ ক'রে একের বিরুদ্ধে অপরকে প্রয়োগ করা হয়। সোলনের আমল পর্যন্ত এথেন্সের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস মাত্র অসম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। বাসিলিউসের পদ ক্রমশ লোপ পেতে বসে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমে অভিজাত কুল থেকে নির্বাচিত আর্কনরা দখল করতে আরম্ভ করে। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে যায়। খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে এদের শাসন অসহ্য হয়ে পড়ে। মুদ্রা ও সুদি কারবার জনসাধারণকে দমন করার প্রধান অস্ত্রে পরিণত হয়। এথেন্সের আশে পাশে অভিজাতদের প্রধান কেন্দ্র ও ঘাঁটি গড়ে উঠে। সামুদ্রিক বাণিজ্য ও এর পরিপূরক হিসেবে মাঝে মাঝে জলদস্যুগিরি দ্বারা এরা প্রভূত ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় এবং মুদ্রা-সম্পদ এদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এখান থেকে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি স্বাভাবিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পল্লি-সমাজ-দেহে এসিডের মত ক্রিয়া বিস্তার করে। মুদ্রা-প্রচলনের সঙ্গে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের আদৌ খাপ খায় না। গোষ্ঠীর বাঁধন এট্টিকা প্রদেশের ছোট ছোট কৃষকদের এতদিন রক্ষা করে এসেছিল। এই বাঁধন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কৃষক ধ্বংসমুখে পতিত হয়। উত্তমর্ণদের দলিল-দস্তাবেজ ও সম্পত্তি নিয়ে বন্ধকী কারবার গোষ্ঠী বা ফ্রেত্রীর মান-মর্যাদা স্বীকার করতেও প্রস্তুত ছিল না। প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রথার নিকট কিন্তু মুদ্রা, মুদ্রার অগ্রিম দাদন ও মুদ্রা-ঘটিত ধার-কর্জ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তু ছিল। কাজেই, অভিজাতদের অবিরাম সম্প্রসারণশীল মুদ্রা-শাসন ক্রমে গুরুরূপ নতুন আইন-কানুনের সৃষ্টি করে। এই আইন অধমর্ণদের উপর উত্তমর্ণদের একতিয়ার আর মুদ্রা-মালিকদের দ্বারা ছোট-খাটো চাষীদের শোষণের পথ পরিষ্কৃত করে। এট্টিকার সমস্ত কৃষি-খেত বন্দকী স্তম্ভে ভর্তি হয়ে যায়। জমিটা অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে অত টাকার জন্য বন্ধক আছে, ঐ সমস্ত স্তম্ভে বা ফলকে এইসব কথা লেখা থাকতো। যে-সব জমিতে এই ধরণের কোন চিহ্ন থাক্‌তো না,

সেগুলোর অধিকাংশই বন্ধক দেওয়া বাবদ বা সুদ বাবদ ইতিপূর্বেই অভিজাত সুদখোরদের তাঁবে চলে গিয়েছে এই রকম বুঝতে হবে। যদি কোন চাষীকে প্রজারূপে কাজ করার ও তার মেহনতি থেকে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র নিয়ে বাকি ছ'ভাগের পাঁচভাগ নতুন মনিবের কর জোগানোর অধিকার দেওয়া হ'তো তা'হলে সে পরম পরিতোষ লাভ করতো। কিন্তু দুর্গতির এখানেই সব শেষ নয়। জমি বেচেও যদি দেনা শোধ না হ'তো, আর যদি কোন জামিন না রেখে দেনা করা হতো তা হলে অধমর্ণকে উত্তমর্ণের দাবি মেটানোর জন্য নিজের ছেলেমেয়েদের বিদেশের হাট-বাজারে গোলামরূপে বিক্রী করতে হ'তো। জনক-বিধি ও একনিষ্ঠ-বিবাহমূলক বিয়ের ইহাই হচ্ছে প্রথম অবদান। রক্ত-শোষক মহাজনের এতেও যদি পরিতৃপ্তি না হ'তো তাহ'লে সে খোদ অধমর্ণকেও গোলামরূপে বিক্রী করতে পারতো। এথেনীয় সমাজে সভ্যতার প্রথম ঊষা জনগণের বুকের রক্তে এমনি রক্তিমাভা ধারণ করে।

পূর্বে যখন জনগণের জীবনযাত্রা গোষ্ঠীর শাসন-প্রণালী অনুসারে পরিচালিত হ'তো, তখন এই ধরণের বিপ্লব অসম্ভবই ছিল। কিন্তু এখানে তা সত্য সত্যই ঘটলো, কেমন করে তা কেউ বলতে পারে না। আবার কিছু সময়ের জন্য ইরোকোয়াদের কাছে ফিরে যাওয়া যাক। পুরাপুরি নিশ্চেষ্ট থেকে, এমন কি, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এথেনীয়দের এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে ইরোকোয়াদের কাছে তা ছিল অচিন্তনীয়। ইরোকোয়ারা বছরের পর বছর ধ'রে একই উপায়ে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো উৎপন্ন করতো। কাজেই বাইরের চাপের ফলে এই ধরণের বিরোধ তাদের মধ্যে মোটেই গড়ে উঠবার অবসর পায় নি। ইরোকোয়াদের মধ্যে ধনী-নির্ধন ও শোষক-শোষিতের বিরোধিতা কোন কালেই দেখা দেয় নি। ইরোকোয়ারা তখনো প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর নির্দিষ্ট গণ্ডি ও সীমারেখার মধ্যে তারা তাদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিল। ছোট ছোট উদ্যানগুলোর শস্যহানি, নদী ও হ্রদের মৎস্য হ্রাস ও বন-জঙ্গলের শিকারের প্রাণিগুলোর ক্রমিক বিলোপের কথা বাদ দিলে, তারা ভালভাবেই জানতো জীবিকা-নির্বাহ ব্যবস্থার কি রকম পরিণতি ঘটবে। ফল দাঁড়াবে অবশ্য জীবিকানির্বাহের বস্তুগুলোর প্রাচুর্য অথবা বিরলতা; কিন্তু তার জন্য অচিন্তনীয় সমাজ-দ্রোহ, গোষ্ঠীবন্ধন ছিন্ন হওয়া বা গোষ্ঠী ও উপজাতির সদস্যদের পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত করার মত

উপসর্গ আদৌ উপস্থিত হবে না। উৎপাদনের বহর ছিল সীমাবদ্ধ—কিন্তু উৎপাদক আপন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিল। বর্বর যুগের উৎপাদন-প্রণালীর এই মস্ত বড় সুযোগ-সুবিধা সভ্যতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। মানুষ এখন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর উপর যে বিরাট নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করেছে এবং বর্তমানে স্বাধীনভাবে মেলামেশার যে সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে, তাকে ভিত্তি করে ঐ পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরবর্তী পুরুষের নর-নারীরই কর্তব্যরূপে গণ্য হবে।

গ্রীকদের অবস্থা এইরকম ছিল না। পশুযূথ ও বিলাসের সামগ্রী নিয়ে গঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির রেওয়াজ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়-প্রথার সৃষ্টি ক'রে উৎপন্নদ্রব্যগুলোকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে। এখানেই পরবর্তী সমগ্র বিপ্লবের মূল নিহিত। উৎপাদক যখন সরাসরি নিজে ভোগ না ক'রে উৎপন্ন-দ্রব্য বিনিময়ের ভেতর দিয়ে হাতছাড়া করে, তখন উৎপন্ন-দ্রব্যের উপর তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারপর উৎপন্ন-সামগ্রীর যে কি অবস্থা ঘটে তা জানবারও তার উপায় নেই। একদিন হয়ত ঐ উৎপন্ন-দ্রব্য উৎপাদকের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়ে তাকে শোষণ করার ও তার উপর অত্যাচার চালাবার যন্ত্রেও পরিণত হতে পারে। এজন্য কোন সমাজকে যদি আপন উৎপন্ন-দ্রব্যগুলোর উপর প্রভুত্ব অব্যাহত রাখতে হয়, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফলগুলোও নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হয়, তাহ'লে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়-প্রথার বিলোপ সাধন ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একবার বিনিময়ের রেওয়াজ আরম্ভ হ'লে আর উৎপন্ন-দ্রব্যগুলো পণ্যদ্রব্যে পরিণত হ'লেই উৎপন্ন-দ্রব্য যে কত দ্রুতগতিতে উৎপাদকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এথেনীয়গণ তা অতি সত্বর বুঝতে পারে। পণ্য-দ্রব্য উৎপাদনের রেওয়াজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জমি চষতে লেগে যায়। শীঘ্রই জমিজমার উপর ব্যক্তির মালিকানা-স্বত্ব কায়েম হয়। এর পরেই দেখা দেয় মুদ্রা, অর্থাৎ অন্যান্য সকল প্রকার পণ্য-দ্রব্যের বিনিময়ের বাহন সর্বজনীন পণ্যের অভ্যুদয়। কিন্তু মানুষ যখন মুদ্রা আবিষ্কার করে তখন তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে তারা আর একটা নতুন সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করতে চলেছে, আর এই সর্বজনীন শক্তির সামনে সমগ্র সমাজ মাথা নিচু করে দাঁড়াবে। সৃষ্টিকর্তাদের মরজির উপর নির্ভর না করে তাদের অগোচরেই অতি সহসা এই যে নতুন শক্তি উদ্ভূত হয় তার উদ্দাম

যৌবনের সব-কিছু পাশবিকতা সহ এথেন্সবাসী তার অশুভ শক্তির প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে।

তাহ'লে এখন উপায় কি? প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রথা কেবলমাত্র মুদ্রার বিজয়াভিযানের সামনেই হীনবীর্য প্রমাণিত হয় নি। তার কাঠামোর ভেতরে মুদ্রা উত্তমর্ণ, অধমর্ণ এবং জোর করে কর্জ আদায় প্রভৃতি বিষয়গুলোকে স্থান দিতেও পুরোপুরি অসমর্থ হয়। নতুন সামাজিক শক্তি শিকড় গেড়ে দাঁড়ায়। সত্যযুগে ফিরে যাওয়ার জন্যে ইচ্ছা করলে বা তার জন্যে হা-হুতাশ করলেই মুদ্রা আর সুদের কারবার পৃথিবী ছাড়া হবে না। তা-ছাড়া, গোষ্ঠী-কাঠামোতে আরো কয়েকটি ছোট-খাটো ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এথেনীয়গণ গোষ্ঠীর বাইরে জমিজমা বিক্রয়ের অধিকার লাভ করলেও বাসগৃহ সেভাবে বিক্রী করতে পারতো না। কিন্তু তাহলে হবে কি? এট্রিকার সর্বত্র, বিশেষত, এথেন্স শহরে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ফ্রেত্রীর সদস্যরা প্রত্যেক পুরুষেই পরস্পরের সঙ্গে আরো বেশি সংমিশ্রিত হ'য়ে পড়ে। কৃষি, কুটিরশিল্প (এইগুলো আবার বহু উপবিভাগে বিভক্ত), ব্যবসায়, জাহাজ-পরিচালন ইত্যাদি শ্রমবিভাগের বিভিন্ন শাখার সংখ্যা শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি বেড়ে যায়। বৃত্তি বা পেশা অনুসারে অধিবাসীরা এখন বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দল বা শ্রেণীগুলো অনেকটা স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রত্যেক দলের স্বার্থ এবং অধিকারও আবার বিভিন্ন ধরণের। গোষ্ঠী বা ফ্রেত্রী এই সব দল উপদলের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করতে অক্ষম। এমন-কি, এই প্রাচীন যুগেও গোলামদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়; স্বাধীন এথেন্সবাসীদের চেয়ে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় অনেক বেশি। গোলামী গোষ্ঠী প্রথার নিকট অজ্ঞাত; কাজেই, গোলামদের নিয়ন্ত্রণ করাও তার পক্ষে অসম্ভব। এথেন্সে অর্থোপার্জন অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য বলে অনেক বিদেশী এখানে স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে। কিন্তু প্রাচীন শাসন-প্রণালী অনুসারে এদের কোন অধিকারও ছিল না এবং আইনবলে রক্ষণাবেক্ষণেরও এরা দাবি করতে পারতো না। এথেনীয়গণ অপূর্ব সহনশীলতার সহিত এদের সঙ্গে বসবাস করলেও এরা সব সময়ে নিজেদের বিদেশী ভেবে নানা প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করে।

অল্প কথায়, গোষ্ঠী-প্রথার তখন মরণ-ঘণ্টাই বেজে উঠে। সমাজ প্রতিদিনই এই প্রথাকে ঠেলে ফেলে অগ্রসর হয়। সমাজের যে-সব বড় বড় অশুভ এর চোখের সামনেই উদ্ভূত হয় সেগুলোও গোষ্ঠী-প্রথা দমন করতে অক্ষম। কিন্তু ইত্যবসরে রাষ্ট্র বেশ নির্বিবাদেই গড়ে উঠে। শ্রম-বিভাগের ফলে প্রথমত

শহর ও পল্লির মধ্যে, তদনন্তর শহরে শিল্পের বিভিন্ন শাখার ভেতর নতুন নতুন শ্রেণী আর এই সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকারগুলো তদারকের জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হয়। নানা প্রকার সরকারী চাকরিরও ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া, শিশু-রাষ্ট্রের, সকলের উপর, নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকাও দরকার। এথেনীয়দের মত নাবিক জাতের পক্ষে প্রথমত এই শক্তি নৌ-শক্তি ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। বাণিজ্য-জাহাজগুলো রক্ষা আর ছোট-খাটো যুদ্ধ চালানোর জন্য এই নৌ-শক্তির প্রয়োজন ছিল। সোলনের আবির্ভাবেরও অনেক আগে প্রত্যেক উপজাতিকে বারোটা "নৌ-ক্রারিয়ায়" বিভক্ত করে অনেকগুলো নৌ-ক্রারিয়ায় বা সামরিক জেলার সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক নৌ-ক্রারিয়াকে এক এক খানা রণতরীর সাজ-সজ্জা ও নৌ-সৈন্য সরবরাহ এবং তাছাড়া দু'জন ঘোড় সওয়ারও জোগাতে হ'তো। এই প্রথাও গোষ্ঠী-প্রথার উপর ডবল আঘাত হানে : প্রথমত, ইহা ক্রমশ এক সরকারী সৈন্য-দলের সৃষ্টি করে, যাকে আর সমগ্র সশস্ত্র জনগণরূপে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থা সর্বজনীন কাজকর্ম পরিচালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা রক্তসম্পর্ক অনুসারে ভাগাভাগি না করে **বাসস্থান হিসাবে** সর্বপ্রথম জনগণকে বিভক্ত করে। আমরা এই ব্যবস্থার তাৎপর্য নিয়ে পরে আলোচনা করবো।

গোষ্ঠী-প্রথা শোষিত ও নিগৃহীত জনসাধারণকে রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ায় ক্রম-বর্ধমান রাষ্ট্রের উপরেই তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সোলন-পরিকল্পিত শাসন-পদ্ধতি প্রয়োগ করে রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে। পুরাতন শাসন-পদ্ধতির তুলনায় রাষ্ট্র এই নয়া ব্যবস্থায় নিজের বুনিয়াদ শক্ত করার অবসর পায়। খৃঃ পূঃ ৫৯৪ সালে সোলনের শাসন-সংস্কার কিভাবে সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা জানি, তিনি একটার পর একটা রাজনৈতিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথমেই সম্পত্তিকে আক্রমণ করে বসেন। এতকাল এক শ্রেণীর সম্পত্তিকে অপর এক শ্রেণীর সম্পত্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিপ্লব ঘটে এসেছে। এক শ্রেণীর সম্পত্তিকে উৎখাত না করলে অপর এক শ্রেণীর সম্পত্তিকে রক্ষা করা যায় না। সুমহান ফরাসী বিপ্লবের আমলে বুর্জোয়া সম্পত্তিকে রক্ষা করার জন্য সামন্ততন্ত্রীয় সম্পত্তিকে বলি দেওয়া হয়। সোলন অধমর্ণদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য উত্তমর্ণদের সম্পত্তির উপর আক্রমণ চালান। দেনাপত্র একদম উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিভাবে যে ইহা কাজে পরিণত হয়, তার বিশদ বিবরণী আমরা

অবগত নই। তবে আমরা তাঁর কাব্যগ্রন্থে জমি-জমা থেকে বন্ধকী খুঁটাগুলো উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে আর দেনাদার যে-সব লোক দেশছাড়া হয় তাদের আবার ভিটেয় ফিরিয়ে আনতে পারেন বলে তাঁকে গর্ব করতে দেখা যায়। প্রকাশ্যে সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন করেই এই কাজ সম্পন্ন হতে পেরেছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তথাকথিত সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব এক এক রকমের সম্পত্তি রক্ষাকল্পেই সাধিত হয়। বিপ্লবের পতাকা উড়ে এক এক রকমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উপরেই; বাজেয়াপ্ত করাকে অনেক সময় চুরি-করা আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। ধন সম্পত্তির সম্পর্কে সব চেয়ে বড় সত্য এই যে, আড়াই হাজার বছর ধ'রে সম্পত্তির উপর জোর-জবরদস্তি চালিয়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রাখা হয়।

স্বাধীন এথেনীয়গণ যাতে আবার দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ না হয় তজ্জন্য কোন একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, কতকগুলো সর্বজনীন আইন বিধিবদ্ধ করে এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। যথা—খাতকের পক্ষে নিজের দেহ বন্ধক রাখা চলবে না। চাষীদের জমি-জমার উপর অভিজাতদের ক্ষুধিতদৃষ্টি সংযত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির তাঁবে সর্বোচ্চ জমি-জমার বরাদ্দও বেঁধে দেওয়া হয়। অতঃপর শাসনপ্রণালীও সংশোধন করা হয়। নিম্নে প্রধান প্রধান শাসন-সংস্কারের পরিচয় দেওয়া গেল :—

প্রত্যেক উপজাতি থেকে ১০০ হিসেবে সদস্য গ্রহণ ক'রে পরিষদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০০ জনে পরিণত করা হয়। এখানেও উপজাতিকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়। নয়ারাষ্ট্রে সাবেক শাসনপদ্ধতির মাত্র এইটুকু অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। নয়া-শাসনপদ্ধতির বাকি অংশ সম্বন্ধে দেখা যায়, সোলন দেশের নাগরিকদের জমি-জমা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনুসারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম তিন শ্রেণীর জন্য সর্বনিম্ন ফসলের বরাদ্দ যথাক্রমে ৫০০, [illegible]০০ ও ২[illegible]০ 'মেদিম্নি' ধরা হয় ([illegible] মেদিম্নাস্=৯ গ্যালন)। যাদের ফসলের পরিমাণ এর চেয়েও কম ছিল, বা মোটেই ছিল না, তাদের চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারী চাকরি কেবলমাত্র প্রথম তিন শ্রেণীর ভাগ্যেই জুটতো। সেরা পদগুলো ছিল প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট—চতুর্থ শ্রেণীর লোক জনের কেবলমাত্র গণপরিষদে কথা বলার আর ভোট দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। সমস্ত সরকারী চাকুরে বা অফিসার এই পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হ'তো। অফিসারদের এই পরিষদে রীতিমত জবাবদিহি করতে হ'তো। এখানে সমস্ত আইন-কানুনও বিধিবদ্ধ হ'তো। চতুর্থ

শ্রেণীই এখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। ধন-দৌলতের কল্যাণে অভিজাতদের ক্ষমতার আংশিক পুনরুদ্ধার সাধিত হ'লেও জনগণের হাতেই চরম ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। এই চার শ্রেণীকে ভিত্তি করে সৈন্যবাহিনীও পুনর্গঠিত হয়। প্রথম দুই শ্রেণী নিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়; তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ভারী পদাতিক সৈন্যরূপে কাজ করে; চতুর্থ শ্রেণী বর্মবিহীন হাল্‌কা পদাতিক সৈন্যরূপে এবং নৌ-বহরে খুব সম্ভব বেতন নিয়ে কাজ করে।

শাসন-পদ্ধতি বা রাষ্ট্র-কাঠামোর ভেতরে এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা নামে নতুন পদার্থ স্থান লাভ করে। জমি-জমার আকার আয়তন অনুসারে নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকারেরও বরাদ্দ মাপ করা হয়। সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল শ্রেণীগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে রক্তসম্পর্কের উপর দণ্ডায়মান শ্রেণীগুলোও তত যবনিকার অন্তরালে সরে যেতে থাকে। গোষ্ঠী-প্রথাকে আর একদফা পরাভবের গ্লানি সহ্য করতে হয়।

সম্পত্তির মাপকাঠিতে রাজনৈতিক অধিকার নির্ধারণ কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন-তান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এই ব্যবস্থা বা নীতি বড় রকমের অংশ গ্রহণ করলেও বহু রাষ্ট্র, এমন-কি, পূর্ণ-বিকাশ-প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোও এই রকম কোন ব্যবস্থা না করেও ধরাতলে টিকে থাক্‌তে সমর্থ হয়। এথেন্সেও এই নীতি কার্যকরী ছিল অল্পদিনের জন্যে। এরিস্টাই-ড্‌সের সময় থেকে সমস্ত সরকারী পদ সমস্ত নাগরিকদের নিকট উন্মুক্ত ছিল।

এথেনীয় সমাজ পরবর্তী ৮০ বছর ধরে ক্রমশ যে পথ অবলম্বন করে সেই পথেই পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সোলনের পূর্ববর্তী যুগে জমি-বন্ধকীর উপর অত্যধিক হারে সুদ গ্রহণের প্রথাও প্রচলিত হয়। এই প্রথা ও ভূ-সম্পত্তির অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত করার প্রথারও খর্বতা সাধন করা হয়। ক্রমবর্ধমান হারে গোলামদের শ্রম-শক্তি নিয়োগ দ্বারা ব্যবসা, কুটির-শিল্প ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কলাশিল্প মানুষের প্রধান উপজীবিকায় পরিণত হয়। এথেনীয়গণ জ্ঞান-গরিমায় সমুজ্জল হয়ে উঠে। পূর্বেকার মত প্রতিবেশীদের উপর নৃশংস অত্যাচার না চালিয়ে তারা গোলাম ও বিদেশী মক্কেলদের শোষণ করতে থাকে। অস্থাবর সম্পত্তি, মুদ্রা-সম্পদ, গোলাম ও জাহাজ অনবরত বেড়ে চলে; কিন্তু ইহা প্রথম যুগের মত জমি-জমা ক্রয়ের উপায়রূপে গণ্য না হয়ে নিজেই মূল্যবান সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এতে একদিকে অভিজাতদের সঙ্গে ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত নতুন শ্রেণীর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি

হয়। প্রতিযোগিতায় শেষোক্ত শ্রেণীই জয় লাভ করে। আরেক দিকে পুরাতন গোষ্ঠী-শাসনের শেষ আশ্রয়স্থলও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতীর সদস্যরা এখন এট্টিকায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, রাজনৈতিক দল হিসাবে এইগুলা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হয়ে পড়ে। এথেনীয় নাগরিকদের অনেকে কোন গোষ্ঠীরই অন্তর্গত নয়। তারা বাইরে থেকে আগত ঔপনিবেশিক কিন্তু রীতিমত নাগরিকের অধিকার লাভ করে। কিন্তু কোন প্রাচীন রক্তগত-দলের পোষ্যরূপে এরা গৃহীত হয় নি। বিদেশী ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ লাভ ছাড়া এদের আর কোন অধিকারই ছিল না।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পার্টির মধ্যেও রীতিমত সংগ্রাম চলে। অভিজাতরা তাদের প্রাক্তন অধিকারগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। কিছু সময়ের জন্য তাদের এই চেষ্টা সফলও হয়। শেষপর্যন্ত ক্লাইস্‌থেনিসের বিপ্লবে (৫০৯ খৃঃ পূঃ) এদের চরম পরাজয় ঘটে। অভিজাতদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী-শাসনের শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত হয়।

ক্লাইস্‌থেনিস তাঁর নতুন শাসনতন্ত্রে গোষ্ঠী ও ফ্রেত্রী নিয়ে গঠিত প্রাচীন চার জাতের স্থলে এক নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। অধিবাসীদের তিনি তাদের বাসভূমি অনুসারে বিভক্ত করেন। নৌক্রারিয়া প্রথাতেও এই ধরণের ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করা হয়। রক্তগত দলের সদস্যগিরির পরিবর্তে এখন বাস্তু ভিটাটাই আসল বস্তুরূপে গণ্য হয়। জন-সাধারণের পরিবর্তে এখন এলাকাকে বিভক্ত করা হয়। রাজনীতির দিক থেকে অধিবাসীরা এখন ভূমির পরিশিষ্ট বা লেজুড়ে পরিণত হয়।

সমগ্র এট্টিকাকে স্বায়ত্ত শাসনযুক্ত একশ জেলায় ভাগ ক'রে প্রত্যেক জেলার নাম দেওয়া হয় দেমে। প্রত্যেক দেমের অধিবাসীরা আপন আপন অধ্যক্ষ, (দেমার্ক) খাজাঞ্চী ও ত্রিশজন বিচারক নির্বাচন করতো। বিচারকরা ছোট-খাটো বিরোধের নিষ্পত্তি করতো। প্রত্যেক দেমের নিজস্ব মন্দির ও মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা হিরো ছিল। পুরোহিতরা দেমে-বাসী কর্তৃক নির্বাচিত হ'তো। দেমে-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিবাসীদের পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। মর্গ্যানের মতে, দেমে মার্কিন গণতান্ত্রিক নগর-শাসনের আদিম মূর্তি। এথেন্সে রাষ্ট্র গড়ে উঠবার সময়ে যে জীবন-কেন্দ্র পত্তন করা হয় বর্তমানের সর্বোচ্চ বিকাশ-প্রাপ্ত আধুনিক রাষ্ট্রেরও সেই জীবন-কেন্দ্রের রেওয়াজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত জীবন-কেন্দ্রের দশ-দশটা নিয়ে এক-একটা উপজাতি গঠন করা হয়। রক্তগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন উপজাতির সঙ্গে এর পার্থক্য ঘোষণার জন্য নয়া উপজাতিস্থানীয় বা দেশগত উপজাতি আখ্যা লাভ করে। স্থানীয় উপজাতি কেবলমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল না; ইহা সামরিক প্রতিষ্ঠানরূপেও গণ্য ছিল। প্রত্যেক উপজাতি আপন আপন উপজাতীয় সর্দার অর্থাৎ ফিলার্খ নির্বাচন করতো। ইনি অশ্বারোহী সৈন্যদল পরিচালন করতেন। পদাতিকবাহিনীর সেনাপতিকে বলা হ'তো তাক্‌সিয়ার্খ। উপজাতীয় এলাকার সমস্ত সৈন্যবলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে বলা হ'তো স্ত্রাতেগোস্। প্রত্যেক উপজাতিকে পাঁচখানা রণতরী ও এই সমস্ত রণতরীর নৌ-সৈন্য ও কমাণ্ডারও সরবরাহ করতে হ'তো। এট্টিকার এক একজন বীর প্রত্যেক উপজাতির অভিভাবক দেবতারূপে নির্বাচিত হয়, এই দেবতার নাম অনুসারে উপজাতির নামকরণও সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক উপজাতি এথেনীয় পরিষদে পঞ্চাশজন কাউন্সিলার বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতো।

সকলের উপর ছিল এথেনীয় রাষ্ট্র। দশটা উপজাতি কর্তৃক নির্বাচিত ৫০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কাউন্সিল কর্তৃক এই রাষ্ট্র শাসিত হ'তো। চরম ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল গণ-পরিষদের হাতে। প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিক এই পরিষদে যোগদানের ও ভোটদানের অধিকারী ছিল। আর্কন ইত্যাদি কর্মচারীরা আদালত ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগে মোতায়েন থাকতো। এথেন্সে শাসন-ক্ষমতাযুক্ত কোন সর্বোচ্চ অফিসার ছিল না।

এই নয়া শাসনতন্ত্র ও সংরক্ষিত অর্থাৎ আইনের আশ্রয়প্রাপ্ত বহু-সংখ্যক লোকের নাগরিক অধিকার লাভের ফলে গোষ্ঠী-শাসনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ সরকারী কাজকর্মের গণ্ডি থেকে বিচ্যুত হয়। সংরক্ষিত লোকজনের মধ্যে বিস্তর বিদেশী ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলামও ছিল। গোষ্ঠী ও ফ্রেত্রী ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ বেসরকারী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু প্রাক্তন গোষ্ঠীযুগের নৈতিক প্রভাব ও চির-আচরিত চিন্তাধারা বহুকাল যাবত বলবৎ থাকে। এই সমস্ত ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। অপর একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা এর রীতিমত প্রমাণ পাই।

জন-সাধারণ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথকীভূত সরকারী শক্তিই রাষ্ট্রের মূল লক্ষণ। এই সময় এথেন্সেরও কেবলমাত্র জনগণের সেনাবাহিনী ও নৌবহর ছিল। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবেই এই সমস্ত জোগাতো। সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর

বিদেশীদের আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করতো ও গোলামদের দাবিয়ে রাখতো। গোলামরাই তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে সরকারী ক্ষমতা প্রথমত কেবলমাত্র পুলিস-বাহিনীতেই পর্যবসিত ছিল। পুলিসবাহিনী রাষ্ট্রের সমান প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী জনসাধারণ এই জন্য সভ্য জাতিগুলোকে পুলিস-শাসিত জাতি বলতে অভ্যস্ত ছিল। কাজে-কাজেই, এথেনীয়গণ রাষ্ট্র-পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিস-বাহিনীও গঠন করে। পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরন্দাজ নিয়ে এই পুলিস-বাহিনী গঠন করা হয়। দক্ষিণ-জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডে এই পুলিসবাহিনী "ল্যাণ্ডজাগের" নামে অভিহিত হ'তো। স্বাধীন এথেনীয় নাগরিকগণ পুলিসের চাকরি এতদূর ঘৃণার চোখে দেখতো যে, পুলিসের কাজে ভর্তি হওয়ার চেয়ে তারা সশস্ত্র গোলামের হাতে গ্রেফ্‌তার হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করতো। এই মনোভাব প্রাচীন গোষ্ঠী ভাবধারারই পরিচায়ক। পুলিস ছাড়া রাষ্ট্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু তখনো রাষ্ট্রের নিতান্ত শৈশবাবস্থা। কাজেই গোষ্ঠীর প্রাচীনতর সদস্যদের চোখে ঘৃণ্য ও অপযশকররূপে বিবেচিত কোন বৃত্তি বা পেশাকে সম্মানজনক বৃত্তিতে পরিণত করার উপযোগী নৈতিক সম্মান-বোধ জাগিয়ে তোলার মত ক্ষমতা তার হাতে ছিল না।

রাষ্ট্র তার মূল বিভাগগুলোর দিক থেকে পূর্ণতা লাভ ক'রে ক্রমে এথেন্সবাসীর নতুন সামাজিক অবস্থার সঙ্গে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নেয়, ধন-সম্পত্তি ও শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তা বেশ বোঝা যায়। যে শ্রেণী-সংঘাতের উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড়ায়, তা আর অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার বিরোধ নয়। গোলাম আর স্বাধীন মানুষ, সংরক্ষিত লোকজন ও নাগরিকদের মধ্যে সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়। এথেন্সের সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির যুগে শিশু ও নারীসহ স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০,০০০। পক্ষান্তরে গোলাম নর-নারীর সংখ্যা ছিল ৩৬৫,০০০; আর বিদেশী ও স্বাধীনতা প্রাপ্তদের নিয়ে সংরক্ষিতদের সংখ্যা ৪৫,০০০ জন। অর্থাৎ প্রত্যেক সাবালক স্বাধীন এথেনীয় নাগরিক পিছু ১৮ জন গোলাম ও দু'জন আশ্রিত লোকের অস্তিত্ব ছিল। গোলামদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, বহুসংখ্যক লোক একসঙ্গে বড়বড় কারখানায় প্রশস্ত ঘরে ওভারসিয়ারদের অধীনে কাজ করতো। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধন-দৌলত মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়। স্বাধীন নাগরিকদের অধিকাংশই নিতান্ত গরীব

হয়ে পড়ে। এদের পক্ষে কুটির-শিল্প গ্রহণ করে গোলামদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অথবা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। গোলাম শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা এরা অত্যন্ত হীন ও অপমানজনক মনে করতো এবং এতে সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প ছিল। প্রচলিত অবস্থায় শেষোক্ত অবস্থাই ঘটেছিল। স্বাধীন নাগরিকরাই ছিল এথেনীয় রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কাজেই, নিজেদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারা এথেনীয় রাষ্ট্রেরও সমাধি রচনা করেছিল। গণতন্ত্রের ফলে এথেনীয় রাষ্ট্রের পতন ঘটে নি। ইউরোপের রাজভক্ত অধ্যাপকগণ অবশ্য এইরকমই গেয়ে থাকেন। স্বাধীন নাগরিকদের মনে দৈহিক শ্রমের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জাগ্রত ক'রে গোলামিই এথেন্সের পতন ঘটিয়েছিল।

এথেনীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় রাষ্ট্র-সংগঠনের নিখুঁত দৃষ্টান্তরূপেই গণ্য করা যেতে পারে। প্রথমত, বাহির বা ভিতর থেকে কোনরূপ পশুবলের প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তভাবেই এই রাষ্ট্র মাথা তুলবার অবসর পায়। পিসিস্ট্রেটুসের উপদ্রব বা যথেচ্ছাচার সামান্য কয়েকদিনের জন্য মাত্র টিকে ছিল এবং পরে তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এথেন্সে আমরা পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত রাষ্ট্র অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রিপাবলিকেরই সাক্ষাৎ পাই। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সমস্ত মূল লক্ষণ ও ধরণ-ধারণগুলোরও রীতিমত পরিচয় পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন রোমের গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র

রোম নগর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায়, কতকগুলো ল্যাটিন গোষ্ঠী (এই আখ্যায়িকা অনুসারে একশ) একটা উপজাতিতে মিলিত হ'য়ে এখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। অল্পদিনের মধ্যে একশ গোষ্ঠী নিয়ে সাবেলিয়ান উপজাতি এদের সঙ্গে মিশে যায়। পরে তৃতীয় এক মিশ্রিত উপজাতি একশ গোষ্ঠী নিয়ে এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিল। এই কাহিনীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করলেই বেশ বোঝা যায়, এখানে গোষ্ঠী ছাড়া প্রাকৃতিক বলতে অন্য কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আর এই গোষ্ঠীও অধিকাংশক্ষেত্রে মূল-গোষ্ঠীর শাখা মাত্র; এই মূল-গোষ্ঠী হয়ত তখন আদিম বাসভূমিতেই বসবাস করছিল। উপজাতিগুলোতেও কৃত্রিম সংগঠনের পরিচয় সুস্পষ্ট। তা-সত্ত্বেও এইগুলো প্রধানত কৃত্রিমভাবে সংগঠিত নয়, স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন প্রাচীন আদর্শ অনুসারে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অংশসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল, আর তিনটে উপজাতির প্রত্যেকটিরই মূল অংশটা যে একটা পুরাতন খাঁটি উপজাতি থেকে উদ্ভূত এরূপ ধারণা অসম্ভব নাও হ'তে পারে। মধ্যবর্তী দল হিসেবে দশ দশটা গোষ্ঠী নিয়ে ফ্রেত্রীও গড়ে উঠে। এই ফ্রেত্রীর নাম দেওয়া হয় 'কুরিয়া'। কাজেই, রোমের অধিবাসীরা ত্রিশটা কুরিয়ায় বিভক্ত ছিল।

রোমান গোষ্ঠী যে গ্রীক গোষ্ঠীরই জুড়িদার প্রতিষ্ঠান তা এখন সুবিদিত বাস্তব সত্য। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের গোষ্ঠীর মত সমাজ-কেন্দ্র থেকেই যদি গ্রীক গোষ্ঠীগুলো বিকাশ লাভ করে থাকে তাহ'লে রোমান গোষ্ঠীগুলোর বেলাতেও সেই রকমই ঘটেছে; কাজেই, রোমান গোষ্ঠীগুলো নিয়ে আলোচনা সংক্ষেপেই শেষ করা যেতে পারে।

অন্ততপক্ষে রোমের প্রাচীনতম যুগে রোমান গোষ্ঠীর গঠন-কাঠামোটা নিম্নরূপ ছিল:

(১) মৃত গোষ্ঠী-সদস্যদের সম্পত্তিতে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের অধিকার; সম্পত্তি গোষ্ঠীর ভেতরেই থাকতো। গ্রীক গোষ্ঠীর মত রোমান গোষ্ঠীতে জনক-বিধির জয়-জয়কার বশত মায়ের দিক থেকে বংশানুক্রম নির্ধারণ করা হ'তো না। রোমের প্রাচীনতম লিখিত আইনরূপে পরিচিত "দ্বাদশ বিধির" ধারা অনুসারে

মামুলি ছেলেমেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হ'তো। ছেলেমেয়ের অভাব হ'লে পিতৃকুলের লোকজন সম্পত্তির হকদার হ'তো; এদেরও অভাব হ'লে সম্পত্তি গোষ্ঠী-সদস্যদের দখলে আস্‌তো। অবস্থা যেমনই দাঁড়াক না কেন, সম্পত্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাখাই ছিল দস্তুর। এখানে আমরা সম্পদ-বৃদ্ধি ও একনিষ্ঠ-বিয়ের দরুণ গোষ্ঠী-প্রথায় নতুন নতুন আইনের ক্রমিক অনুপ্রবেশই দেখ্‌তে পাই। গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য উত্তরাধিকারের সমান হিস্যা ভোগ করবে—মূল-গোষ্ঠী-প্রথায় এই ছিল দস্তুর। এই অধিকারের প্রথম সংকোচ সাধন ক'রে কেবলমাত্র আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষেই ভোগদখলের রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। শেষপর্যন্ত আপন পুত্র-কন্যা ও তাদের পুরুষ বংশধরের পক্ষেই সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার স্বীকৃত হয়। রোমীয় দ্বাদশ-বিধিতে অবশ্য এই ক্রমের উল্টাগতি দেখতে পাওয়া যায়।

(২) সাধারণ গোরস্থানও ছিল রোমান গোষ্ঠীর আর একটা দস্তুর। ক্লোদিয়া নামক পাত্রিসিয়ান গোষ্ঠী যখন রেজিলি থেকে রোমে এসে বসতি স্থাপন করে তখন নিজস্ব ভোগদখলের জন্য তাদের একটা ভূখণ্ড দেওয়া হয়। শহরে তাদের নিজস্ব গোরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সম্রাট আগস্টাসের আমলেও দেখা যায়, ভারুসের নেতা টয়টুবুর্গ বনের যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর মৃতদেহ রোম শহরে এনে স্বগোষ্ঠীর গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়; কাজেই দেখা যায়, গোষ্ঠীর সাধারণ গোরস্থানও ছিল।

(৩) সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসবসমূহ। এইগুলো "সাক্রা জেন্তিলিসিয়া" নামে সুপরিচিত।

(৪) গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে না করার দায়িত্ব। রোমে ইহা কোন সময়েই লিখিত আইনের আকারে দেখা না গেলেও প্রচলিত প্রথাটা এই রকমই ছিল। অসংখ্য বিবাহিত রোমান-দম্পতির নাম লেখা আছে। এই সমস্ত নামের ভেতর স্বামী ও স্ত্রীর গোষ্ঠীর নাম এক ধরণের দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। উত্তরাধিকারের আইনেও একই দস্তুর চোখে পড়ে। বিয়ের পর নারী আত্মীয়তার অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে গোষ্ঠী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নারী বা তার ছেলেমেয়েরা নারীর বাপভাইয়ের সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারে না; কারণ, তাহ'লে নারীর জনক-গোষ্ঠী আপন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। নারী স্বগোষ্ঠীর কোন সদস্যকে বিয়ে করার অধিকারী নয়। এই অনুমান ছাড়া এই বিধির অন্য কোন অর্থ থাকৃতে পারে না।

(৫) যৌথ ভূমিখণ্ড ভোগদখল। মান্ধাতার আমলে উপজাতীয় এলাকা প্রথম বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই গোষ্ঠী নিজস্ব জমি দখল করে আসে। ল্যাটিন উপজাতিগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই, জমি অংশত উপজাতি, অংশত গোষ্ঠী এবং অংশত বিভিন্ন পরিবারের করায়ত্ত ছিল। এই পরিবারকে কোনমতেই ব্যক্তিগত পরিবাররূপে গণ্য করা যায় না। কথিত আছে, রোমুলুস প্রথম জমি-জমার ব্যক্তিগত ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে মাথাপিছু এক হেক্‌টেয়ার (২ জুগেরা-৭॥ বিঘা) জমির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রোমুলুসের অনেক পরের রাষ্ট্রীয় জমিজমার অস্তিত্ব ত ছিলই, উপরন্তু গোষ্ঠীর অধিকৃত জমিজমারও অস্তিত্ব ছিল। রোমান গণতন্ত্রের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় জমি বা খাস-মহলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

(৬) সাহায্যদান ও প্রতিশোধ গ্রহণে সহায়তা করা সম্পর্কে গোষ্ঠী-সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব। লিখিত ইতিহাসে এই রীতির সামান্য মাত্র নিদর্শন মিলে। রোমান রাষ্ট্র গোড়া থেকেই এমন জবরদস্ত হ'য়ে ওঠে যে, ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব ইহা নিজের হাতেই গ্রহণ করে। অপ্পিয়ুস্ ক্লদিয়ুস্‌কে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন ব্যক্তিগত শত্রুগণ সহ তার গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য শোক বস্ত্র পরিধান করে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় গোষ্ঠীসমূহ মিলিত হয়ে আপন আপন সদস্যদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনার জন্য অর্থ প্রদান করতে চেষ্টা করে কিন্তু তখনকার রোমান সেনেট তাদের এই কাজে বাধা দেয়।

(৭) গোষ্ঠীগত নাম ধারণের অধিকার। সম্রাটদের আমল পর্যন্ত এই অধিকার অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্ত লোকেরা প্রাক্তন প্রভুদের গোষ্ঠী-নাম ব্যবহার করতো ; তবে এদের গোষ্ঠীগত অধিকারগুলো ভোগ করার উপায় ছিল না।

(৮) বিদেশীয়দের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা বা গোষ্ঠীরূপে গ্রহণ করার অধিকার। ইণ্ডিয়ানদের মত প্রথমে পরিবার তাদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করে, পরে গোষ্ঠীর অনুমোদন লাভের ব্যবস্থা করা হয়।

(৯) গোষ্ঠী-নায়ক নির্বাচন ও তাকে পদচ্যুত করা সম্বন্ধে কোন স্থলেই কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু যেহেতু রোমের অস্তিত্বের প্রথম যুগেই নির্বাচিত রাজা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সরকারী পদ নির্বাচন অথবা নিয়োগ দ্বারা পূরণ করা হ'তো এবং যেহেতু কুরিয়াসমূহও আপন আপন পুরোহিত নির্বাচন করতো, সেইজন্য, একই পরিবার থেকে প্রার্থী মনোনয়নের প্রথা যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক-না-কেন, গোষ্ঠীপতিরাও (প্রিন্সিপেস্) যে নির্বাচিত হ'তো তা বেশ ধরে নেয়া যেতে পারে।

রোমান গোষ্ঠীর অধিকারগুলো এইরূপ ছিল। জনক-বিধিতে পুরোপুরি পরিবর্তন ছাড়া এই সমস্ত ইরোকোয়া-গোষ্ঠী-প্রথার অধিকার ও কর্তব্যসমূহেরই খাঁটি প্রতিচ্ছবি। এখানেও ইরোকোয়া গোষ্ঠী-প্রথা হুবহু বিদ্যমান।

আমাদের সবচেয়ে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ রোমের গোষ্ঠী-তত্ত্ব সম্বন্ধে এখনো অনেক গোঁজামিলের ব্যবস্থা করেন। একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা করলেই তা বেশ বোঝা যাবে। গণতন্ত্র ও সম্রাট আগস্টাসের আমলে রোমানদের পারিবারিক নাম সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থে (রোম-বিষয়ক গবেষণা, বার্লিন,১৮৬৪, ১ম খণ্ড*) মম্‌সেন্ লিখেছেন, "গোষ্ঠীর প্রত্যেক পুরুষ গোষ্ঠীগত নাম ব্যবহার করতো। পোষ্য ও আশ্রিত লোকজনের এই অধিকার ছিল। কেবলমাত্র গোলামদের এই অধিকার ছিল না। মেয়েরা গোষ্ঠী-নাম ব্যবহার করতো।......উপজাতি (মমসেন্ এখানে গেন্স্ শব্দ 'উপজাতি'রূপে অনুবাদ করেন) কোন আদি পূর্ব-পুরুষের বংশোদ্ভূত সমাজকেন্দ্র। এই পূর্বপুরুষ কোন সত্যিকার লোক, কল্পিত বা মনগড়াও হতে পারে। কতকগুলো সর্বজনীন পাল-পার্বণ, কবর দেওয়ার রীতি-নীতি আর উত্তরাধিকারের আইন-কানুন দ্বারা এরা ঐক্য-সংবদ্ধ। ব্যক্তি-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত সমস্ত লোক, কাজেকাজেই, মেয়েরাও উপজাতির তালিকাভুক্ত হ'তে পারতো এবং হ'তোও। কিন্তু বিবাহিতা নারীদের গোষ্ঠী-নাম নির্ধারণ নিয়ে কিছুটা গোলযোগের সৃষ্টি হ'তো। নিজের গোষ্ঠীর লোক ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর লোককে বিয়ে করা যতদিন মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, ততদিন এই সমস্যা উপস্থিত হতে পারেনি। আর বহুদিন যাবৎ মেয়েদের পক্ষে গোষ্ঠীর ভেতরের তুলনায় বাইরে বিয়ে করা রীতিমত কঠিন ব্যাপারই ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'জেন্তিস্ এনাপ্‌ সিয়ো' (গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে) ছিল ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার। পারিতোষিক হিসেবেই এই অধিকার লাভ সম্ভব হ'তো।......কিন্তু অতি প্রাচীন যুগে উপজাতির বাইরে যখন এইরূপ কোন বিয়ে-সাদি হ'তো তখন স্ত্রীকে নিশ্চয়ই স্বামীর উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হ'তো। প্রাচীন বিবাহ-প্রথায় নারী নিজের জাত-পাঁত ত্যাগ করে যে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপজাতির আইনগত ও ধর্মীয় বাঁধনাদির অন্তর্ভুক্ত হ'বে এর চেয়ে নিশ্চয়তর আর কি হ'তে পারে? সকলেই জানে যে, বিবাহিতা নারী নিজের গোষ্ঠীর সদস্যদের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং সে নিজের ধন-সম্পত্তি স্ব-গোষ্ঠীর লোকজনের

*মমসেন্। রোমিশে ফোর্শুঙ্গেন্, বার্লিন, ১৮৬৪-৭৮।

নামে উইল করতেও পারে না। পক্ষান্তরে, সে স্বামী ও নিজের ছেলেমেয়ে, আর স্বামীর গোষ্ঠির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে উত্তারিকারের অধিকার ভোগ করে থাকে। স্বামী যখন স্ত্রীকে নিজের পরিবারের পোষ্যরূপে গ্রহণ করে তখন স্ত্রীই বা কেমন করে স্বামীর গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকতে পারে ?"

কাজেই মমসেনের মতে, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মেয়েরা প্রথমত কেবলমাত্র গোষ্ঠির ভেতরেই স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারতো। সেইজন্য তাঁর মতে, বহি-বিবাহের পরিবর্তে অন্ত-বিবাহই রোমানগোষ্ঠীর দস্তুর ছিল। এই অভিমত অন্য সমস্ত লোকের অভিমতের বিরোধী হ'লেও, ইহা সম্পূর্ণরূপে না হ'লেও প্রধানত, লিভি-লিখিত গ্রন্থের (৩৯ খণ্ড, ১৯ অধ্যায়) এক সংশয়-পূর্ণ অনুচ্ছেদকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। লিভির গ্রন্থে লেখা হয় যে, রোম শহর প্রতিষ্ঠার ৫৬৮ বছর পর অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৮৬ সালে রোমের সেনেট এই মর্মে এক ডিক্রি জারি করে যে, ফেসেনিয়া হিস্পালা নিজের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে, সে সম্পত্তি কমাতে পারবে, গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করতে পারবে, নিজের অভিভাবকও মনোনীত করতে পারবে। ধরে নিতে হবে, তার পরলোকগত স্বামী যেন উইল করে তাকে এই ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছে। হিস্পালা ইচ্ছে করলে কোন স্বাধীন নাগরিককে পতিরূপে বরণ করতে পারবে। তাকে বিয়ে করলে কোন পুরুষকে কোনরূপ বদনাম বা অপযশের ভাগী হ'তে হ'বে না বা তার এই কাজ অপরাধরূপেও গণ্য হ'বে না।

এখানে বেশ বোঝা যায় যে, ফেসেনিয়া নাম্নী এক স্বাধীনতা-প্রাপ্তা গোলাম-নারী গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করার অধিকার লাভ করে। নিঃসন্দেহে আরো বোঝা যায় যে, লিভির এই লেখা অনুসারে স্বামী উইল করে তার মৃত্যুর পর স্ত্রীকে গোষ্ঠির বাইরে বিয়ে করার অধিকারও দান করতে পারতো। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য—কোন্ গোষ্ঠির ?

মমসেনের আন্দাজ অনুসারে নারীকে যদি তার নিজস্ব গোষ্ঠির মধ্যেই বিয়ে করতে বাধ্য হ'তে হ'তো তা'হলে বিয়ের পরেও তাকে নিজ গোষ্ঠির ভেতরেই থাকতে হ'তো। কিন্তু এখানে গোষ্ঠির যে আন্তর্বিবাহী স্বরূপ ধরা হয় তা রীতি-মত প্রমাণ করা চাই। দ্বিতীয়ত, নারীকে যদি স্ব-গোষ্ঠির ভেতরেই বিয়ে করতে হয়, তাহ'লে পুরুষের পক্ষেও এইরকম করা ছাড়া উপায় ছিল না। অন্যথায় তার ভাগ্যে স্ত্রী-লাভ ঘটে উঠ্তো না মোটেই। কাজে-কাজেই, আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই যে পুরুষ উইল করে স্ত্রীকে এমন একটা অধিকার দিতে

পারতো যে-অধিকার তার নিজের ছিল না, বা নিজেও সেইরূপ অধিকার লাভ করতে পারতো না। এখানে স্পষ্ট আইনের অসঙ্গতি এসে পড়ে। মমসেন্ নিজেও এই অসঙ্গতি বুঝতে পেরে নিম্নরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, "গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ের জন্য কেবলমাত্র অধিকার-প্রাপ্ত লোকের অনুমতি নিলেই চল্‌তো না; গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যের মত নওয়ার দরকার হ'তো। মমসেন এখানেও চরম দুঃসাহসের পরিচয় দেন। দ্বিতীয়ত, ইহা লিপি-লিখিত অনুশাসনেরও রীতিমতো বিরোধিতা করে। সেনেট্ ফেসেনিয়াকে তার স্বামীর পরিবর্তে বা তার প্রতিনিধি হিসেবেই এই অধিকার দান করে। তার স্বামী তাকে যতটুকু অধিকার দিতে পারতো, তার কিছু কমও নয়, বা বেশিও নয়, সেনেট খোলাখুলিভাবে সেই রকম অধিকারই দেয়। সেনেট কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে সকল-প্রকার বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত পরিপূর্ণ ক্ষমতাই দান করে; ফলে, সে যদি সত্যসত্যই ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায় তাহ'লে তার নতুন স্বামীকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হ'বে না। ফেসেনিয়াকে যাতে কোনরকম অসুবিধে ভোগ করতে না-হয় সে জন্য সেনেট বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কন্সাল-প্রিটর প্রভৃতি কর্মচারীর উপর রীতিমত নির্দেশ জারি করে। কাজেই মমসেনের অনুমান সকল দিক থেকেই অচল মনে হয়।

আবার ধরা যাক, নারী নিজের গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত থেকে অপর গোষ্ঠীর লোককে বিয়ে করে। তা হ'লে পূর্বোক্ত অনুশাসন অনুসারে, পুরুষ তার স্ত্রীকে তার নিজের গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করার অধিকার দিতে পারতো অর্থাৎ সে যে গোষ্ঠীর সদস্য নয় সেই গোষ্ঠীর অর্থাৎ ভিন্ন গোষ্ঠীর কাজ-কর্ম সম্পর্কে ব্যবস্থা করার অধিকারী ছিল এইরকম ধারণা করতে হয়। মোটের উপর, মতবাদটা এমনই অসঙ্গতিপূর্ণ যে, এ-নিয়ে সময় কাটানো আদৌ যুক্তি-যুক্ত নয়।

কাজেই, এখন অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, প্রথম বিয়ের বেলায়, নারী ভিন্ গোষ্ঠীর লোককে বিয়ে করে সটান স্বামীর গোষ্ঠীতে ঢুকে পড়ে। মেয়েরা যখন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করে, অবস্থাটা তখন এইরকমই ছিল, মমসেন নিজেও তা স্বীকার করেন। ল্যাঠাটা যে এখন চুকে গেল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিয়ের দরুণ নিজের গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে নতুন গোষ্ঠীতে সে বিশেষ স্থান অধিকার করে। সে এখন গোষ্ঠীর সদস্য বটে কিন্তু তার সঙ্গে কারুর শোণিত-সম্পর্ক নাই; যে-ভাবে তাকে গোষ্ঠী

সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়, তাতে গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ে করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়া হয়, যেহেতু সে বিয়ে করে সবেমাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া তাকে গোষ্ঠীর বিয়ের গ্রুপেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তির অর্থাৎ একজন গোষ্ঠী সদস্যেরই হিস্যা সে পায়। সম্পত্তি যখন গোষ্ঠীর ভেতরেই রাখতে হ'বে, তখন স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন লোকের পরিবর্তে স্বামীর গোষ্ঠীরই কোন লোককে বিয়ে করা ছাড়া আর কি স্বাভাবিক হ'তে পারে? কিন্তু যদি কোন ব্যতিক্রম ঘটাতে হয়, তাহ'লে, সম্পত্তি দেনে-ওয়ালা প্রথম স্বামী ছাড়া অন্য কোন লোক কি তাকে এই ক্ষমতা দিতে পারে? যে মুহূর্তে স্বামী উইল করে তার সম্পত্তির অংশবিশেষ পত্নীকে অর্পণ করে আর এই সঙ্গে বিয়ে বা বিয়ে করার দরুণ এই অংশ অন্য কোন গোষ্ঠীতে হস্তান্তরিত করার অধিকারও পত্নীকে দান করে, তখন পর্যন্ত স্বামী এই সম্পত্তির ষোলআনা হকদার। কাজেই, এখানে বুঝতে হয়, সে নিজের সম্পত্তিরই হেস্তনেস্ত করছে। নারীর নিজের আর তার স্বামীর গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্কের দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে দেখা যায়, স্বামীই স্বেচ্ছা-মূলক কার্য—বিবাহ দ্বারা তাকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই আবার নতুন বিয়ে করে এই গোষ্ঠী ত্যাগের অধিকারও একমাত্র স্বামীই দিতে পারে। এক কথায় বলতে গেলে, 'আন্তর্বিবাহী রোমান গোষ্ঠীর' এই আজগুবি ধ্যানধারণাটা বিসর্জন দিয়ে আমরা যদি সোজাসুজি মর্গ্যানের সঙ্গে একমত হ'য়ে বহি-বিবাহই রোমান গোষ্ঠীর দস্তুর বলে ধারণা করি তাহ'লে ব্যাপারটা জলের মতই সোজা ও স্বাভাবিক দাঁড়িয়ে যাবে।

সর্বশেষে আরো একটা মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। খুব বেশিসংখ্যক পণ্ডিত এই মতবাদটা নির্ভুল বলে মেনে নিয়েছেন। এঁদের মত অনুসারে, "স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলাম তরুণীরা বিশেষ অনুমতি ছাড়া গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করতে পারতো না বা পারিবারিক অধিকারের সামান্য-কিছু ক্ষতি করেও গোষ্ঠী ত্যাগ করতে পারতো না।" * এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহ'লে লিভির বাক্য স্বাধীন রোমান মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। আর গোষ্ঠীর মধ্যে তারা বিয়ে করতে বাধ্য ছিল এমন কোন যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

* ল্যাং, রোমান পুরাবৃত্ত, বার্লিন, ১৮৫৬, প্রথম খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ।

"এনুপ্‌সিও জেন্তিস্‌" (গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে) শব্দটা এই একটা মাত্র অনুচ্ছেদ ছাড়া সমগ্র রোমান-সাহিত্যের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। "এনুবেরে" (বহির্বিবাহ) শব্দটাও লিভির গ্রন্থে মাত্র তিন স্থানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু গোষ্ঠী সম্বন্ধে শব্দটা উল্লেখ করা হয়নি মোটেই। রোমান মেয়েরা গোষ্ঠির ভেতরেই বিয়ে করতো, এই আজগুবি মতবাদটা লিভির গ্রন্থের এই একটা মাত্র উক্তির উপর নির্ভর করেই দাঁড় করান হয়। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, উক্তিটা যদি স্বাধীনতা-প্রাপ্তা গোলাম নারীদের উপর প্রযুক্ত হয়, তাহ'লে স্বাধীন মেয়েদের সম্বন্ধে তা কোন-কিছুই বল্‌তে সক্ষম নয়। আর যদি স্বাধীন মেয়েদের সম্বন্ধেও এই উক্তি সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহ'লে ব্যাপার দাঁড়ায় এই রকম যে, স্বাধীন মেয়েরা সাধারণত গোষ্ঠির বাইরেই বিয়ে করতো। বিয়ের পর তারা স্বামীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'তো। এতে মমসেনের মতবাদ অসত্য আর মর্গ্যানের মতবাদটাই সত্য প্রমাণিত হয়।

রোম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় তিন শত বছর পরেও গোষ্ঠীর বাঁধনগুলো এমন শক্ত ছিল যে, ফেবিয়ান নামক "পাত্রিসিয়ান" (কুলীন ও ধনী) গোষ্ঠীটা সেনেটের অনুমতি নিয়ে পার্শ্ববর্তী ভেই শহরের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অভিযান চালায়। ৩০৬ জন ফেবিয়ান্‌ যুদ্ধযাত্রা করে; কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের ফলে সকলেই প্রাণ হারায়। একজন মাত্র বালক জীবিত ছিল। সে-ই গোষ্ঠীর বংশ রক্ষা করে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, দশ-দশটা গোষ্ঠী নিয়ে এক-একটা ফ্রেত্রী গঠন করা হ'ত। রোমে ফ্রেত্রীকে বলা হ'তো "কুরিয়া"। গ্রীক ফ্রেত্রীর তুলনায় এইগুলো অধিকতর শক্তিশালী ছিল। প্রত্যেক কুরিয়ার নিজস্ব পাল-পার্বণ, পবিত্র প্রতীক-সমূহ ও পুরোহিত ছিল। প্রত্যেক কুরিয়ার পুরোহিতরা "কলেজ" অর্থাৎ পুরোহিত-সঙ্ঘ গড়ে তোলে। দশটা কুরিয়া নিয়ে একটা উপজাতি গড়া হয়। এই উপজাতির প্রথমত অন্যান্য ল্যাটিন উপজাতির মত নির্বাচিত অধ্যক্ষ সমর-নায়ক ও প্রধান পুরোহিত ছিল। তিনটি উপজাতি একত্রে "পোপুলুস রোমানুস" বা রোমান জাতিরূপে পরিচিত ছিল।

কাজে কাজেই, কেবলমাত্র গোষ্ঠী-সদস্যগণ, এইজন্য কুরিয়া ও উপজাতির সদস্যরা রোমান জাতির অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারতো। এই জাতির প্রথম রাষ্ট্র-কাঠামোটা নিম্নরূপ ছিল। সরকারী কাজকর্ম সেনেট কর্তৃক পরিচালিত হ'তো। ৩০০ গোষ্ঠির গোষ্ঠীপতিদের নিয়ে সেনেট-সভা গঠিত ছিল বলে নীবুর প্রথম যে মত প্রকাশ করেন, তা অভ্রান্ত সত্য। গোষ্ঠীবৃদ্ধদের নিয়েই সেনেট-সভা গঠিত

ছিল। গোষ্ঠীবৃদ্ধদের লোকে "পাত্রে", পিতা বা জনক-স্থানীয় মনে করতো। এইজন্য এদের পরিষদকে বলা হ'তো সেনেট অর্থাৎ বৃদ্ধ-সভা বা পিতৃ পরিষৎ (সেনেক্স শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, এই শব্দ থেকেই সেনেট শব্দের উৎপত্তি) গোষ্ঠীপতি একই পরিবার থেকে বংশানুক্রমিকভাবে নির্বাচিত হ'তো। এইভাবে প্রথম বংশগত অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই পরিবারগুলো পরস্পরকে "পাত্রিসিয়ান" বলে পরিচয় দেয় এবং সেনেট-সভায় প্রবেশাধিকার থেকে সরকারী চাকরি নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। লোকে এই দাবি মেনে নিতে আরম্ভ করে, পরে ক্রমে ইহা বাস্তব অধিকারে রূপান্তরিত হয়। এ সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে যে, রোমুলুস্ প্রথম সেনেটের সভ্যদের ও তাদের বংশধরদের অভিজাত পদবী ও তার বিশেষ অধিকারগুলো প্রদান করেন। সেনেট সভা এথেনীয় "বুলে" পরিষদের মত নানাবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, বিশেষত, আইনগুলোর বেলায় সেনেট প্রাথমিক আলোচনা চালাতে পারতো। এই সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল "কোমেসিয়া কুরিয়াতা" (কুরিয়া-পরিষদ) নামে অভিহিত গণপরিষদ। সমগ্র জনসাধারণ কুরিয়ায় দলবদ্ধ হয়ে এখানে সমবেত হ'তো, প্রত্যেক কুরিয়ার গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিরাও স্থান পেত। চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ত্রিশটি কুরিয়ার প্রত্যেকটি এক-একটি ভোট দিতে পারতো। কুরিয়া পরিষদ সমস্ত আইনের প্রস্তাব অনুমোদন অথবা নামঞ্জুর করতে পারতো; রেক্স (তথাকথিত রাজা) সহ সমস্ত পদস্থ অফিসারও এই পরিষদকর্তৃক নির্বাচিত হ'তো। কুরিয়া সভা যুদ্ধ ঘোষণা করতো (শান্তি স্থাপনের অধিকার কিন্তু সেনেটের ছিল) এবং সর্বোচ্চ আদালতরূপে রোমান নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ এবং এই ধরণের সমস্ত মামলার আপীলের শুনানী গ্রহণ করে চরম রায় দানেরও অধিকারী ছিল। সেনেট ও গণ-পরিষদ ছাড়া রোমে রেক্স্ নামে আরো একটা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। একে গ্রীকদের "বাসিলিউসের" জুড়িদাররূপে বিবেচনা করা চলে। তাই বলে মম্‌সেন "রেক্স্‌কে" ষোল আনা ক্ষমতাযুক্ত রাজা বলে যে মতিভ্রমের পরিচয় দেন (১) তার সমর্থন করা যায় না মোটেই।

(১) ল্যাটিন 'রেক্স' কেল্টিক-আইরিশ 'রিথ' (উপজাতীয় সর্দার) এবং গথিক রাইথসের জুড়িদার শব্দ। শব্দটি আমাদের 'ফুর্স্ট্' (ইংরেজী ফার্স্ট্ ও ডেনিশ (ফোর্স্ট্) শব্দের মত যে প্রথমে গোষ্ঠীপতি বা উপজাতীয় সর্দারকে বুঝাতো তা নিয়ে বর্ণিত বাস্তব তথ্য থেকে বেশ বোঝা যায়। গথদের মধ্যে চতুর্থ শতাব্দীতেই পরবর্তী যুগের রাজাদের বেলায় প্রযোজ্য একটি শব্দ প্রচলিত ছিল, যথা, একটি গোটা জাতির সামরিক সর্দারকে বলা হোত থিউডান্স্। উল্‌ফিলাস কর্তৃক অনূদিত

"রেক্স্" সমর-নেতা, শ্রেষ্ঠ পুরোহিত এবং কতকগুলো আদালতের প্রেসিডেন্টও ছিল। কিন্তু এর কোন বে-সামরিক কর্তৃত্বাধিকার ছিল না। নাগরিকদের ধন-প্রাণের উপরেও তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। তবে লড়াইয়ের সর্দার হিসাবে শাস্তি-বিধানের জন্য বা আদালতের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শাসন-তান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে মাঝে মাঝে তিনি নাগরিকদের ধন-প্রাণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরেও হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। রেক্স্ পদ বংশানুক্রমিক ছিল না মোটেই; পক্ষান্তরে, সম্ভবত পূর্বতন রেক্সের মনোনয়ন অনুসারে এঁকে প্রথমত 'কুরিয়া সভা' কর্তৃক নির্বাচিত হতে হ'তো; দ্বিতীয়ত, পরিষদ পরে বিশেষ আড়ম্বরের মধ্যে এঁকে অভিষিক্ত করতো। রেক্সকে পদচ্যুত করাও যে সম্ভব ছিল, তা তার্কুইনিস সুপার্বুসের দুর্ভাগ্য থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়।

বীরযুগের গ্রীকদের মত তথাকথিত রাজাদের আমলে রোমানরা সামরিক গণতন্ত্রের অধীনে বাস করতো। এই গণতন্ত্র ছিল গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী ও উপজাতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিন প্রতিষ্ঠান থেকেই সামরিক গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। রোমান কুরিয়া ও উপজাতি কতকাংশে কৃত্রিম দল বা শ্রেণী হ'লেও সমাজের আদিম ও খাঁটি আদর্শ অনুসারেই গড়ে উঠে। মান্ধাতার আমলের সমাজ-ব্যবস্থা ও আদর্শ থেকেই এইগুলোর উৎপত্তি হয়। আর রোমান সমাজ এই ধরণের আদিম মানব সমাজ দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে গঠিত "প্যাট্রি-সিয়ান" অভিজাত বংশগুলো দিন দিন বেড়ে চলে। রেক্স্রাও তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। তা সত্বেও গোষ্ঠী-শাসনের মূলধারাটা অব্যাহত থাকে।

দেশ জয়ের ফলে রোম ও রোমান এলাকা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। লোক-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। বিদেশী ঔপনিবেশিকদের আগমন আর অধিকৃত দেশগুলোর অধিবাসীরাই এই লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। অধিকৃত দেশগুলোর অধিকাংশ ছিল বিভিন্ন ল্যাটিন ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা। রাষ্ট্রের এই সমস্ত নতুন প্রজা (আশ্রিতদের এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে) ছিল প্রাচীন গোষ্ঠী, কুরিয়া ও উপজাতি-সমূহের বাইরের লোক। কাজেই এরা "পোপুলস রোমুনুস্" বা খাঁটি রোমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এরা সকলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

বাইবেল গ্রন্থে আর্টাজারেক্সেস্ বা হিরোদকে যখনই 'রেক্স' বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'থিউডান্স' এবং সম্রাট তাইবিরিয়াসের রাজ্যকে 'রেইকী'র পরিবর্তে বলা হয়েছে থিউডিনেশাস। গথিক 'থিউডান্স' অর্থাৎ রাজার অর্থে আমরা ভুল অনুবাদ করে বসি, 'থিউডারাইথস', 'থিউডোরিক' অর্থাৎ 'ডারেট্রিক,' এখানে উভয় শব্দ একত্রে সম্মিলিত হয়েছে। —এঙ্গেল্স।

অধিকারী ও জমিজমার মালিক হ'তে পারতো, খাজনা দিত এবং সামরিক দায়িত্বও পালন করতো ; কিন্তু এরা কোন সরকারী চাকরিতে ভর্তি হতে পারতো না, "কুরিয়া" সভাতেও এদের প্রবেশাধিকার ছিল না, অধিকৃত খাস মহলের অংশ থেকেও এরা বঞ্চিত ছিল। সমস্ত সরকারী অধিকার থেকেও এরা ছিল বঞ্চিত। এরা "প্লেব্‌স্" শ্রেণী নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু এদের ক্রম-বর্ধমান সংখ্যা-শক্তি, সামরিক ট্রেনিং আর অস্ত্র-শস্ত্র তাঁবে রাখার অধিকারের ফলে, এরা সাবেক পোপুলুস সমাজের—যে সমাজ বাইরে থেকে লোক নেওয়ার পথ কঠোরভাবে রুদ্ধ করে দেয়—তার ভীতিস্থলে পরিণত হয়। জমিজমা সম্পর্কে "পোপুলুস" আর "প্লেব্‌স" সমান হিস্যার অধিকারী ছিল। কিন্তু রোমের শিল্প-বাণিজ্য সম্পদ তখনো বিশেষ বিকাশ-প্রাপ্ত না হ'লেও অধিকাংশই প্লেব্‌সদের করায়ত্ত ছিল মনে হয়।

রোমের আদিম ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক আখ্যায়িকামূলক। কাজেই কুজ্ঝটিকার অন্তরালে এই ইতিকথাকে সমাচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। পরবর্তী যুগের আইন ঘেঁসা গ্রন্থকারদের ভাষ্য ও রিপোর্টগুলোই এ-সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র তথ্য ও উৎস। কিন্তু এঁরা সব কিছুরই ব্যবহারিক তাৎপর্যের সন্ধান করতে গিয়ে অনর্থক যুক্তিজালের সৃষ্টি ক'রে এই ধোঁয়াটে আঁধারকে আরো গাঢ় ক'রে তুলেছে। কাজেই, যে বিপ্লবের ফলে রোমের গোষ্ঠী-কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে তা কখন, কি ভাবে আর কোন্ উপলক্ষে ঘটে তা নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব। এ-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সত্য এই যে, "প্লেবস্" ও "পোপুলুসের" মধ্যে সংঘর্ষের ভেতরেই এই বিপ্লবের কারণ লুক্কায়িত ছিল।

সার্ভিয়ুস্ তুলিয়ুস নামক "রেক্স্" বা রাজা গ্রীক আদর্শ, বিশেষত, সোলনের আদর্শ অনুসারে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। নয়া শাসনতন্ত্রে "পোপুলুস" ও "প্লেবস" নির্বিশেষে জনগণের এক নতুন পরিষদ কায়েম করা হয়। একমাত্র সামরিক দায়িত্ব পালনই ছিল নতুন পরিষদে আসন লাভের একমাত্র উপায়। সম্পত্তির ভিত্তিতে অস্ত্রধারণে সক্ষম সমস্ত পুরুষকে ছয়টা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পাঁচ শ্রেণীর প্রত্যেকটির সর্বনিম্ন সম্পত্তির বরাদ্দ ধরা হয় যথাক্রমে (১) ১০০,০০০ গাধা, (২) ৭৫,০০০ গাধা, (৩) ৫০,০০০ গাধা (৪) ২৫,০০০ গাধা (৫) ১১,০০০ গাধা। দ্যুরো দ্যলা মাল্লের মতে এই সমস্ত বরাদ্দের মূল্য যথাক্রমে ১৪,০০০, ১০,৫০০, ৭,০০০, ও ১,৫৭০ মার্ক! ষষ্ঠ শ্রেণীটি ছিল "প্রোলেটারিয়ান্" বা শ্রমজীবিশ্রেণী। এদের প্রত্যেকের সম্পত্তি ১১,০০০টা গাধা বা ১,৫৭০

'মার্কের ও কৃম। এদের সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হ'তো না। খাজনা দেওয়ার দায় থেকেও এরা অব্যাহতি লাভ করে। নতুন গণ-পরিষদের নাম দেওয়া হয় "কোমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াতা"। বিভিন্ন সেঞ্চুরি নিয়ে এটা গড়া হয়। সামরিক শ্রেণী-বিন্যাস অনুসারে নাগরিকরা এই পরিষদে যোগদান করে। একশো সিপাই নিয়ে এক-একটা সেঞ্চুরি গঠন করা হয়। এই সমস্ত সেঞ্চুরিতে বিভক্ত হয়ে পরিষদে যোগদানই ছিল দস্তুর। প্রত্যেক সেঞ্চুরী এক-একটা ভোটের অধিকারী ছিল। যুদ্ধ-হাঙ্গামার সময় প্রথম শ্রেণী ৮০ সেঞ্চুরী, দ্বিতীয় শ্রেণী ১২ সেঞ্চুরী, তৃতীয় শ্রেণার ২০ সেঞ্চুরী, চতুর্থ শ্রেণী ২২ সেঞ্চুরি এবং পঞ্চম শ্রেণী ৩০ সেঞ্চুরি সেনা জোগাত। সম্পত্তির দিক থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীকে এক সেঞ্চুরী সেনা জোগাতে হ'তো। তাছাড়া, ধনী শ্রেষ্ঠরা ১৭ সেঞ্চুরি অশ্বারোহী সৈন্যেরাও জোগাত। কাজেই দেখা যায়, রোমে সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল মোট ১৯৩টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য ৯৭টি ভোটের প্রয়োজন। অশ্বারোহীরা ও প্রথম শ্রেণী একত্রে ৯৮টি ভোটের অধিকারী ছিল। কাজেই, এরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি করতে পারতো। এই দু'দল একমত হ'লে অপর কোন দলকে জিজ্ঞাসা না করেই এরা শাসনকার্য চালিয়ে রোমের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো।

বিভিন্ন শতক (সেঞ্চুরি) নিয়ে গঠিত এই নতুন পরিষদ প্রাচীন কুরিয়া-পরিষদের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। এর হাতে নামমাত্র কয়েকটা বিশেষ অধিকার থাকে। এথেন্সের মত রোমেও কুরিয়া এবং কুরিয়া-গঠনকারী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র বে-সরকারী ও ধর্মীয় সভা-সমিতিতে পরিণত হয়। কুরিয়া ও গোষ্ঠী এইভাবে দীর্ঘকাল টিকে থাকলেও "কুরিয়া" পরিষদ কিন্তু শীঘ্রই অচল হয়ে পড়ে। রক্তের বাঁধনে গড়া প্রাচীন তিনটে উপজাতি থেকে রাষ্ট্রকে রেহাই দেওয়ার জন্য শহরকে চারটে সমান অংশে ভাগ করে এক-এক কোয়ার্টারে এক একটা স্থানীয় বা এলাকাগত উপজাতি পত্তন করা হয়। প্রত্যেক উপজাতির কতকগুলো রাজনৈতিক অধিকার ছিল।

কাজেই দেখা যায়, রোম শহরেও তথাকথিত রাজতন্ত্র প্রত্যাহারের পূর্বেই ব্যক্তিগত রক্তের বাঁধনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার স্থানে এলাকাগত বিভাগ আর ধন-সম্পত্তির পার্থক্যের ভিত্তির উপরে নতুন ও পুরো রাষ্ট্র-কাঠামো স্থাপন করা হয়। এখানে রাষ্ট্র-শক্তি সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য নাগরিক সঙ্ঘরূপে আত্ম প্রকাশ করে। এই রাষ্ট্র-শক্তি কেবলমাত্র গোলামদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত ছিল না; সৈন্যবিভাগের চাকরি, তথা অস্ত্রশস্ত্র

ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত তথাকথিত "প্রোলেটারিয়ান্" অর্থাৎ শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধেও ইহা সমান প্রযুক্ত ছিল।

সর্বশেষ রাজা (বা রেক্স) তার্কুইনিউস্ সুপার্বুস্ খাঁটি রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। কাজেই, একে নির্বাসিত ক'রে রাজপদের স্থলে সমান ক্ষমতার দু'জন সমর-নায়ক (কন্সাল) নিয়োগ করা হয় (ইয়োকোয়াদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়)—নয়া শাসনতন্ত্র এখানে আর এক ধাপ অগ্রসর অবস্থাতেই দেখা যায়। রোমে গণতন্ত্রের পূর্ণ ইতিহাস এই নতুন শাসনতন্ত্রকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। সরকারী চাকরি ও খাসমহলের হিস্যা গ্রহণের জন্য পাত্রিসিয়ান ও প্লেব্‌দের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা, শেষ পর্যন্ত পাত্রিসিয়ানদের (অভিজাতদের) ভূমি ও পুঁজির মালিক নূতন বণিক শ্রেণীর মধ্যে মিশে যাওয়া—সব-কিছুই নতুন রাষ্ট্র-কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যেই ঘটে। সামরিক দায়িত্ব পালনে সর্বস্বান্ত কৃষকদের জমি-জমা দখল করে নতুন বড়লোকেরা বড় বড় ভূমিখণ্ড চাষের জন্য ক্রমাগত গোলাম নিয়োগ করতে থাকে। ইতালি ক্রমে জনবিরল দেশে পরিণত হয়। নতুন বড় লোকেরা এইভাবে সম্রাটদের অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কার ত করেই, উপরন্তু, জার্মান বর্বরদের ইতালি অধিকারের পটভূমি রচনাও তাদেরই কীর্তি।

সপ্তম অধ্যায়

কেল্ট ও জার্মাণদের মধ্যে গোষ্ঠী প্রথা

বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য ও বর্বর জাতিদের অধিকাংশের মধ্যে গোষ্ঠি-প্রথা এখনো অল্প-বিস্তর খাঁটি অবস্থায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এশিয়ার সভ্য জাতিগুলোর প্রাচীন ইতিহাসেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মিলে। স্থানাভাববশত এ-সম্বন্ধে এখানে আলোচনা চালানো সম্ভব নয়। গোষ্ঠি প্রতিষ্ঠান বা উহার নিদর্শন সর্বত্রই চোখে পড়ে। এ-সম্বন্ধে দু-চারটে দৃষ্টান্তের অবতারণা করলেই যথেষ্ট বিবেচিত হ'বে। গোষ্ঠী সম্বন্ধে মানুষের যখন যৎসামান্ত কাণ্ড-জ্ঞানেরও অভাব ছিল, তখন ম্যাক্‌লেনানই গোষ্ঠী-প্রথার অস্তিত্ব ও নিখুঁতভাবে এর মোটামুটি আভাষ প্রদান করেন। কিন্তু ম্যাক্‌লেনান এজন্ত সব চেয়ে বেশি শ্রম স্বীকার করেও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হয়েছেন। কালমুক, সার্কেসিয়ান্ ও সামোয়েদ্ এবং বারালীস, মাগার ও মণিপুরী এই তিনটি ভারতীয় জাতির গোষ্ঠী-প্রথা সম্বন্ধেও বর্ণনা করেছেন। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পূর্বে এম্. কোভালেভ্‌স্কী পিশাভ, খেভ্‌সুর ও স্বনেসিয়ান ও ককেসিয়ার অন্তান্ত উপজাতির মধ্যে গোষ্ঠী-প্রথা আবিষ্কার ও বর্ণনাও করেছেন। বর্তমানে আমরা কেল্ট ও জার্মানদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রথা সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করবো।

প্রাচীনতম যে-সমস্ত কেল্টিক আইন-কানুন আমাদের যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে সে-গুলোর মধ্যে আমরা গোষ্ঠী-প্রথার জীবন্ত সাক্ষাৎ পাই। আয়র্ল্যাণ্ডে ইংরাজরা জোর করে গোষ্ঠীপ্রথা ভেঙে দিলেও ইহা জাতির মানসক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে সহজাত প্রবৃত্তিরূপে এখানে টিকে আছে। স্কটল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই প্রথা অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই থাকে। এখানেও ইংরেজদের অস্ত্রশস্ত্র ও আইন-আদালতের কবলে গোষ্ঠীপ্রথা ভেঙে পড়ে।

ইংরেজ-অধিকারের কয়েক শতাব্দী পূর্বে, একাদশ শতাব্দীর আগেই, ওয়েলসের প্রাচীন আইন-কানুনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে এবং পূর্বতন সর্বজনীন প্রথার প্রতীক হিসেবে গ্রামকে গ্রাম একত্রে যৌথভাবে চাষ-আবাদ চালানোর দৃষ্টান্ত এখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব চাষ-আবাদের জন্ত পাঁচ একর পৃথক জমি থাকে। আরেক খণ্ড জমি যৌথভাবে চষা

হয়, উৎপন্ন ফসল ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। সময়াভাববশত (আমার নোট-গুলো নেয়া হয় ১৮৬৯ সন থেকে) ওয়েলসের আইন-কানুন সম্বন্ধে পুনরায় গবেষণা করা আমার পক্ষে সম্ভব না হলেও এবং এই সমস্ত আইন-কানুন থেকে সরাসরি কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই সমস্ত গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ যে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর উপবিভাগের প্রতিনিধি-স্থানীয়, একই ধরণের আইরিশ ও স্কট নজিরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, সে-সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না। ওয়েল্‌স্‌ ও আইরিস সূত্র থেকে যা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে তা হচ্ছে এই যে, একাদশ শতাব্দীতেও কেল্টদের মধ্যে একনিষ্ঠ-বিয়ে জোড়-পরিবারকে স্থানচ্যুত করতে পারেন। ওয়েল্‌সে সাত বৎসর পার না হ'লে বিয়ের বাঁধন অবিচ্ছেদ্যরূপে অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদের নোটিশ জারির অতীতরূপে গণ্য হতে পারতো না। এই সাত বছর পার হ'তে মাত্র তিন রাত্রি বাকি থাকলেও স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারতো। অতঃপর সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হতো। স্ত্রী বেঁটে দেয়, স্বামীকে তাই নিয়ে খুশি থাকতে হয়। নির্দিষ্ট এবং হাস্যকর বিধি অনুসারে আসবাবপত্রের ভাগাভাগি হয়। পুরুষের ইচ্ছায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হলে বৌকে তার যৌতুক এবং আরও কতকগুলো জিনিস ফিরিয়ে দিতে হয়। নারীর ইচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে সে কম হিস্যা পায়। ছেলেদের সংখ্যা তিনটে থাকলে প্রথম ও শেষ ছেলেটা পড়ে পুরুষের ভাগে, আর নারীর ভাগে পড়ে মধ্যম ছেলেটা। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর নারী অপর স্বামী গ্রহণ করলেও প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলেই নারীকে ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী ছিল। নারী নতুন স্বামীর বিছানায় পদার্পণ করলেও উপায়ান্তর ছিল না; তাকে সোজা প্রথম স্বামীর অনুগমন করতে হ'তো। অপর পক্ষে, নর-নারী যদি একসঙ্গে সাত বছর বসবাস করে, তা'হলে আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হলেও তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে গণ্য হয়। বিয়ের আগে মেয়ের সতীত্ব ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না, তাদের কাছ থেকে সতীত্বের দাবিও করা হয় না। এ-সম্বন্ধে বিধি-নিষেধগুলো ছিল নিতান্ত খাম-খেয়ালি ধরণের—বুর্জোয়া নীতি-বোধের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। বিবাহিতা নারী ব্যভিচারিণী হ'লে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারে কিন্তু প্রহার একুনে তিনবারের বেশি হলেই স্বামীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। প্রহারের পর অপর কোন শাস্তি দেওয়া যায় না। "কারণ, এক অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করা চলে, দু'টো একসঙ্গে চালানো আইনসঙ্গত

ছিল না।" সম্পত্তির ও ঘর-সংসারের জিনিস প্রাপ্তির দাবি অব্যাহত রেখে নারী নানা অজুহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি করতে পারতো। এ-সম্বন্ধে সত্যসত্যই তার ব্যাপক অধিকার ছিল। স্বামীর নিশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, মাত্র এই কারণ দেখিয়ে বিয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করা চলতো। ওয়েল্‌সের গোষ্ঠী-সর্দার এবং রাজারাও প্রত্যেক বিবাহিত নারীর বিয়ের প্রথম রাত্রি ভোগের অধিকারী ছিল। রীতিমত সেলামি দিয়ে এই দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত। ওয়েল্‌সের এই সেলামি সম্পর্কে অনেক আইন-কানুন আছে। ওয়েল্‌সের স্মৃতিশাস্ত্রের এই সেলামি বা "গোব্‌র মের্থ," মধ্যযুগের "মার্খেতা" ফরাসী "মার্কেৎ" রীতিরই জুড়িদার। মেয়েরা গণ-পরিষদে ভোট দিতে পারতো। আয়র্ল্যাণ্ডেও একই অবস্থার প্রমাণ মিলে। সাময়িক বিয়ে হামেশাই ঘটতে দেখা যেত। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় মেয়েরা বেশ ভাল ক্ষতিপূরণ পেত। এ-সম্বন্ধে রীতিমত ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা ছিল। এমন-কি, ঘর-কন্নার কাজ-কর্মের জন্যও নারী রীতিমত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারতো। আয়র্ল্যাণ্ডে "প্রথমা স্ত্রীর" সঙ্গে আরও অনেক পত্নী একত্রে বসবাস করতে পারতো। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান আর জারজ সন্তানরা সমান হিস্যার অধিকারী হ'তো। যখন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিচার করতে বসি তখন আমরা এমন জোড়-পরিবারের সাক্ষাৎ পাই যার তুলনায় উত্তর-আমেরিকার বিবাহ-প্রথা কঠোরতরই মনে হয়। সিজারের আমলেও যে জাতির মধ্যে দলগত-বিয়ে রীতিমত প্রচলিত ছিল, একাদশ শতাব্দীতে সেই জাতির মধ্যে এই ধরণের প্রথা দেখে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণই দেখা যায় না।

আয়র্ল্যাণ্ডের গোষ্ঠীকে বলা হ'তো "সেপ্‌ট"; উপজাতি "ক্লেন" বা ক্ল্যান নামে অভিহিত হ'তো। আয়র্ল্যাণ্ডে গোষ্ঠী-প্রথার অস্তিত্ব কেবলমাত্র প্রাচীন আইরিশ স্মৃতি-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ নেই, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ আইনজ্ঞরাও তা রীতিমতভাবে প্রমাণ করে। গোষ্ঠীর অধিকৃত যৌথ জমিগুলো বৃটিশরাজের খাস-মহালে পরিণত করার জন্য এরা আয়র্ল্যাণ্ডে প্রেরিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আয়র্ল্যাণ্ডে জমি-জমা উপজাতি বা গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি ছিল। কোন কোন স্থানে গোষ্ঠীপতিরা কিছু জমি নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। গোষ্ঠীর কোন সদস্য মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে যখন কোন পরিবারের অবসান ঘটে তখন গোষ্ঠী-সর্দার বাদবাকি পরিবারগুলোর মধ্যে সমস্ত জমির নূতন ক'রে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে। জার্মানীতেও ঠিক এই একই ধরনের প্রথা বলবৎ ছিল। ৯০।৫০

বছর আগেও তথাকথিত রুন্দাল নামক যৌথ জমি-জমা হামেশাই চোখে পড়তো। জার্মান ভাষায় যৌথ জমিজমার নাম "রুন্দাল"। আজও দু-একটি রুন্দাল চোখে পড়ে। রুন্দালের চাষীরা বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে জমি-জমা ভোগ করে, আপন আপন জমির-খাজনা পৃথকভাবে পরিশোধ করে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে কিন্তু এই সমস্ত জমি ছিল গোষ্ঠীর যৌথসম্পত্তি। কিন্তু চাষীরা এখনও সমস্ত আবাদী ও পোড়ো-জমি একত্রিত করে। অতঃপর জমির গুণ অনুসারে সমস্ত জমি ভাগ করা হয়। এই সমস্ত ভাগকরা অংশকে জার্মানীর মোজেল তীরবর্তী লোকেরা "গেভানে" বলে। প্রত্যেকেই প্রত্যেক গেভানের অংশ ভোগ করে। জলাজমি ও চারণভূমি সকলে যৌথভাবে ভোগ করে। পঞ্চাশ বছর আগেও মধ্যে মধ্যে, এমন-কি, প্রত্যেক বছর নতুন ক'রে জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হ'তো। এইরূপ জমি ভাগাভাগির মানচিত্রে জার্মানীর মোজেল তীরবর্তী জনপদ বা হোস্ ভাল্ডের "গেহোফার শেফ্ট্" বা কিষাণ সমবায়ের কথাই মনে পড়ে। গোষ্ঠী-প্রথা আজও "ফ্যাক্‌সন্" বা দলাদলির মারফতে জীবিত আছে। আইরিশ চাষীরা হামেশাই নিজেদের নানা পার্টিতে বিভক্ত করে। আপাত-দৃষ্টিতে এই ভাগাভাগি অর্থহীন ও অসঙ্গতই মনে হয়। ইংরাজদের কাছে এ দুর্বোধ্য হেঁয়ালি ছাড়া অপর-কিছু নয়। বিরোধী দু'টো দল পরস্পর প্রতিযোগীরূপে উৎসবাদিতে মত্ত হওয়ার জন্যই এইরূপ ভাগাভাগি করে—ইংরেজের মনে এইরূপ ধারণাই জন্মে। এই ভাগাভাগি বা দলাদলি কিন্তু বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠী-প্রথারই কৃত্রিম পুনরোদ্বোধন, উহার পরবর্তী অনুকল্প, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গোষ্ঠীপ্রেরণাকে তাদের নিজস্ব ধরণে বজায় রাখারই অভিব্যক্তি। কতকগুলো জেলায় গোষ্ঠীর সদস্যরা পুরাতন এলাকায় এখনও ঘেঁষাঘেঁষিভাবে বাস করে। ১৮৩০ সন পর্যন্ত মোনাগান জেলার অধিকাংশ অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র চার রকম পারিবারিক নামের অস্তিত্ব ছিল অর্থাৎ তারা যে চার গোষ্ঠী বা উপজাতির বংশধর এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।*

* আয়র্ল্যাণ্ডে অল্প সময়ের জন্য বসবাসের সময়েই বেশ বুঝতে পারলাম পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এখনো কিভাবে গোষ্ঠীযুগের ভাবধারার মধ্যে বসবাস করে। চাষী প্রজারা জমিদারকে গোষ্ঠীপতি বলে মনে করে। সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে জমিজমার তত্ত্বাবধান জমিদারের কর্তব্যে পরিণত। চাষীরা খাজনা যোগায় নিশ্চয়ই কিন্তু বিপদের সময় জমিদার তাদের রক্ষা করবে এ দাবিও তারা রীতিমতভাবে করতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারাও গরিব প্রতিবেশীদের বিপদের সময় ও দারুণ অভাব-অভিযোগের সময় সাহায্য করতে বাধ্য। এইরূপ সাহায্য করা দান-খয়রাত নয়। ক্ল্যান্ বা গোষ্ঠীর গরিব লোকেরা অবস্থাপন্ন লোক বা গোষ্ঠীপতির নিকট এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির দাবি করতে সক্ষম। আইরিশ কৃষকদের আধুনিক

১৭৪৫ সনের বিদ্রোহ দমনের পর স্কটল্যাণ্ডের **গোষ্ঠী প্রথায় ভাঙন** ধরা সূচনা করে। গোষ্ঠী-প্রথায় ক্ল্যান প্রতিষ্ঠান কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা রীতিমত অনুসন্ধান ও গবেষণাসাপেক্ষ। তবে **ক্ল্যান** যে গোষ্ঠী-মণ্ডলী তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস-সাহিত্যে হাইল্যাণ্ড-ক্ল্যানের চিত্র আমাদের চোখের সুমুখে ভাসছে। মর্গ্যান এ-সম্বন্ধে লিখেন—

"ধরণ-ধারণ ও ভাবধারার দিক দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের ক্ল্যানগুলো গোষ্ঠী-প্রথার জলন্ত দৃষ্টান্তের মতই দণ্ডায়মান। জনগণের উপর গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাবপ্রতিপত্তিরও অপূর্ব নিদর্শন চোখে পড়ে।······ক্ল্যানে ক্ল্যানে ঝগড়া-বিবাদ ও রক্তের প্রতিহিংসা গ্রহণ, গোষ্ঠী-হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস, যৌথভাবে জমিজমা ভোগ-দখল, গোষ্ঠীপতির প্রতি ভক্তি ও গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা প্রভৃতির মধ্যে গোষ্ঠী-জীবনের স্বধর্মগুলোই চোখে পড়ে।···বংশানুক্রম চল্‌তো পুরুষের ধারায়। পুরুষের ছেলেমেয়েরা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়, নারীর সন্তানরা পিতার গোষ্ঠীর সামিলরূপে গণ্য হয়। তবে স্কটল্যাণ্ডে যে এক সময় জননী-বিধি প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিডের (Bede মত অনুসারে "পিক্ট" জাতির রাজবংশের মধ্যে জননী-বিধি প্রচলিত ছিল। ওয়েল্‌সের মত স্কচদের মধ্যেও একসময় পুনালুয়া বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কারণ মধ্য-যুগ পর্যন্ত ক্ল্যানের সর্দার বা রাজা বিবাহিতা নারীর প্রথম রাত্রি দাবি করে। সেলামি দিয়ে অবশ্য এই দাবি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত।

* * *

দেশত্যাগ বা বিচরণের যুগ পর্যন্ত জার্মানরা যে গোষ্ঠী-শাসনের আমলে বাস করে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান যুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বে তারা ডানিয়ুব, ভিশ্চুলা ও উত্তরের সাগরগুলোর মধ্যবর্তী জনপদ

বুর্জোয়া সম্পত্তির স্বরূপটা বোঝান যায় না ব'লে ধনবিজ্ঞান-সেবী ও আইনজীবীরা যে অভিযোগ করে থাকেন, তা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। সম্পত্তি ভোগের অধিকার থাকবে অথচ কর্তব্যের ঝুঁকি থাকবে না মোটেই, আইরিশম্যানদের মাথায় এই তত্ত্বটা মোটেই ঢুকতে চায় না। সাবেককালের গোষ্ঠী ধ্যান-ধারণা-যুক্ত আইরিশম্যানরা যখন ইংলণ্ডে বা আমেরিকার কোন বড় শহরে উপস্থিত হ'য়ে সেখানকার লোকজনের মধ্যে নীতি ও ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ধ্যান-ধারণা দেখতে পায়, তখন তাদের মনোরাজ্যে ঘোরতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। নৈতিক বা ন্যায় বিচার তখন তাদের কাছে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ বাক্যে পরিণত হয়। কাজেই, তারা যে ঘোরতর দুর্নীতিপরায়ণ হ'য়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি?—এফ. ই।

দখল করে থাকবে। সিম্‌ব্রি ও টিউটন জাতি তখনও যাযাবর-ধর্মী। সুয়েভীরাও সিজারের আমল পর্যন্ত স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে পারেনি। সিজার স্পষ্টই বলেন :—"সুয়েভীরা গোষ্ঠী ও জ্ঞাতি (জেন্তিবুস কোগনাতিওনিবুস্ক) হিসাবে বসতি স্থাপন করে। জুলিয়ান গোষ্ঠীর বংশধর এই রোমান-শ্রেষ্ঠের মুখে জেন্তিবুস শব্দের উচ্চারণ রীতিমত অর্থযুক্ত, হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু নয় মোটেই। অন্যান্য জার্মানদের বেলাতেও এই বাস্তব সত্যটা সমানভাবে প্রযোজ্য ; এমন কি রোমানদের পরাভূত ক'রে তারা যে সমস্ত প্রদেশ জয় করে, সেখানেও তারা গোষ্ঠী হিসাবে বসতি স্থাপন করে। ডানিয়ুবের দক্ষিণস্থ বিজিত জনপদেও জার্মানরা যে গোষ্ঠী হিসাবে (জেনেয়ালোজিয়া) বস্তি গড়ে, আলেমান্নির আইন-কানুনে তার রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে মার্ক বা ডর্ফ্‌গেনোসেন্‌শাফ্‌ট (মার্ক বা পল্লি-সমবায়) যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখনকার দিনে "জেনেয়ালোজিয়া"ও ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি কোভালেভ্‌স্কী প্রচার করেন যে, এই সমস্ত জেনেয়ালোজিয়া একই পরিবারভুক্ত বড় বড় সম্প্রদায় ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। এইগুলোই পরে পল্লি-সমবায়ে রূপান্তরিত হয়। আলেমান্নিয়ান্‌ আইনের কেতাবে যাকে বলা হয় "জেনেয়ালোজিয়া", যতদূর সম্ভব বার্গাণ্ডিয়ান ও ল্যাঙ্গোবার্ড সমাজ অর্থাৎ গথ, হার্মিনোনিয়ান বা পার্বত্য অঞ্চলের জার্মানরা তাকে **ফারা** নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রকে গোষ্ঠী না পরিবার-সমবায় বলা উচিত তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হ'লে রীতিমত গবেষণা করা দরকার।

জার্মানরা গোষ্ঠীর অর্থ-বোধক কোন সাধারণ শব্দ ব্যবহার করতো কিনা এবং করলেও সেটা কোন্‌ শব্দ তা নির্ণয় করা মুশকিল ব্যাপার। ভাষা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করলে এ-সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয়ই উপস্থিত হয়। শব্দতত্ত্বের দিক থেকে গথিক "কুনি", মিডল-হাই-জার্মান "কিন্নে" শব্দ, গ্রীক "গেনস্‌" এবং ল্যাটিন "জেন্‌স" শব্দের জুড়িদার। নারী-বাচক শব্দগুলো একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। গ্রীক "গিনে", শ্লাভ "জেনা", গথিক "কিনো", প্রাচীন নর্স "কোনা" বা "কুনা" একই ধাতুর অপভ্রংশ। এই সমস্ত শব্দ জননী-বিধিরই সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিম. ল্যাঙ্গোবার্ড ও বার্গাণ্ডিয়ানদের মধ্যে ব্যবহৃত **ফারা** শব্দটি **"ফিজান"** নামক এক কাল্পনিক ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। **"ফিজান"** ধাতুর অর্থ জন্ম দেওয়া। আমার মতে, **ফারান** বা **ফাহ্‌রেন** ধাতু থেকেই **ফারা** শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আহরণ বাঞ্ছনীয়। **"ফাহ্‌রেন"** শব্দের অর্থ ভ্রমণ বা পর্যটন। যাযাবর লোকজনের মধ্যে এমন একটা দল বা সেকসনকে

বুঝতে হ'বে যারা স্থায়ীভাবে একত্রে চলাফেরা করতো, অর্থাৎ আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে এইরূপ দল গঠিত হয়। জার্মানদের যাযাবর বৃত্তি চলে কয়েক শতাব্দী ধরে। প্রথমে পূর্বে, পরে পশ্চিম দিকে এরা পর্যটন করে। এই বিচরণের যুগে রক্তসম্পর্ক যুক্ত দলগুলি **কান্না** নামে অভিহিত হতে থাকে। জ্ঞাতি বা আত্মীয়ের প্রতিশব্দ গথিক **"সিবা"**, অ্যাংলো-স্তাকসন **"সিব"**, ওল্ড হাই-জার্মান **"সিপ্পিয়া"** বা **"সিপ্পা"**—এই শব্দগুলোরও এখানে উল্লেখ করার দরকার। ওল্ড নর্স ভাষায় এই শব্দেরই বহুবচন **"সিফ্যার"** অর্থাৎ আত্মীয়বর্গ প্রচলিত ছিল। একবচন "সিফ্" শব্দে এই নামের কোন দেবী বুঝিয়ে থাকে। 'হিল্ডেব্র্যাণ্ড সঙ্' গ্রন্থে আরও একটা শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিল্ডেব্র্যাণ্ড এখানে হাডুব্র্যাণ্ডকে জিগ্যেস করছে, "জ্ঞাতির পুরুষদের মধ্যে তোমার পিতা কে?......অর্থাৎ তোমার জ্ঞাতি কি?" জার্মান জাতির মধ্যে গোষ্ঠী বলতে যতদূরসম্ভব গথিক কুনি শব্দই প্রযুক্ত হ'য়ে থাকবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষাতে একই ধরনের শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। কুনিং শব্দটাও এই শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কুনিং বা কুনিগ্ (রাজা) শব্দ পূর্বে গোষ্ঠী বা উপজাতির সর্দার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সিব্যা, সিপ্পে অর্থাৎ জ্ঞাতি শব্দ নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ওল্ড নর্স ভাষায় "সিফ্যার" বলতে সগোত্র ছাড়া বিয়ের সম্পর্কের কুটুম্বদেরও বোঝায়। অন্ততপক্ষে দুই গোষ্ঠির নরনারী এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই সিফ্ শব্দ গোষ্ঠীর প্রতিশব্দ নয়।

মেক্সিকান ও গ্রীকদের মত জার্মানরাও গোষ্ঠী অনুসারে লড়াইয়ের সময় অশ্বারোহী ও বর্ষাফলকের আকারযুক্ত পদাতিক দলসমূহ গঠন করে। তাসিতুস এখানে "পরিবার ও জ্ঞাতি অনুসারে" সৈন্য-সজ্জা করা হ'তো বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাসিতুসের আমলে রোমানদের মধ্যে গোষ্ঠী-প্রথা উঠে যায় বললেই চলে। সেইজন্য তিনি "পরিবার" "জ্ঞাতি" প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করেন।

তাসিতুস-লিখিত আরও একটি বিবরণী রীতিমত প্রণিধানের যোগ্য। এই বৃত্তান্তে বলা হয় যে, মামারা ভাগ্নেকে নিজের সন্তান বিবেচনা করে। অনেকের মতে মামা-ভাগ্নের রক্তের বাঁধন বাপ-বেটার সম্পর্কের চেয়ে নিবিড়তর ও অধিকতর পবিত্র। সেইজন্য জামিনের প্রয়োজন হ'লে 'মামুলী' পুত্রের চেয়ে (natural son) ভাগ্নেই অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়। আদিম জননী-বিধির, এবং কাজেকাজেই মূল গোষ্ঠী-প্রথার জীবন্ত সাক্ষাৎ পাই। জার্মানদের ইহা বিশেষত্ব বলেই ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছে। (১)

(১) গ্রীকরা কেবলমাত্র বীরযুগের পুরাবৃত্তে মামা-ভাগ্নের মধ্যে বিশেষ ধরণের নিগূঢ়

এইরূপ গোষ্ঠীর কোন সদস্য যদি নিজের ছেলেকে জামিন রাখে আর বাপের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এই ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাহ'লে ইহা তার পিতার কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্য-কিছুই নয়। কিন্তু এইরূপ জামিনের জন্য যদি ভাগ্নেকে জীবনান্ত হতে হয়, তাহ'লে আর রক্ষা নেই ; এতে গোটা গোষ্ঠীর পবিত্র আইনে আঘাত লাগে। মৃত বালক বা তরুণের নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ যার উপর তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত থাকে সে-ই তখন তার মৃত্যুর জন্য দায়ী সাব্যস্ত হয়। ভাগ্নেকে জামিন রাখা গুরুতর অন্যায়, আর রাখলেও চুক্তি রক্ষা করা জরুরি প্রয়োজন। জার্মানদের ভেতর গোষ্ঠী-প্রথা প্রচলনের অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই একটামাত্র প্রমাণই সমস্ত অভাব পূরণ করে।

প্রাচীন নরওয়েজীয়ানদের "ভ্যোলুস্পা" নামক কাব্যে "দেবতাদের ঊষা" ও "পৃথিবীর শেষ" সম্বন্ধে বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। এই কাব্যেও গোষ্ঠি-প্রথা সমর্থিত হয়েছে। তাসিতুসের ৮০০ বছর পর এই কাব্য লেখা হয়। কাজেই জার্মান সমাজে গোষ্ঠি-প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করার পক্ষে ইহা আরো বেশি যুক্তিযুক্ত তথ্যরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই কাব্য বা গাথাটা নারী ঋষিদের অনুপ্রেরণালব্ধ বলে প্রচার করা হয়। বাঙ্ ও বুগ্গে নামক পণ্ডিতরা এতে খৃস্টীয় প্রভাবও আবিষ্কার করেন। মহাপ্রলয়ের সময় ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান কিভাবে ঘটে এই গাথায় তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়। এ-সম্বন্ধে নিম্নে একটা চরণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল,—

"ব্রোডের মুন্ন বেরযাস্ক্ ওক আট্‌ বোন্নুম ফার্ডস্ক
মুন্নু সিসক্রুঙ্গার সিফ্‌যুম স্পিল্লা।

সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত ছিল। জননী-বিধির এই প্রতীক বহুজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ডিয়োডোরুসের গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, ৩৪ পৃঃ) দেখা যায়, মেলিয়াগার তার জননী আল্‌থিয়ার ভাই থেস্‌তিয়ুসের ছেলেদের হত্যা করে। প্রায়শ্চিত্তের অতীত এই মহাপাপের জন্য আল্‌থিয়া তার ছেলেকে অভিশাপ দেয় আর তার মৃত্যুর জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে। দেবতারা এই প্রার্থনা পূর্ণ করে। মেলিয়াগার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" ডিয়োডোরুসের গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, ৪১ পৃঃ) আরো একটা কাহিনী চোখে পড়ে। হেরাক্লেসের অধীনে আর্গোনটরা যখন থ্রেসিয়ায় অবতরণ করে তখন তারা দেখতে পায় যে, ফিনেউস্ তার নতুন স্ত্রীর প্ররোচনায় পরিত্যক্তা প্রথমা স্ত্রী ক্লিয়োপেট্রা বোরিয়াদের গর্ভজাত দুই ছেলের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছে। আর্গোনটদের মধ্যে ক্লিয়োপেট্রার ভাই কয়েকজন বোরিয়াদও ছিল। এরা নিগৃহীত ছেলে দু'টোর মামা; কাজেই তারা ভাগনেদের পক্ষাবলম্বন করে। তারা সিপাই-শান্ত্রীদের খুন করে ভাগনেদের উদ্ধার সাধন করে। —এঙ্গেলস্

"ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করবে, একে অপরকে খুন করবে আর বোনের ছেলেরা রক্তের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবে।" "সিসক্রজ্ঞার" শব্দের অর্থ "মায়ের বোনের ছেলে।" কবির মতে, বোনেদের ছেলেরা যে পরস্পরের রক্তের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবে তা ভ্রাতৃহত্যার চেয়েও বড় পাপ। "সিসক্রজ্ঞার" শব্দ দ্বারা অপরাধের চরম সীমা বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। মায়ের দিকের জ্ঞাতিত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই শব্দের স্থানে যদি "সিস্কিনা ব্যের্ন" অর্থাৎ ভাইবোনের ছেলেমেয়ে বা "সিস্কিনা সিনির" অর্থাৎ ভাইবোনের ছেলেরা শব্দ ব্যবহৃত হ'তো তা'হলে দ্বিতীয় পংক্তিটা প্রথম পংক্তির চেয়ে অধিকতর জোরালো না হ'য়ে আরো কম জোরী হয়ে পড়তো। কাজেই দেখা যাচ্ছে, "ভোলুস্পা" রচনার সময়, অর্থাৎ "ভিকিংদের" যুগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় জননী-বিধির স্মৃতিটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

তাসিতুসের আমলে, অন্যান্য দেশে, বিশেষত, যে জার্মানদের সঙ্গে তিনি অধিকতর পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্যে ইতিপূর্বেই জননী-বিধির স্থলে জনক-বিধি কায়েম হয়েছিল। সন্তান-সন্ততিরা বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তো। ছেলেমেয়ে না থাকলে, ভাইয়েরা, তথা, খুড়ো, জ্যেঠা ও মাতুলরা সম্পত্তি ভোগদখল করতো। মাতুলরা যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি, এতেই বোঝা যায়, জননী-বিধি একেবারে লোপ পায়নি। আর জনকবিধি অল্পদিন জারি হয়েছে। মধ্যযুগের বহুদিন পর্যন্ত জননী-বিধির অস্তিত্ব ছিল। মোটের উপর, এই যুগে পিতৃত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের ভাব বিদ্যমান ছিল। বিশেষত, সার্ফ বা ভূমি-গোলামদের মধ্যে পিতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। সেইজন্য কোন সামন্ত জমিদার পলাতক ভূমি-গোলামকে কোন শহর থেকে ফিরিয়ে আনার দাবি করলে, পলাতক সত্য-সত্যই ভূমি-গোলাম কিনা তা নির্ধারণের জন্য তার নিকটতম রক্ত-সম্পর্কের ছয়জন লোককে শপথ করে তা জানাতে হ'তো। একমাত্র মায়ের কুলের লোকজনই এইরকম নিকট-আত্মীয়রূপে গণ্য হ'তো। আউগসবুর্গ, ব্যাসেল, ও কাইজারস্লাউটার্ন শহরে এইরকম বিধিই বলবৎ ছিল। (মাওয়ার প্রণীত "নগর শাসনপ্রণালী", ৩৮০ পৃঃ)।

নারীজাতির প্রতি জার্মানদের শ্রদ্ধা জননী-বিধির আর একটা প্রতীকরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা কমে আসলেও তখনো একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। জার্মানদের এই স্বভাব রোমানদের কাছে দুর্বোধ ও হেঁয়ালি বলেই মনে হয়। জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি করার সময় বড় ঘরের তরুণী

বালিকারা সবচেয়ে বড় জামিনরূপে গ্রাহ্য হ'তো। স্ত্রী ও কন্যায় বন্দী হবে, শত্রুরা তাদের ক্রীতদাসী বানাবে—এই চিন্তা তাদের হৃদয়ে লড়াইয়ের সময় সবচেয়ে বেশি বীরত্ব ও সাহস জাগ্রত করতো। নারীর মধ্যে তারা পবিত্রতা ও ঐশী শক্তির পরিচয় পায়; তাই বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তারা মেয়েদের উপদেশ গ্রহণ করতো। বাটাভিয়ান বিদ্রোহের সময় সিভিলিস্ জার্মান ও বেলজিয়ানদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে গলদেশে রোমান শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। লিপ্পে নদীর তীরবর্তী ব্রুক্টেরিয়ানদের ভেলেদা নাম্নী পুরোহিত ছিল এই বিদ্রোহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত্রী। ঘর-গৃহস্থালিতে মেয়েরা সর্বময় কর্ত্রী ছিল বলেই মনে হয়। তাসিতুস বলেন যে, বুড়োবুড়ি ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেয়েদেরই সমস্ত কাজ করতে হ'তো; কারণ, পুরুষরা শিকারে অথবা মাতলামি ও আলসেমিতে সময় কাটাতো। কিন্তু জমি চষতো কারা, তাসিতুস তা স্পষ্ট ক'রে লিখেননি। ভূমি-গোলামরা কর যোগাতো—তিনি এইমাত্র বলেছেন। ভূমি-গোলামরা কিন্তু একদম বেগার খাটতো না। কাজেই মনে হয়, চাষ-বাসের কাজে যে সামান্য একটু পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, তা পুরুষদেরই সম্পন্ন করতে হ'তো।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জোড়-পরিবার প্রথায় বিয়ে-সাদী চলতো। তবে বিয়ের প্রথা ক্রমশ একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথার দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু খাঁটি একনিষ্ঠবিবাহ-প্রথা তখনো কায়েম হয়নি। কারণ, পয়সাওয়ালারা বহু-পত্নিত্বের সুযোগ গ্রহণ করতো। কুমারীদের সতীত্ব রক্ষার দিকে জার্মানদের কড়া নজর ছিল। তাসিতুস নিজে জার্মানদের বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতার খুব তারিফ করেন। নারীর ব্যভিচার বিবাহ-বন্ধন-ছেদের একমাত্র কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তাসিতুসের বিবরণীর মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। উচ্ছৃঙ্খল রোমান নর-নারীর কাছে হিতোপদেশ প্রচারই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত সত্য এই যে, বনে বসবাসের যুগে জার্মান জাতি যদি ধর্মের আদর্শস্থানীয় হয়েও থাকে, তা সত্ত্বেও, বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত সদগুণ লোপ পেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ইউরোপের সাধারণ মানুষের ধাপে নেমে যায়। রোমান-সভ্যতার ঘূর্ণীবাত্যায় জার্মানরা তাদের ভাবাগুলো হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দ্রুত তারা তাদের কঠোর সংযম থেকে বিচ্যুত হয়। তুর শহরের গ্রেগারী-লিখিত আলোচনা পড়লেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিম বন-জঙ্গলের প্রাকৃতিক জীবনে

পল্লির পরিবর্তে বড় বড় পরিবার-সমবায়ের আকারেই গড়ে উঠে। এই সমস্ত সমবায়-কেন্দ্রে কয়েক পুরুষ ধরে লোকজন বসবাস করে। সমবায়-কেন্দ্রের সদস্য-সংখ্যার অনুপাতেই তারা জমিজমা চাষ-আবাদ করে আর পার্শ্ববর্তী পড়ো জমিগুলো প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে ভোগদখল করে। আবাদী জমির প্রায়ই হস্তান্তর ঘটে—তাসিতুস-বর্ণিত এই বিবরণীটা স্বত্বনীতির দিক থেকে যাচাই না করে নিছক কৃষিবিদ্যার দিক থেকে বিচারকদের দেখ্‌তে হবে। পারিবারিক সমষ্টিগুলো প্রত্যেক বছরই নতুন করে নতুন জমি চষ্‌তো। পূর্ব বছরের আবাদী জমি ফেলে রাখা হ'তো। লোকসংখ্যা ছিল অল্প ; সেইজন্য অনেক জমি পতিত রাখা সত্ত্বেও জমিজমা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদের কোন অবসর ছিল না। বহু শতাব্দী অতীত হওয়ার পর পরিবার-সমবায়গুলোর লোকজন খুব বেড়ে যায়, আর তখনকার দিনে ধন-দৌলত, বিশেষত, শস্য-উৎপাদনের যে অবস্থা ছিল, তাতে যৌথ অর্থনীতি পরিচালন যখন ভয়ানক অসুবিধা-জনক বিবেচিত হয় তখন পারিবারিক সমষ্টিগুলো ভেঙে যায়। চাষের যোগ্য পতিত জমি, পশু-চারণের উপযোগী যৌথ ময়দান, ইত্যাদি আমাদের পরিচিত বিধি-ব্যবস্থা অনুসারেই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রথমত অস্থায়ীভাবে, পরে চিরস্থায়ীভাবে ভাগাভাগি হ'য়ে যায়। পরিবারগুলো তখন বেশ গড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করে। বন-জঙ্গল, পশুচারণ মাঠ ও জলাশয়গুলো সর্বসাধারণের সম্পত্তি রয়ে যায়।

রুশিয়ার বেলায় এই ক্রম-বিকাশ নিরেট ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণ করা যেতে পারে। জার্মানি ও জার্মান জাতীয় অন্যান্য দেশের বেলাতেও ইহা বেশ স্বীকার করা যায় যে, তাসিতুসের আমল পর্যন্ত সময়ের পল্লি-সমবায়ের তুলনায় কোভালেভ্‌স্কী-বিবৃত এই ব্যাখ্যাপ্রণালী অবলম্বন করলে অর্থনৈতিক ঘটনা-গুলোর বেশ ভাল পরিচয় মিলে, আর গোজামিলগুলোও পরিষ্কার হয়ে আসে। মোটের উপর, প্রাচীনতম স্মৃতি-শাস্ত্র "কোদেক্স লাওরেশামেন্সিসের" বিধানগুলো পল্লি-সমবায়ের তুলনায় পরিবার সমবায়ের সঙ্গেই বেশ খাপ খায়। অপর পক্ষে এই মতবাদ নতুন নতুন অসুবিধা ও নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন এবং সেজন্য নতুন করে গবেষণা চালাবারও প্রয়োজন। তবে আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, জার্মানী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং ইংল্যাণ্ডেও যতদূর সম্ভব পারিবারিক সঙ্ঘ বা সমবায়টি মধ্যবর্তী স্তররূপেই উদ্ভূত হয়েছিল।

সিজারের আমলে জার্মানারা স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে বা এইরূপ করার উদ্যোগ

করলেও তাসিতুসের আমলে তারা একশ বছর ধরে স্থায়ী বাসিন্দা ব'নে গিয়েছিল। জীবন-যাত্রার নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের বহরও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। তারা বাস করতো কাঠের তৈরি ঘরে। পোশাক-পরিচ্ছদ অনেকটা মান্ধাতার আমলের জঙ্গলী জাতের মত। মোটা পশম ও পশুর চামড়ায় পুরুষদের পরিচ্ছদ তৈরি হ'তো ; মেয়েরা ও হোমরা-চোমরা লোকরা শণের (লিনেনের) অঙ্গরাখা ব্যবহার করতো। দুধ, মাংস ও বন্য ফল জার্মানদের প্রধান খাদ্য ছিল। প্লিনির মতে, তারা ওট্‌মিল পরিজ (জই শস্যের খিচুড়িও) ব্যবহার করতো। আয়র্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কেল্ট জাতীয় লোকজনের এখনো জইয়ের মণ্ড জাতীয় খাদ্যে পরিণত। পশু-সম্পদই ছিল জার্মানদের একমাত্র সম্পত্তি। তবে এইসব পশু ছিল নিকৃষ্ট ধরনের। গরুগুলো আকারে ছোট এবং এদের শিং উঠ্‌তো না। ঘোড়াগুলিও ছিল বেঁটে, আর খুব কম দৌড়াতে পারতো। জার্মানরা মুদ্রা খুব কম ব্যবহার করতো। তাও ছিল আবার রোমান মুদ্রা। সোনারূপার কাজ তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, সোনা-রূপার আদরও তারা জান্‌তো না। লোহা অন্ততপক্ষে রাইন দানিয়ুব তীরবর্তী জার্মানদের নিকট ছিল দুষ্প্রাপ্য। খনি থেকে লোহা উত্তোলন কিভাবে করতে হয় তা জার্মানদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সম্পূর্ণরূপে আমদানি-করা লোহার উপরেই তাদেরকে নির্ভর করতে হতো। গ্রীক ও রোমান অক্ষরের নকল করে এক প্রকার লিপি তারা চালায়। এর নাম ছিল রুনিক। গুপ্তভাবে ধর্মকর্ম, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিতে এই অক্ষরের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। নরবলি তখনো প্রচলিত ছিল। মোটের উপর, জার্মান সমাজ তখন মধ্য-বর্বর স্তর থেকে উচ্চ বর্বর স্তরে পা ফেলার উপক্রম করে। রোমান এলাকার সীমান্তে যে-সমস্ত জার্মান জাতের বসবাস ছিল সহজে রোমান শিল্পদ্রব্য আমদানির জন্য তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে ধাতু ও বাস্তু-শিল্প গড়ে ওঠার অবসর না পেলেও, উত্তর-পূর্ব বাল্টিক সাগরের উপকূলে বসবাসকারী জার্মানদের মধ্যে এই সব শিল্প দস্তুরমত গড়ে ওঠে। শ্লেজ্‌ভিকের জলাভূমিতে লোহার লম্বা তলোয়ার, বর্ম, রূপার শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি যে-সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের টুকরো এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগের রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, তথা জার্মানদের বিচরণের যুগে বিভিন্ন দেশে জার্মানদের ধাতু-নির্মিত যে-সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়, তাতে বিশেষ ধরনের চমৎকার কারিগরির পরিচয় পাওয়া যায়। যেগুলো রোমান আদর্শের অনুকরণে তৈরি তাতেও বিশেষত্বটা সহজেই চোখে পড়ে। সভ্য রোমান জগতে উপনিবেশ

স্থাপনের বেলায় মাত্র ইংলণ্ড ছাড়া সর্বত্র এই স্বদেশী শিল্প নষ্ট হয়ে যায়। এই শিল্প যে কি করে একইভাবে গড়ে উঠে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, ব্রোঞ্জের গহনার টুকরোর মধ্যে। বার্গাণ্ডি, রুমানিয়া ও আজভ সাগরের তীরবর্তী জনপদে যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সে-গুলো দেখলে মনে হয় বৃটিশ ও সুইডিস্ কারখানাতেই তৈরি হয়েছে। কাজেই জার্মান স্যাকরারা তা তৈরি করছে।

শাসনতন্ত্রও ছিল বর্বর যুগের উচ্চস্তরসম্মত। তাসিতুসের বর্ণনা অনুসারে সাধারণত সর্দারদের (প্রিন্সিপে) পরিষদ ছোটখাটো ব্যাপারগুলোর মীমাংসা করতো। বড় বড় সমস্যাগুলোর সমাধানের ভার ছিল গণ-পরিষদের উপর। সর্দারদের পরিষদগুলো গণ-পরিষদে উপস্থাপনের জন্য এই সমস্ত সমস্যার খসড়া পরিকল্পনা স্থির করতো। বর্বরযুগের নিম্নস্তরে এই গণ-পরিষদ যে উপজাতি বা উপজাতি সঙ্ঘের পরিবর্তে গোষ্ঠী-সদস্যদের নিয়েই গঠিত হয়, অন্ততপক্ষে আমাদের পরিচিত স্থানগুলোর মধ্যে, আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। লড়াইয়ের সর্দারদের বলা হয় ডুসে। ইরোকোয়াদের মত প্রিন্সিপে ও ডুসেদের মধ্যে রীতিমত পার্থক্য ছিল। প্রিন্সিপেরা আসল উপজাতির সদস্যদের দেওয়া গরু, শস্য ইত্যাদি উপহারের উপর জীবনধারণ করে। আমেরিকার মত জার্মান সমাজেও প্রিন্সিপেরা একই পরিবার থেকে নির্বাচিত হয়। গ্রীস ও রোমের মত জননী-বিধি থেকে জনক-বিধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ক্রমশ নির্বাচিত সর্দারদের পরিবর্তে বংশগত সর্দার বাছাই করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়; ফলে প্রত্যেক গোষ্ঠীর ভেতরে অভিজাত পরিবারের সৃষ্টি হয়। বিচরণের যুগে বা তার অব্যবহিত পরেই তথাকথিত পুরাতন উপজাতিগত আভিজাতদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে যায়। লড়াইয়ের-সর্দার বংশের পরিবর্তে কেবলমাত্র গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত হ'তো। রণ-নায়কদের তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না। পূর্ববর্তী নজির অনুসারে কাজ চালাতে তারা বাধ্য ছিল। সৈন্য-বিভাগের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ভার যে পুরোহিতদের মুঠোর ভেতরে ছিল, তাসিতুস তা খোলাখুলিভাবেই লিখেছেন। প্রকৃত ক্ষমতা গণ-পরিষদেরই করায়ত্ত ছিল। রাজা বা উপজাতীয় সর্দার সভাপতির আসন গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় জনগণের মরজি অনুসারে। "না" সিদ্ধান্তটা জানানো হয় কানাঘুষা ও ফিসফিস ক'রে, কিন্তু "হাঁ" সিদ্ধান্তটা অস্ত্রের ঝন-ঝনানির মধ্যে চীৎকার ধ্বনিতে জানান হয়। গণপরিষদ বিচার-পরিষদের কাজও নির্বাহ করে। এখানে অভিযোগসমূহ উত্থাপিত এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; মৃত্যুদণ্ডও প্রদত্ত হয়।

কাপুরুষতা, জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্বাভাবিক কাম-প্রবৃত্তি প্রাণদণ্ডের উপযোগী অপরাধরূপে গণ্য হয়। গোষ্ঠী ও অন্যান্য উপবিভাগও একত্রে বসে বিচার করতো। সর্দার সভাপতির আসন গ্রহণ করতো। ইনিই ছিলেন কেবল মোকদ্দমা চালাবার ও জেরা করবার অধিকারী। আদিম যুগের জার্মান আদালতের ধরণ-ধারণ এই রকমই ছিল। জার্মান সমাজে সর্বত্র ও সকল সময়ে একমাত্র জন-সাধারণই প্রকৃত রায় দানের অধিকারী ছিল।

সিজারের আমল থেকেই জার্মান সমাজে উপজাতি সংঘসমূহ গড়ে উঠে। কতকগুলো সংঘে রীতিমত রাজাও ছিল। সর্বোচ্চ রণনেতা গ্রীক ও রোমানদের মত যথেচ্ছ শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার অধিকারী হয় এবং কখনো কখনো সাফল্যলাভও করে। তাই বলে এই সমস্ত সফলকাম ক্ষমতা অপহরণকারী স্বৈরাচারী শাসক হতে পারেনি। তবে তারা গোষ্ঠীর কাঠামোর শৃংখলগুলো ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করে। স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলামরা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় বলে সমাজে সাধারণত নীচ আসন লাভ করলেও নতুন রাজাদের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা, ধন দৌলৎ ও উচ্চ সম্মান লাভ করে। রোম সাম্রাজ্য দখল করবার লড়াইয়ের সর্দারদেরও একই অবস্থা ঘটে। তারা তখন-বড় বড় রাজ্যের রাজা ব'নে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে রাজাদের গোলামরা ও স্বাধীনতা-প্রাপ্ত লোকেরা প্রথমে রাজসভায়, তারপর রাষ্ট্রের কার্য-কলাপে বড় বড় অংশ গ্রহণ করে। নতুন অভিজাতদের অধিকাংশই এদের বংশদ্ভূত।

পার্শ্বচর রাখার প্রথাটা রাজপদ সৃষ্টির বিশেষ সাহায্য করে। স্বাধীনভাবে যুদ্ধ-চালনার জন্যে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে গোষ্ঠী-বহির্ভূত সমিতি গড়ে উঠে, আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। জার্মান-দের মধ্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বেই স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নামজাদা লড়াইয়ের সর্দাররা সহজেই লুণ্ঠনেচ্ছু যুবকদের নিয়ে দল গঠন করতে সক্ষম হয়। সর্দার ও পেটোয়ারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থাকবে, এই মর্মে শপথ গ্রহণও করে। সর্দার তাদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে, মধ্যে মধ্যে উপহারও দেয় এবং তাদের নানা ধারাবদ্ধ শ্রেণীতে সংঘবদ্ধ করে। এই সমস্ত পেটোয়ার মধ্যে একদল সর্দারের দেহ-রক্ষী সৈন্যদলে পরিণত হয়। ছোট-খাটো লুটপাটের জন্য ছোট্ট একটা স্থায়ী পল্টন থাকে। বড় বড় অভিযান চালাবার জন্য নানা শ্রেণীর অফিসার নিয়ে বড় রকমের সৈন্য-বাহিনী গঠনের দিকেও তাদের লক্ষ্য থাকে। এই সমস্ত পল্টন যে দুর্বল ছিল, পরে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ ইটালিতে ওডোআকারোর আমলের পল্টনদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তা'হলেও এদের উপদ্রবে জন-সাধারণের পুরাতন স্বাধীনতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে আসে। বিচরণের যুগে এবং তার পরের অবস্থা এই রকমই দাঁড়াতে দেখা যায়। কারণ, প্রথমত, এই সমস্ত পেটোয়া পল্টন রাজ-ক্ষমতা সৃষ্টির সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, এদের সামলিয়ে রাখতে হ'লে যে অনবরত লড়াই ও লুটতরাজ চালানোর দরকার তাসিতুস ইতিপূর্বেই তা বর্ণনা করেছেন। স্রেফ লুণ্ঠন শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুণ্ঠন করবার মত কিছু না পেলে পল্টন-নায়করা যে-সব জাতির মধ্যে লড়াই চলছে লুটের আশায় দলবল নিয়ে সেই সব জাতির মধ্যে যেয়ে হাজির হয়। যে-সমস্ত ভাড়াটিয়া জার্মান সৈন্য রোমান পতাকামূলে দলে দলে জার্মানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক পার্শ্বচরও থাকতো। এই পার্শ্বচরদের মধ্য থেকে "লাণ্ডস্‌ক্নেথ্‌ট্" বা ভাড়াটিয়া ফৌজের উৎপত্তি। ইহা জার্মান জাতির কলঙ্কেরই পরিচায়ক, আর তাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপও বটে! পূর্বোক্ত পল্টন বা পার্শ্বচরদের লাণ্ডস্‌ক্নেথ্‌টের প্রথম পর্যায়রূপে গণ্য করা যেতে পারে। রোম-সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর রোমান দরবারের পরাধীন মো-সাহেব দলসহ এই সমস্ত রাজার পার্শ্বচর পরবর্তী যুগে অভিজাত কুলের দ্বিতীয় প্রধান উৎসরূপে গণ্য হয়।

মোটের উপর দেখা যায় যে, জার্মান উপজাতিরা বিভিন্ন জাতিরূপে গড়ে উঠে। বীরযুগের গ্রীক আর তথাকথিত রাজাদের আমলে রোমানদের মধ্যে যে ধরনের শাসনপ্রণালী বিকাশ লাভ করে, জার্মানদের মধ্যেও সেই রকম শাসনপ্রণালী উদ্ভূত হয়। গণপরিষদ, গোষ্ঠী-সর্দারদের কাউন্সিল ও লড়াই-নায়কের রেওয়াজ জার্মানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়। জার্মান সমর-নায়করাও প্রকৃত রাজকীয় ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করে। ইহা হচ্ছে গোষ্ঠী-প্রথার সর্বাধিক বিকাশ-প্রাপ্ত শাসনপ্রণালী। বর্বরতার উচ্চস্তরের ইহা আদর্শ শাসন-প্রণালীও বটে। যে সীমান্ত চৌহদ্দীর ভেতরে এই শাসন-প্রণালী খাপ খায়, সমাজ যেই সেই সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করে, অমনি গোষ্ঠী-প্রথার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। ইহা কেটে-ফুটে চৌচির হয়ে পড়ে আর রাষ্ট্র তার স্থান দখল করে।

অষ্টম অধ্যায়

জার্মান সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

তাসিতুসের বর্ণনা অনুসারে জার্মানরা ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত ভারী। সিজার বিভিন্ন জার্মান জাতির নিম্নরূপ মোটামুটি সংখ্যা-শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। তাঁর মতে রাইন নদীর বাম-তীরবর্তী উসিপেতান ও তেঙ্কতেরান জাতির লোক-সংখ্যা নারী ও শিশু সমেত ১,৮০,০০০ জন ছিল অর্থাৎ এক-একটা উপজাতির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। (১) ইরোকোয়াদের চরম প্রগতির সময় তাদের সংখ্যা ছিল বড় জোর ২০,০০০; তারা মহাহ্রদসমূহ থেকে ওহিয়ো ও পটোমক পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের আতঙ্কস্থলে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক রিপোর্ট অনুসারে আমরা রাইন জনপদের উপজাতিগুলোর সঙ্গে বেশি পরিচিত। এই সমস্ত এক-একটা উপজাতির বাসভূমি মানচিত্রে অঙ্কিত করতে চেষ্টা করলে দেখা যায়, এর আয়তন ছিল প্রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ এক-একটা জেলার সমান অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ভৌগোলিক ১৮২ বর্গমাইল। রোমানরা জার্মান মুল্লুকের নাম দেয় 'জার্মানিয়া মাগ্না' (বৃহত্তর জার্মানী)—ভিশ্চুলা নদী পর্যন্ত প্রসারিত এই বিরাট জনপদের আয়তন প্রায় ৫০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এক-একটা জার্মান উপজাতির গড় লোকসংখ্যা ১০০,০০০ ধরলে জার্মানিয়া মাগ্নার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০০০,০০০ জন। বর্বর অবস্থার পক্ষে এই সংখ্যা বিপুল

---

(১) ঐতিহাসিক দিয়োদোরুস্ গলবাসী কেল্টদের সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাতে এই সংখ্যা সমর্থিত হয়। তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেন: গল্ দেশে বিভিন্ন সংখ্যাশক্তি সহ নানা উপজাতির বসবাস। সবচেয়ে বড় উপজাতির সংখ্যা-শক্তি ২০০,০০০ এবং সবচেয়ে ছোটর ৫০,০০০;" (দিয়োদোরুস্ সিমুলুস্, ৫ম, ২৫) অর্থাৎ গলদেশবাসী এক-একটা উপজাতির গড় লোকসংখ্যা ১,২৫,০০০। এদেশের নর-নারীরা জার্মানদের তুলনায় অধিকতর অগ্রসর ছিল; কাজেই জার্মান সমাজের এক-একটা উপজাতির তুলনায় গল্ দেশের এক-একটা উপজাতির লোক-সংখ্যা কিছু বেশি দাঁড়িয়েছিল। —এঙ্গেল্স্

হ'লেও আমাদের সম-সাময়িক বর্তমান অবস্থার তুলনায় বর্গ কিলোমিটার প্রতি ১০ জন বা ভৌগোলিক বর্গ মাইল প্রতি ৫৫০ জন হিসাবে লোকসংখ্যা নগণ্য মাত্র। কিন্তু এই জন-সংখ্যাকে তদানীন্তন জার্মানদের মোট জনসংখ্যা-রূপে গণ্য করা যায় না। কারণ, সমগ্র কার্পেথিয়ান পর্বতমালা বরাবর এবং দানিয়ুবের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বিভিন্ন ‧থিক উপজাতিসম্ভূত জার্মানদের বসবাস ছিল। বাস্টারনিয়ান্, পিউকিনিয়ান্ ইত্যাদি নামে তারা লোকসমাজে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক প্লিনি এদেরকে জার্মান উপজাতিগুলোর মধ্যে পঞ্চম প্রধান উপজাতিরূপে শ্রেণীবদ্ধ করেন। খৃঃ পূঃ ১৮০ সালেও এদের মাসিদোনিয়ার রাজা পার্সিয়ুসের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপে কাজ করতে দেখা যায়। রোমান সম্রাট আগস্টাসের রাজত্বকালের প্রথম ক'বছরে এরা আদ্রিয়া-নোপল পর্যন্ত পৌঁছে। এই সমস্ত জার্মানের সংখ্যা যদি ধরা যায় ১০ লাখ, তাহলে আমাদের সম-সাময়িক যুগের প্রারম্ভে জার্মানদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,০০০,০০০।

জার্মানীতে স্থায়ী উপনিবেশসমূহ গড়ে উঠবার পর জন-সংখ্যা নিশ্চয় জলের গতিতেই বেড়ে চলে। ইতিপূর্বে আমরা যে শিল্পোন্নতির পরিচয় দিয়েছি তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্লেজ্‌ভিগ্‌ জেলার জলাভূমিতে যে-সমস্ত ধাতবদ্রব্য আবিষ্কৃত হয় তন্মধ্যে কিছু রোমান মুদ্রাও ছিল। ঐ সমস্ত মুদ্রার সন তারিখ থেকে জানা যায়, ঐগুলো তৈরি হয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে। কাজেই, বোঝা যায়, এর পূর্বেই বাল্টিক তীরবর্তী অঞ্চলে ধাতুর কাজ ও বয়ন-শিল্প বেশ মাথা তোলে। রোমান-সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ জোরে চলে আর অপেক্ষাকৃত সঙ্গতি-সম্পন্ন লোকজনের মধ্যে কিছু কিছু বিলাসিতাও প্রবেশ করে। এই সমস্তই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিচায়ক। ঠিক এই সময়ে কিন্তু জার্মানদের ব্যাপক আক্রমণও শুরু হয়। অভিযান চলে রাইন নদী, রোমান সীমান্ত-প্রাচীর, ও দানিয়ুব নদীর তীর বরাবর উত্তর-সাগর থেকে কৃষ্ণ-সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে। এতে জনবলের বহির্মুখী চাপ ও অনবরত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ পরিচয়-ই পাওয়া যায়। যুদ্ধ চলে তিন শতাব্দী ধ'রে। (স্কাণ্ডিনেভিয়ান, গথ ও বার্গাণ্ডিয়ানরা বাদে) গথিকশ্রেণীর জার্মানরা ছিল এই বিরাট অভিযানকারী জার্মানবাহিনীর বাম অঙ্গ। এরা চাপ প্রয়োগ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। মধ্য-ভাগে অগ্রসর হয় হাই-জার্মান দল (হারমিনোনিয়ান্)। দানিয়ুব নদীর উজানে এরা রোমানদের উপর চাপ প্রয়োগ করে। জার্মানবাহিনীর দক্ষিণ অঙ্গে

অগ্রসর হয় ফ্রাঙ্ক নামে পরিচিত ইঙ্গিভোনিয়ান্ জার্মানগণ। এরা রাইন নদী ধরে অগ্রসর হয়। ইঙ্গিভোনিয়ান্ জার্মানগণ বৃটেন দখল করে। খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রোম-সাম্রাজ্যকে অবসন্ন, শক্তিহীন ও অসহায় অবস্থাতেই অভিযানকারী জার্মানদের সম্মুখীন হতে হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোয় গ্রীক ও রোমান-সভ্যতার শৈশব অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এবার আমরা তার মৃত্যু-শিয়রে দাঁড়িয়ে। রোম তার বিশ্ব শাসনের স্টীম রোলার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর উপর চালিয়ে সমস্ত বৈচিত্র্য ভেঙে দিয়ে ঐক্য ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই জবরদস্ত শাসন চলে কয়েক শতাব্দী ধরে। মাত্র যে-সমস্ত অঞ্চলে গ্রীক ভাষা বাধার সৃষ্টি করে সেই সমস্ত অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলেই জাতীয় ভাষার স্থান অধিকার করে ল্যাটিন ভাষার নিকৃষ্ট সংস্করণ। জাতীয় পার্থক্যের আর কোন ঠাঁই-ই ছিল না। গল, আইবেরিয়ান্, লিগুরিয়ান, নোরিকান ইত্যাদি জাতি অতীতের বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়। সকলেই রোমান ব'নে যায়। রোমান শাসন ও রোমান আইন সর্বত্রই প্রাচীন গোষ্ঠী-শাসিত সমাজ-কেন্দ্রগুলো ভেঙে দেয়; ফলে স্থানীয় ও জাতীয় স্বাধীনতার শেষ স্মৃতি-চিহ্নটুকুও লোপ পায়। নব-গৃহীত রোমান সংস্কৃতি (new fangled Romanism) এই ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। কোনরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে জন্মলাভ করতে পারে নি; বরং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-হীনতাই ছিল এর স্বধর্ম। নতুন নতুন জাতি গড়বার মত উপাদান কিন্তু সর্বত্রই ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের ল্যাটিন ভাষার মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলে। যে-সমস্ত সীমান্ত-রেখা পূর্বে ইতালি, গল, স্পেন ও আফ্রিকাকে স্বাধীন দেশরূপে গড়ে, সেই সমস্ত সীমান্ত-রেখা তখনো অব্যাহত ছিল। তখনো এইগুলোর প্রভাব বেশ টের পাওয়া যায়। এই সমস্ত উপাদানকে নতুন নতুন জাতিরূপে গড়ে তোলার মত শক্তির নিতান্ত অভাব ছিল। সৃজনধর্মের কথা দূরে থাক, বিকাশ লাভের যোগ্যতা বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতার কোন চিহ্নও কোন স্থানে দেখা যায় নি। সুবিস্তীর্ণ এলাকায় বিপুল জন-সমাজ শুধুমাত্র রোমান রাষ্ট্ররূপ বাঁধনের দ্বারা গ্রথিত ছিল। রোমান রাষ্ট্র ক্রমে এদের নিকৃষ্টতম শত্রু ও অত্যাচারীতে পরিণত হয়। প্রদেশগুলো রোমের ধ্বংস সাধন করে। আর পাঁচটা শহরের মত রোম প্রাদেশিক শহরে পরিণতি লাভ করে। বিশেষ ধরনের কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থাক্‌লেও রোম আর শাসকরূপে গণ্য নয়; বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, এমন কি সম্রাট, বা সহকারী সম্রাটদের

রাজধানীও নয়। সম্রাট ও সহকারী সম্রাটরা তখন কনস্টান্টিনোপল, ট্রেভেস ও মিলান শহরে অধিষ্ঠিত। রোমান রাষ্ট্র তখন অতিকায় জটিল শাসনযন্ত্রে পরিণত; প্রজাপুঞ্জের রক্ত-শোষণই তার একমাত্র ধান্দা। রাষ্ট্র-প্রবর্তিত খাজনা, ট্যাক্স, আবওয়াব ইত্যাদির চাপে জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতরই হ'নে যায়। চাপের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই যায়। অবশেষে গবর্ণর, ট্যাক্স-কালেক্টার ও সরকারী পল্টনের অত্যাচার-মূলক কার্য-কলাপ অসহ্য হয়ে পড়ে। বিশ্ব-শাসনের একৃতিয়ার সহ রোমান-রাষ্ট্র শেষপর্যন্ত এই রকমই দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যের ভেতরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাইরের বর্বরদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই রাষ্ট্র কোনরূপে আপন অস্তিত্ব রক্ষার দাবি করতে সমর্থ হলেও এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা নিকৃষ্টতম অরাজকতার চেয়ে নিকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। বর্বরদের আক্রমণ থেকে যে-সব নাগরিককে রক্ষা করবার জন্য রোমান রাষ্ট্র দাবি করে, তারা মুক্তির জন্য আশান্বিত হৃদয়ে এই সমস্ত বর্বরদেরই প্রতি সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

সমাজের অবস্থাও ছিল এমনি শোচনীয়। রিপাবলিকের অন্তিম দশায় প্রদেশগুলোর নৃশংস শোষণ রোমক শাসনের একমাত্র কার্যকরী নীতিতে পরিণত হয়। সম্রাটরা এই সমস্ত শোষণ লোপ করা দূরে থাক, শোষণ-যন্ত্রকে আরো নিয়মিত করে তোলে। সাম্রাজ্যের যতই অবনতি ঘটতে থাকে খাজনা ট্যাক্সের বহর ততই বেড়ে যায়। সরকারী অফিসাররাও ততই নির্লজ্জ হ'য়ে অত্যাচার ও শোষণ চালায়। রোমানরা অন্যান্য জাতির উপর শাসন পরিচালনেই ছিল সিদ্ধহস্ত; শিল্প-ব্যবসায়ে দক্ষতা লাভ তাদের অদৃষ্টে ঘটে উঠেনি—সুদখোর মহাজনরূপে কিন্তু রোমানরা আগের ও পরের সকলকেই হার মানিয়েছে। সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য যা-ও কোনরূপে টিকে ছিল, তাও সরকারী অফিসারদের দৌরাত্ম্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পূর্বে, সাম্রাজ্যের গ্রীক অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য কোনরূপে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মোটের উপর, সর্বজনীন দারিদ্র্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির-শিল্প ও কলাশিল্পের ক্রমিক অবনতি, জনসংখ্যা হ্রাস, শহরগুলোর অধোগতি, কৃষিকাজের অধঃপতন—রোমান বিশ্ব-প্রাধান্যের শেষ পরিণতি ঠিক এই রকমই দাঁড়ায়।

প্রাচীন যুগে সর্বত্র কৃষিকাজই ছিল ধন-দৌলতের মুখ্য উপাদান। এই যুগে কৃষির কিম্মৎ পূর্বেকার যেকোন যুগের তুলনায় আরো বেশি দাঁড়ায়। ইতালিতে "লাতিফুন্দিয়া" নামে বড় বড় জমিদারি গড়ে উঠে। রিপাবলিকের পতনের পর এই সমস্ত জমিদারি সমগ্র ইতালি ছেয়ে ফেলে। জমিদারিগুলোর সুযোগ-সুবিধা

গ্রহণ করা হয় দু'ভাবে। লাতিফুন্দিয়াগুলো চারণভূমিতে পরিণত করা হয়। গরু, ভেড়া ইত্যাদি জনগণের স্থান দখল করে। অল্প কয়েকজন গোলাম দ্বারাই এই সব পশুর রক্ষণাবেক্ষণ চল্‌তো। সময়ে সময়ে জমিদারিগুলো ভিলা বা শখের বাগানবাড়িরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত বাগানবাড়িতে বিস্তর গোলাম নিয়োগ করে জমিদারবাবুর বিলাসভোগের উপযোগী বা শহরে বিক্রয়ের উপযোগী ফলমূলের আবাদ করা হয়। বড় বড় চারণ-ভূমি অব্যাহত রাখা হয়, এমন-কি, এইগুলোর পরিসরও বেড়ে যায়। পল্লি-অঞ্চলের জমিদারি ও বাগান-বাড়িগুলো কিন্তু জমিদারবাবুদের দারিদ্র্য আর শহরগুলোর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস-পথের-পথিক হয়। গোলাম রেখে লাতিফুন্দিয়া চালানো আর লাভের সম্পত্তিরূপে গণ্য হয় না। ঐ সময় অন্য কোনরূপ বড় রকমের চাষ-আবাদ পরিচালনের উপায়ও ছিল না। কাজেই ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র আবার লাভজনক সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। পল্লি-অঞ্চলের জমিদারিগুলো একে একে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বাঁটোয়ারা করা হয়। এই সমস্ত জমি বিলি করা হয় রায়তদের মধ্যে। এরা বার্ষিক নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে আপন জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলের অধিকারী হয়। কতকগুলো টুক্‌রো জমি "পার্তিয়ারী" নামক একশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়। এদের দাবী না বলে জমি-জমার তদারককারী বলাই শ্রেয়। কারণ, গতর খাটিয়ে এদের ভাগ্যে উৎপন্ন ফসলের বড় জোর এক ষষ্ঠাংশ, এমন কি, এক নবমাংশ মাত্র মিল্‌তো। অধিকাংশক্ষেত্রে এই সমস্ত টুক্‌রো জমি কলোনির (উপনিবেশের) কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়। এদের নির্দিষ্ট বার্ষিক কর যোগাতে হ'তো; জমি-জমার সঙ্গে এরাও চিরদিনের জন্যে বাঁধা থাক্‌তো। জমি-জমা বিক্রী হ'লে এরাও জমির সঙ্গে বিক্রী হয়ে যেত। যদিও এরা গোলাম নয়, তবুও এদের স্বাধীন বলা চলে না। স্বাধীন নর-নারীর সঙ্গে এদের বিয়ে-সাদীও চল্‌তো না। এদের বিয়ে পূর্ণ-বিয়েরূপে গণ্যও হ'তো না। গোলামদের মত এদের বিয়ে উপপত্নিত্বরূপেই গণ্য হ'তো। এরাই হচ্ছে মধ্যযুগের ভূমি-গোলামদের অগ্রদূত।

সাবেক কালের গোলামি-প্রথারও অবসান হয়। বড় বড় কৃষিক্ষেত বা শহরের কারখানা কোনস্থানেই গোলাম খাটিয়ে লাভবান হওয়ার উপায় ছিল না। গোলামদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজার উঠে যায়। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগে গাদায় গাদায় মাল উৎপাদন এখন ছোট ছোট কৃষিক্ষেত আর ছোট-খাটো কুটির-শিল্পের অল্প পরিমিত উৎপাদনে পরিণত। কাজেই, তাতে বেশিসংখ্যক

গোলাম নিয়োগের উপায়ই ছিল না। ধনী লোকেরা ঘরকন্নার কাজ ও বিলাস-ব্যসনের জন্য দু'চার জন গোলাম রাখতো। কিন্তু মরণ-পথের-যাত্রী হয়েও গোলামি-প্রথা একেবারে নির্মূল হয় না। এই প্রথার কল্যাণে উৎপাদনের সহায়ক সমস্ত কাজকর্মই গোলামি মেহনৎরূপে গণ্য হয়। স্বাধীন গোলামের পক্ষে এইরকম কাজে হাত দেওয়া ভয়ানক অপমান-জনক। সকলেই কিন্তু তখন স্বাধীন রোমান-নাগরিকে পরিণত। এইজন্য একদিকে অতিরিক্তভাবে গোলামের সংখ্যা বেড়ে যায়। এরা সমাজের দুর্বিষহ বোঝায় পরিণত হওয়ায় এদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অপরপক্ষে উপনিবেশে কৃষক ও ভিক্ষুকের পর্যায়ে উপনীত স্বাধীন মানুষের (ভূতপূর্ব গোলামি-প্রথাযুক্ত মার্কিন স্টেটগুলোর দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের জুড়িদার) সংখ্যাও বেড়ে যায়। প্রাচীন গোলামি-প্রথার ক্রমিক তিরোধান খৃস্টধর্মের প্রভাবে ঘটে উঠেনি মোটেই। রোম-সাম্রাজ্যের আমলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খৃস্টধর্ম অম্লান বদনে গোলামি-প্রথার অবদান ভোগ করেছে। পরবর্তী যুগে খৃস্টধর্ম খৃস্টানদের দাস-ব্যবসায়ে সামান্য পরিমাণেও বাধা দেয়নি। উত্তরে জার্মানরা, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ভেনিসের বণিকরা দাস-ব্যবসা চালায়; খৃস্টধর্ম তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। পরবর্তী যুগে নিগ্রোদের নিয়ে দাস-ব্যবসা সম্পর্কে খৃস্টীয় ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে নীরবতা অবলম্বন করে। (১) গোলামি-প্রথায় আর পয়সা মিলে না। সেইজন্যই এই প্রথা সমাধি লাভ করে। কিন্তু গতায়ু হয়েও এই প্রথা সমাজের গায়ে তার বিষের হুলটা ফুটিয়ে যায়। স্বাধীন নাগরিকদের পক্ষে গতর খাটিয়ে ধন-সম্পদ উৎপাদনের পথে দুরপনেয় কলঙ্কেরই ছাপ মেরে চলে যায়। এই কানা গলি থেকে বেরুবার পথ না পেয়ে রোমান জাতের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়। অর্থনীতির দিক থেকে গোলাম পোষা দায়, অথচ স্বাধীন নাগরিকদের গতর খাটানোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। গোলামদের দ্বারা সমাজের ধন-সম্পদ উৎপাদনের পথ

---

(১) ক্রেমোনার বিশপ লিউট্‌প্র্যাণ্ড কর্তৃক লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ফ্রান্সের ভার্দা শহরে হোলী জার্মান-সাম্রাজ্যের আমলে পুরুষদের খোজা করা সবচেয়ে বড় শিল্পে পরিণত ছিল। খৃষ্টান বণিকরা স্পেনদেশে এই সমস্ত খোজা বিক্রয় করে বিলক্ষণ পয়সা রোজগার করে। মুররা তাদের হারেম রক্ষার জন্য উচ্চমূল্যে এইসব খোজা ক্রয় করে।

—এফ, ই।

বদ্ধ হয়, কিন্তু তখনো স্বাধীন শ্রমজীবী দলের সৃষ্টি হয় নি। এখানে পুরাবস্তুর বিপ্লবই একমাত্র সাহায্য করতে পারে।

প্রদেশগুলোর অবস্থাও এমনি বিশৃংখল। অধিকাংশ খোঁজ-খবর পাওয়া যায় গল দেশ সম্বন্ধে। কলোনিস্ট ছাড়া এখানে অল্পসংখ্যক স্বাধীন চাষীরও অস্তিত্ব ছিল। সরকারী কর্মচারী, বিচারক ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে এরা অনেক সময় কোন ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয় গ্রহণ করতো। কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে নয়, দলকে দল চাষীরা এইভাবে আশ্রয় গ্রহণ আরম্ভ করায় খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাটগণ প্রায়ই আইনের বলে এই প্রথা নিষিদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু এই প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করে চাষীরা যে খুব সুখে ছিল তা নয়। আশ্রয়দাতা চাষীকে তার ভূমির মালিকানাস্বত্ব তার নিকট হস্তান্তরিত করতে বাধ্য করতো; তবে জীবিতকাল পর্যন্ত চাষীকে তা ভোগ করতে দেওয়া হ'তো। এই ফন্দী গির্জার ধর্ম-যাজকদের বেশ মনে ধরে। খৃস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তারা ভগবানের অধিকতর মহিমা প্রচার ও নিজেদের জমিজমার বহর বাড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যে দেদার এই প্রথা অনুসরণ করে। খৃস্টীয় ৪৭৫ সাল মার্সাইয়ের বিশপ সাল্‌ভিয়ানুস্—এই জুয়াচুরির তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর লিখিত বিবরণীতে প্রকাশ, রোমান অফিসার ও বড় বড় জমিদারের অত্যাচার এত বেশি বেড়ে যায় যে, অনেক রোমান বর্বর জার্মানদের অধিকৃত জেলাগুলিতে পলায়ন করে। এই সমস্ত অঞ্চলে একবার বসবাস শুরু করলে রোমান নাগরিকরা রোমানশাসনের আমলে ফিরে যাওয়া সবচেয়ে ভয়ের কারণ বলে মনে করে। আর এই সময় দারিদ্র্যের তাড়নায় বাপ-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের যে গোলামরূপে বিক্রী করে, তারও রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায় ছেলেমেয়ে বিক্রীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত এক সরকারী অনুজ্ঞা থেকে।

নিজস্ব রাষ্ট্রের কবল থেকে রোমানদের মুক্তি দেওয়ার বিনিময়-মূল্যস্বরূপ জার্মানরা তাদের জমি-জমা দুই তৃতীয়াংশ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয় গোষ্ঠীপ্রথা অনুসারে। বিজেতারা সংখ্যায় ছিল অল্প। সেইজন্য বিস্তর বড় বড় ভূখণ্ড অবিভক্ত অবস্থাতেই রয়ে যায়। অংশত সমগ্র জার্মান জনসাধারণ এবং অংশত উপজাতি বা গোষ্ঠী-সমূহ এইগুলোর মালিক সাব্যস্ত হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর পরিবারগুলোর মধ্যে চাষের জমি ও গোচারণ-ভূমি সমান হিস্যায় ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। এই সময় বারে বারে ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো কি না তা আমরা জানি না। অবস্থা যেমনই

হ'ক না কেন, রোমান প্রদেশগুলোর জমির পৌনঃপুনিক ভাগ-বাঁটোয়ারা শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়। পারিবারিক ভূমিখণ্ডগুলো "আলোদিয়ুম্" অর্থাৎ হস্তান্তরের যোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বন-জঙ্গল ও চারণভূমি অবিভক্ত অবস্থায় যৌথ-সম্পত্তি রয়ে যায়। বনভূমি ও পশুচারণের মাঠ কিভাবে ব্যবহৃত হবে আর বিভক্ত চাষের জমি-জমারই বা কিভাবে চাষ-আবাদ চল্‌বে তা প্রাচীন প্রথা অনুসারে এবং সমগ্র সমাজের মরজি অনুসারে নির্ধারিত হয়। গোষ্ঠী আপন পল্লিতে যতই দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করতে থাকে, আর জার্মান ও রোমানরা পরস্পরের সঙ্গে যতই মিশে যেতে আরম্ভ করে, ঐক্যের বাঁধন ততই গোষ্ঠীরূপ হারিয়ে ফেলে এলাকাগত রূপ ধারণ করে। গোষ্ঠী ক্রমে মার্ক সমাজে বিলীন হয়ে যায়। মার্ক-সমাজের সদস্যদের আত্মীয়তার মধ্যে গোষ্ঠীর ছাপ তখনো সুস্পষ্ট ছিল। উত্তর-ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় মার্ক-সমাজ সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত হয়। অন্ততপক্ষে, এই সমস্ত দেশে গোষ্ঠী-প্রথা সকলের অজ্ঞাতসারে স্থানীয় বা এলাকাগত কেন্দ্রে পরিণত হয়ে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য পদার্থে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিকতাই গোষ্ঠি-প্রথার স্বধর্ম। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মার্ক-সমাজকেন্দ্রগুলোর আদিম গণতান্ত্রিক রূপ অব্যাহত থেকে যায়। এমনকি, মার্ক্-সমাজকেন্দ্রের পরবর্তী বাধ্যতামূলক অবনতির যুগে সবচেয়ে আধুনিকতম সময় পর্যন্ত গোষ্ঠী-প্রথার কিছু অংশ অব্যাহত ছিল; ফলে, সমাজের নিগৃহীতদের হাতে এমন এক অস্ত্র থেকে যায় যা তারা, এমন-কি, আধুনিক যুগেও চালনা করতে পারে।

দেশজয়ের ফলে উপজাতি, তথা, সমগ্র জনগণের মধ্যে রক্ত-বন্ধনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলো অবনত হয়ে পড়ায় গোষ্ঠীর ভেতরে রক্তের বাঁধন দ্রুতগতিতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। গোষ্ঠী-শাসনতন্ত্রের সঙ্গে বিজিত জাতিদের যে খাপ খাওয়ানো যায় না, তা আমরা পূর্বেই জেনে নিয়েছি। এখানে এই অসামঞ্জস্য আরো বড় আকারে আমাদের চোখে পড়ে। জার্মানরা এখন রোমান প্রদেশগুলোর মালিক; বিজিতদের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব তাদের কাঁধে নিপতিত কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রোমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে বা গোষ্ঠী-প্রথার ভেতর দিয়ে তাদের শাসন করতেও তারা অক্ষম। স্থানীয় রোমান শাসক-মণ্ডলীগুলো তখনো অব্যাহত ছিল। এইগুলোর মাথার উপরে রোমান রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন কোন স্থলাভিষিক্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম করার প্রয়োজন উপস্থিত হ'লো। পরিবর্তনও সাধিত হয় দ্রুতগতিতে। কারণ, অবস্থা তখন অত্যন্ত জরুরি। বিজয়ী জাতির

পক্ষে লড়াইয়ের সর্দার ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে আর কাকেই বা প্রতিনিধিরূপে জাহির করা সম্ভব? ঘরে-বাইরের আক্রমণ থেকে বিজিত এলাকা রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ের সর্দারদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। রণ-নায়কত্বের রাজপদে রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্ত উপস্থিত হয় আর তা বাস্তবে পরিণতিও লাভ করে।

ফ্রাঙ্কদের দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এখানে বিজয়ী সালিয়ান জাতি রোম রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ খাস-মহালসমূহ এবং যে-সমস্ত বড় বড় জমি, ছোট ও বড় গাউ ও মার্ক-সংঘের মধ্যে বিলি করা হয় নি সেই সমস্ত জমি, বিশেষত, সমস্ত বড় বড় জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। সাদাসিধে লড়াইয়ের সর্দার, দেশের খাঁটি সার্বভৌম অধীশ্বর ব'নে যাওয়ার পর প্রথমেই জনগণের এই সম্পত্তি রাজকীয় জমিদারিতে পরিণত করে। জন-সাধারণের কাছ থেকে অপহরণ ক'রে তিনি ঐ সমস্ত নিষ্করভাবে বা প্রতিদানস্বরূপ কিছু কাজের বিনিময়ে পেটোয়াদের মধ্যে ভাগ করে দেন। এই সমস্ত পেটোয়া প্রথমত রাজা বা লড়াই-সর্দার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট লড়াই-নায়কদের ব্যক্তিগত যোদ্ধদলে সীমাবদ্ধ থাক্‌লেও এখন রোমান অর্থাৎ রোমানীকৃত গলরাও পেটোয়াদের দল ভারী করে। এদের শিক্ষা, লেখার ক্ষমতা, দেশের কথিত রোমান ভাষা ও লিখিত ল্যাটিন ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং দেশের আইন-কানুনের সঙ্গে পরিচিতির জন্য এরা ফ্রাঙ্ক-রাজার নিকট অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোলাম, ভূমি-গোলাম ও স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলামরাও রাজার পেটোয়া দলের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এদের নিয়ে রাজসভা গঠিত হয় আর রাজা এদের মধ্য থেকে অনুগত ও রাজপ্রিয় লোকজন বেছে নেন। এরা সকলেই সরকারী জমি-জমা থেকে আপন আপন হিস্যার অধিকারী হয়। প্রথমত এই সমস্ত জমি রাজকীয় দানরূপে এবং পরে পারিতোষিক (১) হিসেবে পেটোয়াদের ভাগ্যে জোটে। প্রথম প্রথম রাজার জীবদ্দশা পর্যন্ত এই সমস্ত জমি-জমা ভোগ করা চল্‌তো। এইভাবে জন-সাধারণের স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিত্তিমূল গড়ে উঠে।

কিন্তু দৃশ্যপটের এখানেই পরিসমাপ্তি নয়। পুরাতন গোষ্ঠী-শাসনতন্ত্র অনুসারে বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন অসম্ভব। গোষ্ঠী-সর্দারদের পরিষদ একেবারে লোপ না পেলেও এইগুলোর পক্ষে অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা ছিল না বল্‌লেই চলে।

১। ফ্রাঙ্ক-রাজারা পারিতোষিক হিসাবে পেটোয়াদের এই সমস্ত দান করে।

রাজার স্থায়ী-পেটোয়ারা শীঘ্রই সর্দার পরিষদের স্থান গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। পুরাতন গণপরিষদ নামেমাত্র টিকে থাক্‌লেও ক্রমেই ইহা রাজার অধীনস্থ লড়াই-সর্দার আর নতুন উদীয়মান অভিজাতদের পরিষদে পরিণত হয়। দেশের মধ্যে অনবরত ঘরোয়া-যুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে দেশজয়ের জন্যও সামরিক অভিযান চলে। বিশেষত শার্ল্যামেনের রাজত্বের শেষভাগে দেশজয়ের অভিযান খুব বেশি মাত্রাতেই ঘটে। ফ্রাঙ্ক জাতির অধিকাংশই ছিল জমি-জমার মালিক চাষী। যুদ্ধ-হাঙ্গামার ফলে এরা রিপাবলিকের শেষ দশায় রোমান চাষীদের মত দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হ'য়ে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জার্মানবাহিনী প্রথমত এইসব স্বাধীন কিষাণ নিয়েই গঠিত হয়। ফ্রান্স-বিজয়ের পর এরাই জার্মান সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ডরূপে গণ্য হ'লেও খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে এরা এত গরিব হ'য়ে পড়লো যে, প্রত্যেক পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও লড়াইয়ে যোগদানের উপায় ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে রাজাই স্বাধীন চাষীদের নিয়ে সৈন্য-বাহিনী গঠন করতেন। ক্রমে নতুন অভিজাতদের পেটোয়াদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী কৃষকবাহিনীর স্থান অধিকার করে। নতুন সৈন্যবাহিনীতে অনেক গোলামও ছিল। আর ছিল এমন-সব লোকজনের বংশধর, যারা রাজা ছাড়া আর কারো অধীনতা স্বীকার করতো না বা আরো সাবেক কালে কোন রাজারও তোয়াক্কা রাখতো না। ফ্রাঙ্ক কিষাণ-সমাজের ইতিপূর্বেই দুর্গতি আরম্ভ হয়, শার্ল্যামেনের উত্তরাধিকারীদের আমলে ঘরোয়া লড়াই, রাজার ক্ষমতা হ্রাস আর সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতদের ক্রম-বর্ধমান অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত নর্মানদের আক্রমণে তা পূর্ণতা লাভ করে। অভিজাতদের মধ্যে শার্ল্যামেনের সৃষ্ট গাউ-কাউন্টদলও ছিল। তারা বংশানুক্রমিক অভিজাতদল সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লাগে। মোটের উপর, ৪০০ বছর পূর্বে রোমান-সাম্রাজ্য যে-ভাবে ফ্রাঙ্কদের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে, শার্ল্যামেনের মৃত্যুর মাত্র ৬০ বছর পর ফ্রাঙ্কদের সাম্রাজ্য নর্মানদের পদতলে তেমনি অসহায় হ'য়ে নতি স্বীকার করে।

বহির্শক্তির সামনে তেমনি ক্লৈব্য ও তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা বরং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পূর্ববর্তী রোমান কলোনিস্ট চাষীদের মতই স্বাধীন ফ্রাঙ্ক চাষীদের চরম দুরবস্থা। যুদ্ধ হাঙ্গামায় লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে তারা নতুন অভিজাত বা গির্জার শরণাপন্ন হ'তে বাধ্য হয়। রাজা তখন এমন শক্তিহীন যে, তাঁর শরণাপন্ন হওয়া তখন বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের জন্য চাষীদের চরম ক্রয়-মূল্য দিতে হয়। পূর্ববর্তী গলিক চাষীদের মত তারা আশ্রয়দাতা

অভিজাতদের নিকট জমি-জমার মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরিত ক'রে পরিবর্তনশীল বিভিন্ন রায়তি-স্বত্বে ঐ সমস্ত জমি ফেরত পায় বটে, কিন্তু বিনিময়ে তাদের খাজনা যোগাতে আর নানাভাবে প্রভুদের সেবা করতে হয়। এই পরাধীনতা ক্রমে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। কয়েক পুরুষের মধ্যে এদের অধিকাংশই ভূমি-গোলামে পরিণত হয়। স্বাধীন কৃষকের দল যে কিরূপ তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়, তা ইর্মিনন্ লিখিত "সাঁ জার্মাদে-প্রে" গির্জার দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণীতে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। গির্জাটি পূর্বে প্যারির নিকট অবস্থিত থাকলেও এখন প্যারি শহরের অন্যতম ধর্ম-মন্দিরে পরিণত। পার্শ্ববর্তী পল্লি-অঞ্চলে এই গির্জার বিশাল দেবোত্তর জমি-জমা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। শার্ল্যামেনের আমলে এই দেবোত্তর জমিদারিতে ২,৭৮৮টি পরিবার বসবাস করতো। এদের সকলেই জার্মান নামধারী ফ্রাঙ্ক-জাতীয় লোক ছিল। এদের মধ্যে ২০৮০টি ছিল কলোনিস্ট পরিবার, ৩৫টি আংশিক স্বাধীনতাযুক্ত পরিবার, ২২০টি গোলাম পরিবার এবং মাত্র ৮জন স্বাধীন রায়ত ছিল। শালভিয়ানুস্ ভগবৎ-বিরোধী প্রথা বলে এর তীব্র নিন্দা করেন। আশ্রয়দাতা মোহান্ত চাষীর জমিজমা নিজের সম্পত্তিরূপে গ্রহণ ক'রে তাকে মাত্র জীবিতকাল পর্যন্ত ভোগদখলের অধিকার দান করে। গির্জা এখন প্রায়ই এই সমস্ত জমির চাষীদের বিরুদ্ধে এই প্রথা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। বেগার খাটানোর রেওয়াজও বেড়ে চলে। রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক খাটানোর রোমক "আঞ্জরি"-প্রথাও ঠিক এই ধরণের চিহ্ন। জার্মান মার্ক বা পল্লি-সমবায়ের সদস্যদেরও সর্বসাধারণের উপযোগী সড়ক ও সেতু তৈরি ইত্যাদি কাজে এই ভাবেই বাধ্য করা হয়। কাজেই দেখা যায়, ৪০০ বছর পরেও জনসাধারণের অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরম্' রয়ে যায়।

এতে দুটো বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত, রোম-সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন যে অবস্থায় ছিল, সমাজের স্তর-বিন্যাস ও ধন-সম্পত্তি-বণ্টনও ঠিক সেই মাফিক ছিল। কাজেই, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায়ই নেই। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী চারশ ব'ছর ধরে ধন-দৌলত উৎপাদনের নতুন কোন কৌশলই উদ্ভাবিত হয় নি। কাজেই, ধন-সম্পদ উৎপাদন-রীতি ও সমাজের স্তর-বিন্যাস অব্যাহত অবস্থাতেই ছিল। রোম-সাম্রাজ্যের শেষের শতাব্দীগুলোয় শহরগুলো পল্লির উপর ইতিপূর্বে যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তা থেকে বিচ্যুত হয়। জার্মান শাসনের প্রথম

শতাব্দীতেও শহর পল্লীর উপর এই প্রাধান্য ফিরে পায়নি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা নিতান্ত নিম্ন স্তরেই ছিল। এই সাধারণ পরিস্থিতির ফলে বড় বড় জমিদার আর ছোট ছোট অধীন রায়তেরই সৃষ্টি হয়। এইরূপ সমাজের সঙ্গে গোলামদল দ্বারা পরিচালিত রোমান লাতি-ফুন্দিয়া প্রথা বা ভূমি-গোলামদের দ্বারা পরিচালিত নবীনতর বড় বড় কৃষিক্ষেত-সমূহ যে খাপ খায় না তার রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায় শার্ল্যামেনের বিখ্যাত বড় বড় রাজকীয় জমিদারিগুলোর পরীক্ষামূলক কার্য-পরিচালন থেকে। এইসব পরীক্ষা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধরনের হ'লেও তার চিহ্নও নেই। এর জের চলতে থাকে কেবল মাত্র খৃস্টীয় মঠগুলোয় এবং কেবলমাত্র এইগুলোর পক্ষে কার্যকরী বা ফলদায়কও ছিল; কিন্তু মঠগুলো ছিল চিরকৌমার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অস্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এইগুলো অস্বাভাবিক বা অনন্যসাধারণ কাজও করতে পারতো। সেইজন্য সাধারণ অবস্থার পরিবর্তে এইগুলো ব্যতিক্রমেই পর্যবসিত হয়েছিল।

তা সত্বেও এই চারশ বছরের ভেতরে কিছু প্রগতিও সাধিত হয়েছিল। এই চারশ বছরের প্রারম্ভে যে সমস্ত শ্রেণী ছিল শেষ ভাগেও সেই সমস্ত শ্রেণী অব্যাহত থাকলেও দুই সময়ের নর-নারীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটেছিল। প্রাচীন যুগের গোলামি আর ছিল না। শারীরিক পরিশ্রম গোলামদেরই সাজে—এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে যারা শারীরিক পরিশ্রম করতে ঘৃণাবোধ করতো সেই সমস্ত নিঃস্ব স্বাধীন লোকের দলও উজাড় হয়ে গিয়েছিল। রোমান যুগের কলোনিস্ট চাষী ও নতুন ভূমি-গোলাম, এ-দুয়ের মাঝামাঝি স্বাধীন ফ্রাঙ্ক-চাষী উদ্ভূত হয়। মরণ-পথের-যাত্রী রোমান কৃষ্টির "নিরর্থক স্মৃতি আর এ-নিয়ে মিথ্যে চেষ্টাচরিত্রও" সমাধিস্থ ও অতীতের বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়। অবনত সভ্যতার পতনশীলতার পরিবর্তে নতুন সভ্যতার গর্ভ-যন্ত্রণার ভেতরেই নবম শতাব্দীর সামাজিক স্তর বা শ্রেণীগুলো উদ্ভূত হয়। পূর্ববর্তী রোমানদের তুলনায় নতুন জাতের লোকজন প্রভু-ভৃত্য-নির্বিশেষে সকলেই ছিল মানুষের বাচ্চা। শক্তিশালী জমিদার ও সেবক কিষাণদের সম্পর্ক রোমানদের কাছে প্রাচীন জগতের অবনতি ঘটাবার সনাতনী রাস্তা পরিষ্কার করলেও নতুন জাতের লোকজনের সামনে নব-প্রগতির সদর রাস্তাই খুলে দেয়। আরো একটা দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই শতাব্দী-চতুষ্টয় যতই নিষ্ফল মনে হোক-না-কেন, অন্ততপক্ষে, এইগুলোর মধ্যে একটা নতুন জিনিস সৃষ্টি হয়। আধুনিক জাতিগুলোর সৃষ্টি এই সব শতাব্দীর মধ্যেই ঘটে। এই নতুন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই পশ্চিম

ইউরোপের মানুষ পরবর্তী যুগের ইতিহাস সৃষ্টি করে। বাস্তবিকপক্ষে জার্মানরা ইউরোপকে নতুন জীবন দান করে। সেজন্য জার্মান আমলের রাষ্ট্রগুলোর পরিসমাপ্তি নর্স-সারাসেনদের অধীনতার মধ্যে না ঘটে রাজাকর্তৃক প্রজাদের আশ্রয়দান ও প্রজাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা সামন্ত প্রথায় পরিণতি লাভ করে এবং লোকসংখ্যাও এতদূর বেড়ে যায় যে, মাত্র দুই শতাব্দী পরে রক্তক্ষয়ী যে-সমস্ত ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয় ইউরোপ তা অকাতরেই পরিচালন করে।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ অত্যদ্ভুত ইন্দ্রজাল বলে জার্মানরা ইউরোপে নব-জীবনের অনুপ্রেরণা দান করতে সমর্থ হয়? জার্মান জাতের অন্তর্নিহিত কোন সম্মোহনী শক্তিই কি এর মূলীভূত কারণ? আমাদের অত্যুৎসাহী দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকগণ এই রকম কল্পনা-বিলাসের প্রশ্রয় দান করলেও ব্যাপার কিন্তু একরত্তিও তেমন নয়। জার্মানরা বিশেষভাবে সেই সময়ে বহু গুণযুক্ত আর্যজাতি, বিকাশ লাভের নবীন উদ্যমে তারা ভরপুর। তা সত্ত্বেও তাদের বিশেষ ধরনের জাতীয় গুণগুলো ইউরোপকে নব-জীবন দান করে নি। শুধু তাদের বর্বরতা ও গোষ্ঠী-প্রথা ইউরোপের মরা গাঙে বান ডেকে আনে।

তাদের ব্যক্তিগত সাহস ও যোগ্যতা, তাদের স্বাধীনতাবোধ, তাদের গণ-তান্ত্রিক সহজাত প্রবৃত্তি—জনগণের কল্যাণসাধনের পক্ষে এইগুলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। এক কথায়, রোমানরা এই সব খুইয়ে বসে, অথচ রোমান জগতের কাদা খুঁড়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র ও নতুন নতুন জাতি পয়দা করার পক্ষে এই-গুলোর প্রয়োজনই সকলের আগে। এই সমস্ত গুণকে উচ্চস্তরের বর্বরদের স্বধর্ম আর তাদের গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সুফল ছাড়া আর কি বলা চলে?

সাবেক কালের একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথাকে যদি তারা রূপান্তরিত করতে, অর্থাৎ পরিবারের পুরুষ-প্রাধান্যের খর্বতা সাধন ক'রে প্রাচীন জগতের কাছে অচিন্তনীয় নারী মর্যাদা বাড়াতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহ'লে তাদের গোষ্ঠী-প্রথা, আর জননী-বিধির আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত জীবন্ত রীতিগুলো ছাড়া আর কি তাদেরকে এই সমস্ত বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ করতে পারে?

জার্মানী, উত্তর-ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, অন্ততপক্ষে, এই তিনটে বড় দেশে জার্মানরা ফিউড্যাল রাষ্ট্রের ভেতরে মার্ক বা পল্লি-সমবায়ের আকারে এক টুকরো খাঁটি গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান ঢুকিয়ে মধ্যযুগের নৃশংসতম ভূমি-গোলামির আমলেও নিগৃহীত কৃষকশ্রেণীকে এমন স্থানীয় সংহতি ও প্রতিরোধের উপায়ের অধিকারী করে, যা সাবেক কালের গোলাম আর আধুনিক যুগের শ্রমিকদের ভাগ্যে বিনা চেষ্টায় জুটে

উঠে নি। জার্মানদের বর্বরত্ব ও গোষ্ঠীর-প্রতিষ্ঠানের মারফতে আপোষ-মীমাংসার খাঁটি বর্বরসুলভ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিসের বলে তারা এরকম করতে সক্ষম হয়েছে?

জার্মানরা নিজেদের ভূমৃকে এক-প্রকার অপেক্ষাকৃত শিথিল ধরনের দাসত্ব-প্রথা প্রবর্তন করে। তারা ক্রমশ সর্বত্র এই প্রথা প্রবর্তিত ক'রে রোমান-সাম্রাজ্যে গোলামি-প্রথাকে স্থানচ্যুত করে। ফুরিয়ের সর্বপ্রথম বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন যে ইহা গোলামদের ক্রমিক মুক্তি-প্রাপ্তির সুযোগ দান করে। এই প্রথা খাঁটি গোলামি-প্রথার অনেক ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান। খাঁটি গোলামির দোষ হচ্ছে এই যে, ধাপে ধাপে মুক্তি লাভের কোন উপায়ই এখানে নাই, সরাসরি মুক্তি লাভই একমাত্র পন্থা। প্রাচীন জগতে গোলামরা কোন সময়েই বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীন হতে পারেনি। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগের ভূমি-গোলামরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হ'য়ে মুক্তি লাভ করে। বর্বরতা ছাড়া আর কিসের বলে তারা এরূপ করতে সমর্থ হয়? বর্বরতার কল্যাণে জার্মানদের মধ্যে পুরোপুরি গোলামি-প্রথা গড়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীন জগতের গতর-খাটানো গোলাম আর প্রাচ্য জগতের ঘর-গৃহস্থালির গোলাম, দুই-ই তাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

জার্মানরা বর্বরতার জোরেই রোমান জগতে সৃজন-ধর্মী ও শক্তিশালী নব-জীবনের সূচনা করে। কেবলমাত্র বর্বরেরাই ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার জ্বালাযন্ত্রণায় অস্থির জগতকে নব বলে বলীয়ান করে তুলতে পারে। বিচরণ যুগের পূর্বে জার্মানরা বর্বরতার উচ্চ স্তরে অবস্থান করছিল অথবা সেইদিকে এগিয়ে চলেছিল। উচ্চ স্তরের বর্বরতাই পূর্বোক্ত নব-জীবনসঞ্চারে সক্ষম। এই বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার করলেই সমস্তাটা পরিষ্কার হয়ে আসে।

———

নবম অধ্যায়

বর্বরজীবন ও সভ্যতা

তিনটে পৃথক বড় বড় দৃষ্টান্ত : গ্রীক, রোমান ও জার্মানদের মধ্যে আমরা গোষ্ঠী-প্রথায় ভাঙন আগাগোড়া লক্ষ্য করেছি। বর্বরযুগের উচ্চস্তরে গোষ্ঠী-প্রথায় যে ভাঙন ধরে সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। যে-সমস্ত সাধারণ অর্থনৈতিক কারণে গোষ্ঠী-প্রথা এইভাবে লুপ্ত হয় উপসংহারে তা আমরা খতিয়ে দেখ্‌তে চাই। এখানে মর্গ্যান-প্রণীত গ্রন্থের মত মার্ক্‌স্‌ প্রণীত "ক্যাপিটাল" গ্রন্থেরও প্রয়োজন হবে।

অসভ্য অবস্থার মধ্যস্তরে গোষ্ঠী-প্রথার জন্ম। অসভ্য অবস্থার উচ্চস্তরে ইহা আরো বেশি বিকশিত হ'য়ে বর্বর অবস্থার নিম্নস্তরে চরম বিকাশ লাভ করে। তথ্য-প্রমাণাদি থেকে আমরা এই অবস্থারই সন্ধান পাই। সেই জন্য বর্বর অবস্থার নিম্নস্তর থেকেই আমরা আলোচনা পরিচালনের প্রয়াসী।

এই স্তর সম্পর্কে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্তরূপে কাজ করবে। এই স্তরে গোষ্ঠী-প্রথা এদের মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করে। উপজাতি এখানে অনেকগুলি—সাধারণত দুটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল-গোষ্ঠী দুহিতৃ-স্থানীয় বহু গোষ্ঠীতে আর জননী-গোষ্ঠীটা ফ্রেত্রীতে পরিণত হয়, উপজাতিও অনেকগুলো উপজাতিতে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। নব-গঠিত প্রত্যেকটি উপজাতির মধ্যে অনেকাংশে পুরাতন গোষ্ঠীরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপজাতিগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কন্‌ফেডারেসী বা উপজাতি-সঙ্ঘেও সম্মিলিত হয়। যে সামাজিক অবস্থার ভেতরে এই প্রতিষ্ঠান বা শাসন-কাঠামো উদ্ভূত হয় তাতে এর বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। আর ঐগুলোর সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্যও দেখা যায় না। ঐ সমস্ত অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান অপর কিছুই নয়। আর ঐরূপ অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে প্রতিষ্ঠানটি তার পূর্ণ মীমাংসা করতেও সক্ষম। বাইরের বিরোধের মীমাংসা হ'তো যুদ্ধ দ্বারা। যুদ্ধরত একটা উপজাতির ধ্বংসের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘট্‌লেও যুদ্ধের ফলে কোন উপজাতি বিজিত বা অধীন উপজাতিরূপে গণ্য হ'তো না। গোষ্ঠী শাসন-কাঠামোর ভেতরে

শাসক ও শাসিতের কোন স্থান নেই। ইহা গোষ্ঠীপ্রথায় মহত্ত্ব, তথা, দৌর্বল্যও বটে। তখনকার দিনে উপজাতির ভেতরে কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে ভেদরেখাও ছিল না। সর্বজনীন কাজ, রক্তের প্রতিশোধ বা প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদিতে যোগদান কর্তব্য না অধিকার—ইণ্ডিয়ানদের নিকট এই প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। এই ধরনের প্রশ্ন, খাওয়া, ঘুমানো বা শিকার করা কর্তব্য না অধিকার—এই প্রশ্নের মতই তার নিকট অসঙ্গত মনে হ'তো। উপজাতি বা গোষ্ঠীর ভেতরে শ্রেণী-বিভাগও ছিল অসম্ভব। এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য, কিরূপ অর্থনৈতিক ভিত্তির ফলে এই ধরণের পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা যায়।

সুবিস্তৃত এলাকায় খুব অল্পসংখ্যক লোকের বসবাস। মাত্র উপজাতির মূল উপনিবেশে ঘন লোকবসতি। এই উপনিবেশের চারদিকে বলয়ের আকারে শিকারভূমি, শিকারভূমি-নিরপেক্ষ বন-জঙ্গলের বলয় দিয়ে ঘেরা; এই নিরপেক্ষ অঞ্চল এক উপজাতিকে অপর উপজাতি থেকে ফারাগ্ করে রাখে। শ্রম-বিভাগও আদিম ধরনের। কেবল মাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান। পুরুষ যুদ্ধ করে, শিকার করে ও মাছ ধরে, আহার্যের কাঁচা উপকরণ ও ঐ-সমস্ত আহরণের হাল-হাতিয়ার তৈরি করে। ঘরকন্না দেখা-শোনা, আহার্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি তৈরি, রান্না-বান্না, বয়ন ও সেলাইয়ের ভার নারীর উপর অর্পিত। প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রধান। পুরুষের এক্তিয়ার বন-জঙ্গলে, নারীর ঘর-গৃহস্থালিতে। প্রত্যেকেই আপন আপন হাল-হাতিয়ারের মালিক; অস্ত্র-শস্ত্র, শিকার ও মাছধরার যন্ত্রপাতির অধিকারী পুরুষ, বাসন-কোশন, ও ঘর-গৃহস্থালির আসবাবপত্র নারীর সম্পত্তি। ঘরে-গৃহস্থালিও পরিচালিত হয় যৌথভাবে—কয়েকটি পরিবার এবং প্রায়ই বহু পরিবারের সমবায়ে। (১) বাড়ি, বাগান, লম্বা নৌকা ইত্যাদি যৌথভাবে উৎপন্ন সমস্ত সম্পত্তি যৌথ বা সর্বজনীন সম্পত্তিরূপে গণ্য। আইনবিদ্ ও ধন-বিজ্ঞানবেত্তারা হামেশাই "আপন মেহনৎ-জাত সম্পত্তি" সভ্য সমাজের দস্তুর বলে যে বাণী প্রচার করে থাকেন এখানেই,

(১) বিশেষত আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থা এই রকমই ছিল। ব্যাংক্রফট লিখিত বিবরণীতে তা বেশ উপলব্ধি হবে। কুইন শার্লট দ্বীপে হাইদারের মধ্যে এক পরিবারে অনেক সময় ৭০০ নর-নারীকে একত্রে বাস করতে দেখা যায়। নুটকাদের মধ্যে এক-একটা গোটা উপজাতি এক এক গৃহস্থালির অন্তর্ভুক্ত। —এঙ্গেল্স্।

এবং একমাত্র এখানেই তার বাস্তব সাক্ষাৎ মিলে। সর্বশেষে এই আইনের ফাঁকি বা জুয়াচুরিকে ভিত্তি করেই আধুনিক পুঁজিবাদী সম্পত্তি টিকে আছে।

মানুষ কিন্তু সর্বত্রই এই স্তরে থেকে যায়নি। এশিয়াবাসী জানোয়ারকে পোষ মানিয়ে সে-গুলোর বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। বুনো গাই-মোষ শিকার করতে হ'তো, কিন্তু পোষা-গাই-মোষ বছরে একটা করে বাচ্ছা প্রসব করতো আর দুধও দিত। সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী কতকগুলো উপজাতি—আর্য, সেমিট, খুব সম্ভব তুরানিয়ানগণও—প্রথমত গবাদি পশুকে পোষ মানাতে আরম্ভ ক'রে শেষপর্যন্ত ঐগুলোর বংশবৃদ্ধি ও পালন করা প্রধান পেশা বা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে। পশু-পালক উপজাতিগুলো অন্যান্য বর্বরদের দল ত্যাগ ক'রে পৃথক হয়ে পড়ে। এই-ভাবে দুনিয়ায় সর্বপ্রথম শ্রমের সামাজিক বিভাগ রূপ পরিগ্রহ করে। পশু-পালক উপজাতিরা অন্যান্য বর্বরদের তুলনায় কেবলমাত্র অধিকতর পরিমাণে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপন্ন করেনি, রকমারি জিনিসপত্র উৎপাদনও তাদের বিশেষত্বে পরিণত। অন্যান্য বর্বরদের তুলনায় তারা দুধ ও দুধের জিনিসপত্র এবং অধিকতর পরিমাণে মাংস ভোজন ত করতোই, উপরন্তু, চামড়া, পশম, ছাগলোম ও পশমের বোনা জিনিসপত্রেরও তারা অধিকারী হয়। এই সমস্ত কাঁচামাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব জিনিস তাদের মধ্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে পরিণত হয়। এইভাবে সর্বপ্রথম নিয়মিত দ্রব্য-বিনিময়ও সম্ভব হয়। প্রথম প্রথম বিনিময় ঘটতো কালেভদ্রে। অস্ত্র ও হাল-হাতিয়ার নির্মাণে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেষ্টা-চরিত্রের ফলে সাধারণভাবে শ্রম-বিভাগও ঘটে থাকবে। এই জন্য নানাস্থানে প্রস্তরের হাল-হাতিয়ার তৈরির কারখানাসমূহের ধ্বংসাবশেষ অভ্রান্তরূপে আবিষ্কৃত হয়। ঐ সমস্ত কারখানা প্রস্তরযুগের শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়। এই সব কারখানায় যে সব কারিগর হাত-পাকায় তারা যতদূর সম্ভব সমাজের জন্যই কাজ করে। ভারতের গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়গুলোয় এখনো প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কারিগর এইভাবেই কাজ করে থাকে। এই অবস্থায় বিনিময় উপজাতির সীমানার বাইরে বড় একটা ঘটতো না। ঘটলেও তা অনন্যসাধারণ ঘটনারূপে গণ্য হ'তো। কিন্তু এখন পশুপালক উপ-জাতিদের বিকাশ ও স্থিতাবস্থার ফলে বিভিন্ন উপজাতির সদস্যদের মধ্যে বিনিময় চালাবার অবস্থা বেশ পেকে উঠে, আর বিনিময়-ব্যবস্থা নিয়মিত প্রতিষ্ঠানেও বিকাশ লাভ করে। প্রথমত উপজাতিতে উপজাতিতে বিনিময়

চল্‌তো তাদের গোষ্ঠীপতিদের মারফতে। কিন্তু পশুপাল যতই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হ'তে থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় ততই সাধারণ ব্যাপারে এবং শেষপর্যন্ত একমাত্র উপায়ে পরিণত হয়। প্রথম প্রথম পশুপালক উপজাতিগুলোর মধ্যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে গবাদি পশুই ছিল বিনিময়ের প্রধান উপাদান। গো-মহিষের মাপকাঠিতেই অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হ'তো, সকলে আগ্রহের সঙ্গে বিনিময়-দ্রব্য হিসাবে তা গ্রহণও করতো। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, গো-মহিষ মুদ্রার মর্যাদা লাভ করে, আর এই স্তরে মুদ্রার কাজও করে। এমন কি পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের প্রাথমিক উষায় মুদ্রারূপ পণ্যদ্রব্যের প্রয়োজন এমনি প্রয়োজনীয়তা ও গতিবেগ নিয়ে বিকাশ লাভ করে।

ফলের চাষ বা গাছের চাষ, এশিয়াবাসী নিম্নস্তরের বর্বরদের নিকট যতদূর-সম্ভব অজ্ঞাত ছিল। কৃষিকাজের পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে তারা বর্বর অবস্থার মধ্যস্তরে এদিকে মনোনিবেশ করে থাক্‌বে। তুরানিয়ান্ মালভূমির আব্‌হাওয়ায় পশু-খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া দীর্ঘ ও কঠোর শীতকালে জানোয়ার পালন অসম্ভব। কাজেই, এখানে জমিতে ঘাসের ব্যবস্থা করা আর শস্যের চাষ-আবাদের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। কৃষ্ণসাগরের উত্তর-তীরবর্তী "স্টেপ" ভূমিরও একই অবস্থা। কিন্তু জীব-জানোয়ারের জন্য ফসল উৎপন্ন করলে তা শীঘ্রই মানুষের খাদ্যেও পরিণত হয়। আবাদী-জমি তখনো উপজাতির সম্পত্তি থাকে। প্রথমত, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আবাদী জমি বিভক্ত হয়। গোষ্ঠীর পরে বিভিন্ন পরিবার-সমবায়ের মধ্যে জমি ভাগ করা হয়; শেষপর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যও জমি-জমা বিভক্ত হয়। ভোগদখলকারীরা কিছু কিছু দখলী-স্বত্ব ভোগ করে এই মাত্র; এর বেশি কারুরই কোনো অধিকার ছিল না।

এই স্তরের শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে দুটো জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার দরকার। প্রথমেই তাঁতের কথা উল্লেখ করতে হয়। তারপরেই ধাতু গালাই ও ধাতুর কাজকর্মের স্থান। তামা ও টীন এবং এই দু'য়ের মিশ্রণে উৎপন্ন পিতল ও ব্রোঞ্জ ছিল প্রধান ধাতু। ব্রোঞ্জ দিয়ে কাজের উপযোগী হাল-হাতিয়ার ও অস্ত্র-নির্মিত হলেও ইহা পাথরের হাল-হাতিয়ারকে স্থান-চ্যুত করতে পারে নি। একমাত্র লোহা দ্বারাই তা সম্ভব। কিন্তু লৌহ-আহরণের কর্ম-কৌশল তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। অলঙ্কার ও সাজ-সজ্জার জন্য সোণা-রূপার ব্যবহার সবেমাত্র শুরু হয় আর তামা ও ব্রোঞ্জের তুলনায় তা অধিকতর মূল্যবানরূপেও বিবেচিত হয় নিশ্চয়ই।

সমস্ত বিভাগে—পশুপালনে, কৃষিকাজে ও কুটির-শিল্পে—উৎপাদন বৃদ্ধি মানুষের শ্রমশক্তিকে টিকে থাকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে সক্ষম করে। এই সঙ্গে গোষ্ঠী, পরিবার-সমবায় বা এক-একটা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষে দৈনিক মেহনতের মাত্রাও বেড়ে চলে। কাজেই, আরো, আরো বেশি শ্রম-শক্তির প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যুদ্ধ মানুষের এই অভাব পূরণ করে। যুদ্ধবন্দীরা গোলামে পরিণত হয়। শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির ফলে সম্পদ বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ক্ষেত্রেরও পরিসর বৃদ্ধির ফলে তদানীন্তন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শ্রমের প্রথম বড় রকমের সামাজিক বিভাগের জেরস্বরূপ গোলামি-প্রথা আবির্ভূত হয়। শ্রমের প্রথম বড় রকমের সামাজিক বিভাগের ফলে সমাজ সর্বপ্রথম দুটো বড় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। একটা শ্রেণী প্রভু ও আর একটি শ্রেণী গোলাম; একটা শ্রেণী শোষণকারী ও আর একটা শ্রেণী শোষিত, নিগৃহীত শ্রেণীতে পরিণত হয়।

পশুপালগুলো উপজাতি বা গোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ থেকে কখন এবং কিভাবে ব্যক্তিগত পরিবার-নায়কদের হাতে আসে, তা বর্তমানে বুঝে ওঠা দুষ্কর হ'লেও এই স্তরেই তা অবশ্যই ঘটেছে। পশুপাল ও অন্যান্য নতুন ধন-দৌলতের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-কাঠামোর মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। জীবন-যাত্রার নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সংগ্রহের ভার ছিল পুরুষের উপর। এই সমস্ত জিনিসপত্র সে উৎপন্ন করতো এবং উৎপাদনের হাল-হাতিয়ারগুলোরও মালিক ছিল সে। পশুপালগুলো এখন এইসব জিনিসপত্র সংগ্রহের নতুন উপায়রূপে গণ্য। প্রথমত, জীব-জানোয়ার পোষা, তদনন্তর, এইগুলো পালন করাও পুরুষের কাজে পরিণত। কাজেই, সে পশুপাল আর পশুপালের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্য ও গোলামের দলেরও মালিক। জীবনযাত্রার নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের বেলায় যা-কিছু উদ্বৃত্ত হ'তে থাকে সেই সমস্ত বাড়তি জিনিসপত্র এখন পুরুষের হিস্যায় পড়ে। নারী এইগুলো ভোগ করতে পারতো কিন্তু তার কোন মালিকানা-স্বত্ব ছিল না। "অসভ্য" যোদ্ধা ও শিকারী আপন বাড়িতে দ্বিতীয় স্থান দখল ক'রে ও নারীকে প্রাধান্য দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। "ভদ্রতর" পশুপালক ধন-দৌলতের গরমে নারীকে নীচে ঠেলে ফেলে প্রথম স্থান দখল করে বসে। নারীর অভিযোগ করার উপায় ছিল না। পারিবারিক শ্রম-বিভাগ নারী ও পুরুষের ধন-সম্পত্তি বিভাগও নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রম-বিভাগ অব্যাহতই থাকে; মধ্যে থেকে, যেহেতু পরিবারের বাইরে শ্রমবিভাগের পরিবর্তন ঘটে সেইজন্য পূর্বতন পারিবারিক

সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়। ঘরকন্নার কাজেই নারীর তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে কাজের জন্য ঘর-গৃহস্থালিতে নারীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়, ঠিক সেই কাজের জন্যই এখন ঘর-গৃহস্থালিতে পুরুষের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য পুরুষের কাজের কাছে নারীর ঘরকন্নার কাজ এখন আর তেমন গণ্য নয়। পুরুষের কাজই এখন মূল্যবান, নারীর কাজ নগণ্য বাজে কাজ মাত্র। এই মূল্যবান দৃষ্টান্ত থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, নারীকে যতদিন সমাজের ধন-সম্পদ উৎপাদনের কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত রেখে ঘরকন্নার ব্যক্তিগত কাজে আবদ্ধ রাখা হবে ততদিন নারীর মুক্তিসাধন তাকে পুরুষের সমকক্ষ করার চেষ্টা অসম্ভবই থেকে যাবে। নারী যখন গোটা সমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ধন-সম্পদ উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করবে আর ঘরকন্নার কাজ যত নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে ও অবলীলাক্রমে সাঙ্গ করতে সক্ষম হ'বে, নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব হবে। আধুনিক যুগের ব্যাপক শিল্প-প্রচেষ্টার কল্যাণে একমাত্র বর্তমানেই তা সম্ভব হ'তে পেরেছে। কারণ বর্তমান যুগের বড় বড় কলকারখানাগুলো কেবলমাত্র বহুসংখ্যক নারী-শ্রমিককে প্রবেশাধিকারই দেয় নি, নারী শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাও উপস্থিত হয়েছে। আর বর্তমান যুগের কারখানা-শিল্প ব্যক্তিগত ঘরকন্নার কাজকে সামাজিক শিল্পে পরিণত করতেও চেষ্টা করছে।

গৃহে পুরুষের বাস্তব প্রাধান্য সংস্থাপিত হওয়ায় তার স্বৈর-শাসনের পথে শেষ বাধাটাও দূর হ'য়ে যায়। জননী-বিধির স্থানে পুরুষ-বিধি প্রবর্তন আর জোড়-পরিবারের স্থলে ক্রমশ একনিষ্ঠ-বিবাহ-প্রথা কায়েম হওয়ায় এই স্বৈর-শাসন শিকড় গেঁড়ে বসে চিরন্তনী প্রথায় পরিণত হয়। তাতে পুরাতন গোষ্ঠী-প্রথার অঙ্গে আর এক ঘা পড়ে। পরিবার শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়, ফলে ইহা গোষ্ঠীর মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে।

আলোচনার পরবর্তী ধাপে আমরা বর্বরযুগের উচ্চস্তরে এসে পৌঁছাচ্ছি। এখানে আমরা সমস্ত সভ্যজাতির বীর যুগের সাক্ষাৎ পাই। ইহা হচ্ছে লোহার তলোয়ার, তণা, লোহার লাঙল ও কুঠারের যুগ। লোহা এখন মানুষের সেবায় নিযুক্ত। একমাত্র গোল আলু ছাড়া লোহাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা-মাল যা মানব-সমাজের ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করে। লোহার কল্যাণে মানুষ বড় বড় ভূ-খণ্ডে চাষ-আবাদ চালাতে পারে, আদিম যুগের সুবিশাল বনভূমি-গুলোও সাফ করতে সক্ষম হয়। লোহা কারিগরের হাতে এমন শক্ত ও ধারাল

হাতিয়ার যোগায় যার আঘাত কোন পাথর বা অপর কোন ধাতুর পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু লোহার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয় ধীরে ধীরে। প্রথমে লোহা ছিল ব্রোঞ্জের চেয়েও বেশি নরম। কাজেই পাথরের অস্ত্রগুলো লোপ পায় ক্রমে ক্রমে। কেবলমাত্র "হিন্ডেব্রাণ্ড" গাথায় নয়, ১০৬৬ খ্রস্টাব্দে হেস্টিংসের যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রস্তর কুঠারের চলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহনির্মিত দ্রব্যাদির উন্নতি কিছুতেই বাধা পায় না। বাধা-বিঘ্নগুলো ক্রমশ লোপ পেতে থাকে আর উন্নতিও চলতে আরম্ভ করে দ্রুত বেগে। পাথর অথবা ইটের ঘরবাড়ি, চারদিকে পাথরের দেওয়াল, দুর্গচূড়া ও প্রাকারাদিযুক্ত শহর উপজাতি বা উপজাতি-সঙ্ঘের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। বাস্তু-শিল্পের দিক থেকে বিরাট অগ্রগতিই বটে, কিন্তু তবুও ইহা ক্রম-বর্ধমান বিপদেরও পরিচায়ক ; সেইজন্য রক্ষা ব্যবস্থারও প্রয়োজন। ধন-সম্পদ বেড়ে চলে দ্রুত গতিতে। সম্পদ তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্য, ধাতুর কাজ ও অন্যান্য কুটির-শিল্প ক্রমেই বৈচিত্র্যে ভরে উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। শস্য, ফল, মূল ছাড়া মদ ও তৈল নিষ্কাসনের উপযোগী শস্যের চাষ আবাদও আরম্ভ হয়। মানুষ মদ ও তৈল তৈরি করতেও শিখে। কিন্তু এইভাবে নানামুখী কাজকর্ম করা আর একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, **শ্রমের দ্বিতীয় বড় রকমের বিভাগ সৃষ্টি হয়।** কুটির-শিল্প কৃষিকাজ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। অনবরত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রম-শক্তির মূল্যও বেড়ে চলে। পূর্ববর্তী যুগে গোলামির শৈশব অবস্থা, গোলামদের সংখ্যা অল্প এবং মাঝে মাঝে তাদের প্রয়োজন হ'লেও গোলামি এখন সমাজের অপরিহার্য অংশে পরিণত হ'য়ে পড়ে। গোলামরা এখন আর কেবলমাত্র উৎপাদনে সাহায্য করে না, দলে দলে তারা কৃষিক্ষেত্র আর কারখানায় প্রেরিত হতে থাকে। উৎপাদন কৃষিকাজ ও কুটির শিল্প—এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র বিনিময়ের উপযোগী মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হ'তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও দেখা দেয়। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ ও উপজাতির সীমানার মধ্যে নয়, সাগর পারেও ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্তই তখন প্রাথমিক ও অনুন্নত অবস্থায়। মূল্যবান ধাতুগুলো সবেমাত্র প্রাধান্য লাভ ও সাধারণ মুদ্রারূপী পণ্যদ্রব্যরূপে গণ্য হ'তে আরম্ভ করে। মুদ্রা তখনো নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয় নি। বহুমূল্য ধাতুগুলো ওজন-হিসাবে বিনিময়ের কাজ চালাতে আরম্ভ করে।

স্বাধীন-গোলাম ভেদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধনী-দরিদ্র ভেদও উপস্থিত হয়। নতুন শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজ নতুন নতুন শ্রেণীতেও বিভক্ত হয়। বিভিন্ন পরিবারের সম্পত্তির তারতম্যের ফলে স্থানে স্থানে যে দু-চারটে পরিবার-সমবায়ের অস্তিত্ব ছিল তাও ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই সব সমাজ-কেন্দ্রের জন্য যে সব যৌথ চাষবাস চলে তারও অবসান হয়। আবাদের জমি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে, প্রথমত, সাময়িকভাবে, পরে স্থায়ীভাবে বিলি-বন্দোবস্ত হয়। পুরাপুরি ব্যক্তিগত সম্পত্তির রেওয়াজ, জোড়-বিয়ের স্থলে একনিষ্ঠ-বিয়ের ক্রমিক প্রবর্তনের জুড়িদাররূপে আস্তে আস্তে সমাজে শিকড় গেড়ে বসে। পরিবারই এখন সমাজের অর্থনৈতিক একক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভিতরের, তথা, বাইরের কাজকর্মগুলো অধিকতর ঘন-সংবদ্ধ করার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপজাতি-গুলোকে নিয়ে সংঘ গঠন সর্বত্রই প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে থাকে। এই সংগঠনের ফলে বিভিন্ন উপজাতীয় এলাকাগুলোও একত্রিত হ'য়ে এক একটা জাতীয় এলাকায় পরিণতি লাভ করে। রেক্স, বাসিলিউস ও থিউদান্স—এই সমস্ত নামের সমর-সর্দাররা অপরিহার্য স্থায়ী অফিসারের মর্যাদা লাভ করে। যে সব জায়গায় ছিল না, সেখানেও জাতীয় পরিষদ বা সর্বজনীন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সমাজ সামরিক গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করে। লড়াইয়ের সর্দার গোষ্ঠিপতিদের কাউন্সিল ও গণপরিষদ এই গণতন্ত্রের বিভিন্ন শাখা বা বাহনে পরিণত হয়। সামরিক গণতন্ত্র এই জন্য যে, যুদ্ধ আর যুদ্ধের উপযোগী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তখন জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। প্রতিবেশীদের ধন-দৌলত লোকের মনে লোভের সৃষ্টি করতে থাকে। ধন সম্পদ অর্জন তখন লোকের অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে গণ্য হয়। মানুষের তখন বর্বর অবস্থা। পরিশ্রমের পরিবর্তে লুট-তরাজের দ্বারা ধনোপার্জন তাদের কাছে সহজ এবং সম্মানজনকও বটে। পূর্বে প্রতিশোধ গ্রহণ বা এলাকা বাড়ানোর জন্য যুদ্ধ-হাঙ্গামা উপস্থিত হ'তো। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এলাকাগুলো ক্রমেই ছোট বিবেচিত হয়। এখন কিন্তু নিছক লুটতরাজের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ পরিচালিত হ'য়ে লুণ্ঠন রীতিমত ব্যবসায়ে পরিণত হয়। দুর্গপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত নতুন শহরগুলোর চারদিকে ভয়াবহ দুর্গপ্রাচীরগুলো নিতান্ত অকারণে গজিয়ে উঠেনি। দুর্গের প্রশস্ত গড়খাইগুলোয় গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান সমাধিস্থ হয় আর দুর্গচূড়োগুলো সভ্যতাতে গিয়ে ঠেকে। ভিতরের অবস্থারও একই রকম পরিবর্তন ঘটে।

লুট-তরাজের সংগ্রাম লড়াইয়ের সর্বোচ্চ সর্দার আর অধীনস্থ সর্দারদের শক্তি বাড়িয়ে তোলে। একই পরিবার থেকে তাদের উত্তরাধিকার নির্বাচনের সাধারণ রেওয়াজ, বিশেষত, জনক-বিধি প্রবর্তিত হওয়ার পর বংশগত উত্তরাধিকার প্রথায় পরিণত হয়। জনসাধারণ প্রথমত ইহা কোন রকমে সহ্য করলেও ক্রমশ ইহা দাবিতে, এমনকি, শেষপর্যন্ত জোর-জবরদস্তিতে পরিণত হয়। বংশগত রাজতন্ত্র ও বংশগত আভিজাত্যের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠী-কাঠামোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এইভাবে জনসাধারণ,গোষ্ঠী, ফ্রেত্রী, আর উপজাতির মধ্যে নিহিত মূল থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান তার বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উপজাতিদের স্বাধীনভাবে আপন আপন কাজকর্ম পরিচালনের প্রতিষ্ঠান থেকে ইহা ক্রমে প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন ও তাদের উপর অত্যাচার চালাবার যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী চলাফেরার যন্ত্র থেকে, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগহীন, তাদের উপর প্রভুত্ব খাটানো আর তাদের নিগ্রহ করার হাতিয়ারে পরিণত হয়। ধন-সম্পদের প্রতি লোভবশত গোষ্ঠীর সদস্যেরা যদি ধনী ও নির্ধনে বিভক্ত না হ'তো, "একই গোষ্ঠীর বেষ্টনীর মধ্যে সম্পত্তিগত পার্থক্যের ফলে গোষ্ঠীগত পারস্পরিক স্বার্থের ঐক্য যদি এর সদস্যদের পারস্পরিক বিরোধিতায় পরিণত না হ'তো" (মার্ক্স্), আর গোলামি-প্রথার বিকাশের ফলে জীবনযাত্রার জন্য গতরখাটানো কেবলমাত্র গোলামদের সাজে, লুট-তরাজ এর তুলনায় ঢের সম্মানজনক—এই মনোভাবের সৃষ্টি না হ'তো, তাহলে এই অবস্থা কখনই ঘটতে পারতো না।

* * * *

আমরা এখন সভ্যতার প্রবেশ-দ্বারে সমাগত। সভ্যতার প্রারম্ভেই আমরা শ্রম-বিভাগের নতুন অগ্রগতির সাক্ষাৎ পাই। বর্বরযুগের নিম্নস্তরে মানুষ মূলত তাদের নিজের অভাব পূরণের জন্যই ধন-সম্পদ উৎপন্ন করে। পণ্য-বিনিময় সে যুগে ঘটতো কালে-ভদ্রে। দৈবাৎ যদি কোন বাড়তি জিনিষপত্র দেখা দিত তবেই মানুষ বিনিময়ের চেষ্টা করতো। বর্বরযুগের মধ্যস্তরে আমরা দেখি পশু-পালকেরা পশুপালের দ্বারা লোকের অভাব পূরণের পর বেশ-কিছু বাড়তি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। তখন শ্রমবিভাগ পশু-পালক ও পশু-সম্পদহীন অনুন্নত এই দুই শ্রেণীর উপজাতিদের মধ্যে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। কাজেকাজেই, পাশা-পাশি দু'টো উৎপাদনের স্তর আর দু'টোর মধ্যে নিয়মিত বিনিময় পরিচালনের উপযোগী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্বরযুগের উচ্চস্তরে কৃষি ও কুটিরশিল্পের মধ্যে

নতুন শ্রম-বিভাগেরও সৃষ্টি হয়। শ্রমজাত ক্রমবর্ধমান বাড়তি সম্পদের প্রত্যক্ষ বিনিময়ও উপস্থিত হয়। কাজে-কাজেই, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের মধ্যে বিনিময়-ব্যবস্থা সমাজের অতি-প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। সভ্যতা, বিশেষত, নগর ও পল্লির বিরোধিতাটা চাঙ্গা করে তুলে প্রচলিত শ্রমবিভাগগুলো বর্ধিত ক'রে এইগুলোর দৃঢ়তা সাধন করে। (প্রাচীনযুগের মত পল্লির উপর নগরের অথবা মধ্যযুগের মত নগরের উপর পল্লির অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার দ্বারা সভ্যতা এই কার্য সম্পন্ন করে।) সভ্যতা শ্রমের তৃতীয় বিভাগেরও সৃষ্টি করে। ইহা সভ্যতার নিজস্ব চিজ্ আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। এই নতুন বিভাগের ফলে এমন এক অপরূপ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যে-শ্রেণীর লোকজন উৎপাদনের ত্রিসীমানার মধ্যে না ঘেঁষে কেবলমাত্র উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর বিনিময়েই নিযুক্ত থাকে। এরা হচ্ছে বণিক বা সওদাগর। এ-পর্যন্ত কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। যারা উৎপাদনে মোতায়েন থাকতো তাদের মধ্যেই দেখা যেত কতকগুলো লোক হুকুম চালায় আর কতকগুলো তা তামিল করে। কেউ-কেউ বড় বড় উৎপাদক আর কেউবা অল্পমাত্রায় মাল উৎপন্ন করে, এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এখানে সর্বপ্রথম এমন এক শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা উৎপাদনে কোনরূপ যোগ দান না ক'রেও সমগ্র উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে আর উৎপাদকদের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব চালায়। যে-কোন দুই উৎপাদক বা ধন-স্রষ্টার মধ্যে লেন-দেনের সহায়ক সেজে উভয়কেই শোষণ করে। উৎপাদকদের বিনিময়ের ঝুঁকি ও কষ্টভোগ হ'তে রেহাই দেওয়া আর তাদের মালপত্র দূর বিদেশের বাজারে বিক্রয় করার প্রলোভন দেখিয়ে জন-সাধারণের মধ্যে তারা নিজেদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণীরূপে জাহির করে। এইভাবে এমন একদল পরগাছার সৃষ্টি হয় যাদেরকে মানব-সমাজের প্রজাপতি বলা সাজে। মেহনত এদের যৎসামান্য। কিন্তু তার প্রতিদানস্বরূপ তারা দেশ-বিদেশের সমস্ত সারভাগ মন্থন করে নিয়ে দ্রুতগতিতে অজস্র ধন-দৌলত ও তার জুড়িদার সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিরও অধিকারী হ'য়ে বসে। এই জন্য, সভ্যতার আমলে তারা ক্রমশ আরো বেশি মান-মর্যাদা এবং তার চেয়ে আরো বেশি উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হ'তে হ'তে শেষপর্যন্ত এই পরের ধনে পোদ্দার মহাশয়েরা তাদের সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব উৎপন্ন সম্পদ—প্রত্যেক কয়েক বছর পর পর ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মহাদুর্যোগ (বাণিজ্য-সংকট) সৃষ্টি করে বসে।

আমাদের আলোচ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে বণিক-বীররা

ভাবতেই পারেনি যে উত্তরকালে তারা পৃথিবীর বুকে কি বিশাল প্রভাব প্রতিপত্তিরই না অধিকারী হবে! কিন্তু বণিকশ্রেণী দানা বাঁধে এবং সমাজের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়; ইহাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। বণিকশ্রেণী সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর মুদ্রাও জগতে আবির্ভূত হয়। যারা ধন উৎপাদনের কোন ধারই ধারে না, টাকশালে তৈরি মুদ্রা তাদের হাতে উৎপাদক ও তাদের উৎপন্ন ধন-সামগ্রী নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নতুন অস্ত্র যোগায়। অন্যান্য সমস্ত পণ্যদ্রব্যকে নিজের মধ্যে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে, সকল ধনের ধন এক আশ্চর্য বস্তু আবিষ্কৃত হয়। অন্তর্নিহিত এক যাদুমন্ত্র বলে এই অদ্ভুত চিজ ইচ্ছা করলেই ঈপ্সিত ও ঈপ্সার-যোগ্য যে-কোন বস্তুতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। যার হাতে এই অপূর্ব বস্তু থাকে, সমগ্র উৎপাদন জগৎ তার মুঠোর মধ্যে। বণিক ছাড়া আর কার হাতে এই চিজ্ অধিকতর পরিমাণে থাকতে পারে? মুদ্রা-পূজা বণিক-মহারাজদের হাতে নিরাপদেই থাকে। দুনিয়াকে সে স্পষ্টরূপেই জানিয়ে দেয় যে, মুদ্রার সাম্‌নে সমস্ত পণ্যদ্রব্য, তথা, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদকদের ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে হবে। সে কার্যত প্রমাণও করে যে, ধন-দৌলতের এই মূর্তিমন্ত অবতারের কাছে অন্য যে-কোন ধরনের ধন-সম্পত্তি অসার ছায়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মুদ্রা তার শৈশব অবস্থায় যে আদিম নৃশংসতা ও নিগ্রহ নিপীড়ন নিয়ে আবির্ভূত হয় তা অর্থাৎ মুদ্রার এই অশুভ শক্তি আর কখনই তেমন প্রকটিত হতে দেখা যায় নি। মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় শুরু হওয়ার পর মুদ্রার সাহায্যে কর্জ ও অগ্রিম দাদন আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুদ ও তেজারতিও আবির্ভূত হয়। প্রাচীন এথেন্স ও প্রাচীন রোম শহরের আইন-কানুন অধমর্ণকে যেরূপ নৃশংসতার সঙ্গে ও অসহায়ভাবে উত্তমর্ণের হাতে সঁপে দেয়, পরবর্তী যে-কোন যুগের আইন-কানুনের পক্ষেই তা সম্ভব হয় নি। এই দুই শহরের এই সব আইন-কানুন নিছক অর্থনৈতিক চাপেই বিধিবদ্ধ হয়।

পণ্যদ্রব্য ও গোলাম, তথা মুদ্রারূপী ধন-দৌলতের পাশাপাশি এই সময় ভূ-সম্পত্তিও আবির্ভূত হয়। গোষ্ঠী বা উপজাতি ব্যক্তিকে এক-একটা ভূমিখণ্ডে যে মালিকানা-স্বত্ব দেয়, তা স্থায়িত্ব লাভ ক'রে ঐ জমি তার পৈত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই সমস্ত জমিজমার উপর গোষ্ঠীর যৌথ দাবি-দাওয়াগুলো ঝেড়ে ফেলে ঐগুলো সম্পর্কে পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের জন্যে ব্যক্তি কতই না চেষ্টা করে। গোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া অসহ্য বাঁধন বলেই মনে হয়। ব্যক্তি এই বাঁধন থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই সে জমি থেকেও মুক্তি লাভ করে।

জমি-জমার উপর পূর্ণ ও স্বাধীন মালিকানার অর্থ কেবলমাত্র উহা অপ্রতিহত ভাবে ও খেয়াল-খুশি মাফিক ভোগ দখল নয়। এর অর্থ জমি-জমা হস্তান্তরের ক্ষমতাও বটে। গোষ্ঠী যতদিন জমির মালিক ছিল, ততদিন এই ধরনের কোন ক্ষমতা বা অধিকারও ছিল না। কিন্তু নতুন ভূসম্পত্তির মালিক যখন গোষ্ঠী ও উপজাতির প্রাগাধিকারের শৃঙ্খল-বন্ধন ছিন্ন করে, তখন এতদিন জমিজমার সঙ্গে তার যে অবিচ্ছেদ্য শক্ত বাঁধন ছিল, তাও টুটে যায়। জমি-জমার ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত মুদ্রা ব্যক্তির নতুন অধিকারের স্বরূপটাও উদ্‌ঘাটিত করে। জমি এখন পণ্যদ্রব্যে পরিণত। জমি বিক্রী করা, তথা, বাঁধা দেওয়া চলে। জমি-জমায় ব্যক্তির মালিকানা-স্বত্ব বর্তাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধকী-প্রথাও উদ্ভূত হয় (এথেন্সের বিবরণী পাঠ করুন)। একনিষ্ঠ বিবাহ-প্রথার পেছনে পেছনে যেভাবে হেতেরে প্রথা ও বেশ্যাবৃত্তি চলতে শুরু করে, ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিকেও তেমনি বন্ধকী-প্রথা ছায়ার মত অনুসরণ করে। হস্তান্তরের অধিকার সহ জমিজমায় পূর্ণ ও স্বাধীন মালিকানা তোমরা প্রার্থনা করেছিলে, তা তোমরা লাভও করেছ!

ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, মুদ্রা, তেজারতি, ভূসম্পত্তি ও বন্ধকী-কারবারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ধন-সম্পত্তি যেমন দ্রুতগতিতে ছোট্ট একটা শ্রেণীর হাতে জমায়েৎ ও কেন্দ্রীভূত হয় তেমনি আর একদিকে জন-সাধারণের দারিদ্র্য ও দরিদ্রের সংখ্যাও বেড়ে চলে। গোড়া থেকেই দেখা যায়, ধন-দৌলতের মালিক নতুন অভিজাত দল ও প্রাচীন উপজাতীয় অভিজাত-সম্প্রদায় ঠিক এক চিজ্ নয়। নতুন অভিজাতরা প্রাচীন অভিজাতদের চিরদিনের জন্যে পশ্চাদ্‌ভূমিতে ঠেলে ফেলে (এথেন্সে, রোমে ও জার্মানদের মধ্যে)। স্বাধীন মানুষদের ধন-সম্পদ অনুসারে এই শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষভাবে গ্রীসদেশে (১) গোলামদের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে যায়। গোলামদের খাটানো হ'তো জোর-জবরদস্তি করে আর তাদের পরিশ্রমেই সমগ্র সমাজ প্রতিপালিত হ'তো।

এই সামাজিক বিপ্লবে গোষ্ঠী-কাঠামোটার অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তা বিচার করে দেখা যাক। নতুন শক্তিগুলোর কাছে গোষ্ঠী-প্রথা নিতান্ত অসহায় হয়ে

১। এথেন্সে গোলামদের সংখ্যা জানবার জন্য—১২৯ পৃঃ দেখুন। সমৃদ্ধির যুগে করিন্থে গোলামদের সংখ্যা ছিল ৪৬০,০০০ জন, ইজিনায় ৪৭০,০০০ জন। উভয়ক্ষেত্রেই গোলামের সংখ্যা স্বাধীন নাগরিকের দশগুণ।—এঙ্গেল্‌স্

পড়ে। গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করেই এইসব শক্তি বেড়ে উঠে। একই এলাকায় এক-মাত্র বাসিন্দারূপে গোষ্ঠীর বা উপজাতির সদস্যগণ সকলে একত্র উক্ত এলাকায় মধ্যেই বাস করবে—ইহাই ছিল সনাতনী ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় রীতি। অনেক আগেই এই অবস্থার অবসান ঘটে। সর্বত্রই গোষ্ঠী ও উপজাতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে পড়ে ; সর্বত্রই নাগরিকদের মধ্যে গোলাম, সংরক্ষিত নর-নারী ও বিদেশীরা বাস করতে থাকে। বর্বরযুগের মধ্যস্তরের শেষাশেষি জীবনযাত্রাপ্রণালীর যে স্থিতাবস্থা ঘটে, ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপ, পেশা বা বৃত্তির পরিবর্তন, জমি-জমা মালিকানা পরিবর্তন এবং অনবরত বাসস্থানের পরিবর্তনের ফলে তা বানচাল হয়ে যায়। গোষ্ঠী-সদস্যরা আর সর্বজনীন কাজকর্মের জন্য একত্রে মিলিত হ'তে সক্ষম নয়। ধর্মীয় উৎসবাদির মত গুরুত্বহীন বিষয়াদির বেলায় ঔদাসীন্যের সঙ্গে কালেভদ্রে তারা একত্রে সমবেত হয়। যে-সমস্ত অভাব-অভিযোগ পূরণ ও স্বার্থরক্ষার খাতিরে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ভূত হয় ও ঐগুলোর সুব্যবস্থা করতে সক্ষম হয় সেইগুলো ছাড়া, ধনোৎপাদনের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ও তজ্জন্য সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে আরো কতকগুলো নতুন নতুন অভাব ও স্বার্থের সৃষ্টি হয়। এইগুলো প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রথার নিকট খাপছাড়া ত বটেই উপরন্তু প্রতি পদক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীর বিপরীত-ধর্মীও বটে। শ্রম-বিভাগের ফলে কারিগরদের মধ্যে নানা দলের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত দলের স্বার্থ এবং পল্লির বিপরীত-ধর্মী শহরের নতুন নতুন অভাব-অভিযোগের ফলে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম করার দরকার হয়। এই সমস্ত দলের প্রত্যেকটি বিভিন্ন গোষ্ঠী, ক্রেত্রী ও উপজাতির লোকজন, এমন-কি, বিদেশীদের নিয়ে গঠিত হয়। কাজেই, গোষ্ঠী-কাঠামোর বাইরে কিন্তু ওর পাশাপাশি, গোষ্ঠী-বিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহ কায়েম করতে হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠী-কাঠামোর ভেতর এই ভাবে স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয়। একই গোষ্ঠী ও একই উপজাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে সম্পর্কে এই সংঘাত চরম অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়া, গোষ্ঠী-বহির্ভূত নতুন লোকজন নিয়েও সমস্যা উপস্থিত হয়। এরা নতুন শক্তিতে পরিণত হয়। সংখ্যায় এরা এত বেশি হ'তে থাকে যে, সমরক্তজ দল বা উপজাতির মধ্যে এদের অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব হয়। রোমের অবস্থা ঠিক এই রকমই দাঁড়িয়েছিল। এই সমস্ত নতুন লোকজনের কাছে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানগুলো নিষিদ্ধ ও বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত সঙ্ঘে পরিণত হয়। আদিম যুগের স্বাভাবিক গণতন্ত্র ঈর্ষ্যা-পরায়ণ অভিজাতমণ্ডলীতে রূপান্তরিত হয়।

তাছাড়া, গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও অসামঞ্জস্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত মানব-সমাজ হ'তেই উদ্ভূত; আর উহা এইরূপ মানব সমাজের উপযোগীও বটে। জনমত ছাড়া নিগ্রহ নিপীড়নের অন্য কোন অস্ত্রই এর তূণে ছিল না। কিন্তু উত্তরকালে এমন এক সমাজের সৃষ্টি হয়, যা জীবনযাত্রার নানাপ্রকার অর্থনৈতিক শক্তির চাপে পড়ে আপনাকে স্বাধীন নাগরিক ও গোলাম-শোষক ধনী ও শোষিত গরিব—এই দুই শ্রেণীতে দ্বিধা-বিভক্ত করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দূরীভূত করা দূরে থাক এই সমাজ ঐগুলোকে আরো বেশি জমাট করে তুলতেই বাধ্য হয়। এইরূপ সমাজের পক্ষে হয় বিভিন্ন শ্রেণীর অবিশ্রান্ত প্রকাশ্য সংগ্রামের ভেতরেই চল্‌তে হ'বে, অন্যথায় তাকে আপাতদৃষ্টিতে যুধ্যমান শ্রেণীগুলোর উর্ধ্বে দণ্ডায়মান এমন এক তৃতীয় শক্তির শাসন মেনে নিতে হ'বে, যে শক্তি তাদের প্রকাশ্য সংগ্রাম দমন করে শ্রেণী-সংগ্রাম, বড় জোর অর্থনীতিক্ষেত্রে, তথাকথিত আইন-সম্মত উপায়ে চল্‌তে দিবে। মোট-কথা, গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানকে জীবনান্ত হ'তে হয়। শ্রমবিভাগ এবং উহার পরিণতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান চূর্ণ হ'য়ে যায়। **রাষ্ট্র** উহার স্থান দখল করে বসে।

* * *

গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস-স্তূপের উপর রাষ্ট্র যে প্রধান ত্রিমূর্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে, খাঁটি প্রাচীন রূপটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এথেন্স শহরে। গোষ্ঠী-শাসিত সমাজে উদ্ভূত শ্রেণী-বিরোধিতার ভেতরেই এখানে রাষ্ট্র জন্মলাভ করে; রোমে অগণিত কর্তব্যের চাপে নিষ্পেষিত কিন্তু অধিকারহীন গোষ্ঠী বহির্ভূত অগণিত প্লেবদের (Plebs) মধ্যে গোষ্ঠী আভিজাত্যের নিরন্ধ্র অচলায়তনে পরিণত হয়। প্লেবদের জয়লাভের ফলে জ্ঞাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গোষ্ঠী-কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আর এ ধ্বংসস্তূপের উপর রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গোষ্ঠীগত অভিজাতশ্রেণী, তথা, প্লেবস্‌, উভয় দলকেই কুক্ষিগত করে। তৃতীয়ত, রোম-সাম্রাজ্য-বিজয়ী জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্র আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়। কারণ, গোষ্ঠী-প্রথা সুবিস্তীর্ণ বৈদেশিক এলাকা-সমূহ শাসনের পক্ষে একেবারে অচল হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই বিজয় লাভের জন্য মূল অধিবাসীদের সঙ্গে তেমন কোন সংঘাতই উপস্থিত হয় নি, উন্নততর ধরনের শ্রম-বিভাগেরও দরকার হয় নি। কারণ, বিজিত এবং বিজেতা উভয়ে প্রায় আর্থিক উন্নতির একই স্তরে অবস্থিত ছিল। কাজেই সমাজের অর্থ-

নৈতিক ভিত্তিটা একই অবস্থাতে রয়ে যায়। এই সমস্ত কারণের জন্য গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানটা মার্ক বা পল্লি-সমবায়-রূপে পরিবর্তিত ও এলাকাগত আকারে বহু শতাব্দী যাবৎ টিকে থাকে। এমন-কি, কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর আকারে পরবর্তী অভিজাত ও পাত্রিশিয়ান পরিবারগুলোর মধ্যে পুনর্জীবিত হ'তেও দেখা যায়। "ডিথ্‌মার্সেথেন্" (১) নামক প্রতিষ্ঠানের মারফতে কিষাণ পরিবারগুলোর মধ্যেও এই পুনর্জীবনের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র নামক শক্তিটা বাইরে থেকে সমাজের উপর প্রযুক্ত হয়নি। অথবা হেগেলের মত অনুসারে "নৈতিক ভাবধারার বাস্তব প্রকাশ" বা "মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধিশক্তির বাস্তবরূপ বা প্রতিবিম্ব" নয়; বরং সমাজের ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ স্তরে ইহা সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়। সমাজ কতকগুলো সমাধানের অতীত আত্ম-বিরোধিতায় জড়ীভূত আর ইহা আপোষ-মীমাংসার অতীত এমন কতকগুলো পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা দূরীভূত করা সমাজের পক্ষে অসম্ভব। সোজাসুজি এই সত্যটা মেনে নেওয়ার ফলেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সমস্ত বিরোধীদল ও পরস্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থযুক্ত শ্রেণীগুলো যাতে নিরর্থক সংগ্রামে মত্ত হয়ে নিজেদের ও সমাজের সর্বনাশ করে না বসে, সেইজন্য এই সংঘাত সংযত করে আইন ও শৃঙ্খলার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। সমাজ থেকেই উদ্ভূত এই নিয়ন্ত্রণ-শক্তিটা সমাজের উপর আপনার স্থান করে নিয়ে ক্রমশ অধিকতর পরিমাণে সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই শক্তি রাষ্ট্র নাম ধারণ করে।

প্রাচীন গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য এই যে ইহা প্রথমত, আপন প্রজাদের এলাকা অনুসারে বিভক্ত করে। আমরা দেখেছি যে, রক্তের বাঁধনের মধ্যে গঠিত ও সংহত প্রাচীন গোষ্ঠী-সঙ্ঘগুলো সমাজের প্রভাব মিটানোর পক্ষে অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয় প্রধানত এই জন্যে যে, সদস্যগণ একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে—গোষ্ঠী-প্রথার এই ছিল দস্তুর; কিন্তু বহু পূর্বেই এই

---

(১) ঐতিহাসিকদের মধ্যে নীবুরই সর্বপ্রথম গোষ্ঠীর ধরণ-ধারণ সম্পর্কে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন। ডিথমার্সেথেন পরিবারগুলোর সঙ্গে পরিচিতি বশতই তিনি এই ধারণা করতে সক্ষম হন। কিন্তু এইগুলোকে খাঁটি গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানরূপে প্রচার করতে গিয়ে তিনি ভুল করেও থাকেন।—এঙ্গেল্‌স্।

দস্তুরের অবলীন হয়। এলাকায় কোন পার্থক্য না ঘট্‌লেও লোকজন হ'য়ে পড়ে গতিশীল। কাজেই, এলাকাগত ভাগাভাগির উপরেই নতুন সমাজ-জীবন আরম্ভ হয়। অধিবাসীরা গোষ্ঠী বা উপজাতির কোনরূপ তোয়াক্কা না রেখেই আপন আপন দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগ করতে থাকে। বাস্তু-ভিটা অনুসারে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাপন সমস্ত রাষ্ট্রের মামুলি ব্যাপার। কাজেই আমাদের কাছে এই বিধি-ব্যবস্থা নিতান্ত স্বাভাবিকই মনে হয়। কিন্তু এথেন্সে ও রোমে রক্তসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করার জন্য এই নতুন বিধি-ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল ধরে যে কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়, তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

সরকারী-বাহিনী বা শক্তি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। সশস্ত্র শক্তি হিসাবে এ আর জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার পর জন-সাধারণের পক্ষে স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়। কাজেই, বিশেষ ধরনের সরকারী বাহিনীর প্রয়োজন হয়। গোলামরাও জন-সাধারণের অন্তর্ভুক্ত। এথেন্সে গোলামদের সংখ্যা ছিল ৩৬৫,০০০; আর স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যা মাত্র ৯০,০০০। কাজেই, নাগরিকরা বিশেষ-সুবিধা-প্রাপ্ত দলে পরিণত হয়। এথেনীয়-গণতন্ত্রের গণ-বাহিনী ছিল গোলামদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভিজাতদের বাহিনী। গোলামদের তারা দাবিয়ে রাখ্‌তো। আবার স্বাধীন নাগরিকদের দাবিয়ে রাখবার জন্য যে বিশেষ পুলিসবাহিনীর দরকার হয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই সরকারী বাহিনী বা শক্তির অস্তিত্ব আছে। ইহা কেবলমাত্র সশস্ত্রবাহিনীতে সীমাবদ্ধ নয়। আরো অনেক-কিছু অপরিহার্য পরিপূরক,—জেলখানা ও নিগ্রহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভুক্ত। গোষ্ঠী-শাসিত সমাজে এই সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তু। যে সমস্ত সমাজের নাগরিকরা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাস করে, আর যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম তেমন দানা বাঁধেনি সেই সমস্ত সমাজে সরকারী শক্তি নগণ্য মাত্র। এক সময়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে অবস্থা এখনো এই রকমই দেখা যায়। রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণী-সংঘাত যতই তীব্রতর আকার ধারণ করতে থাকে আর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো যতই বৃহত্তর ও আরো বেশি জনবহুল হ'তে আরম্ভ করে, সরকারী শক্তির অনুপাতও ততই বেড়ে চলে। আধুনিক ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অবস্থাটা বেশ বোঝা যায়। এখানে শ্রেণী-সংগ্রাম ও দেশজয়ের প্রতিযোগিতা সরকারী শক্তিকে (সামরিক শক্তি) এমন

সু-উচ্চে উন্নীত করে যে, সমগ্র সমাজ, এমন কি, রাষ্ট্র পর্যন্ত এই শক্তির কুক্ষিগত হওয়ার উপক্রম হয়।

এই সরকারী শক্তিকে অব্যাহত রাখ্‌বার জন্যে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিকট থেকে ট্যাক্স বা খাজনার আকারে চাঁদা আদায়ের দরকার। গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সমাজে ইহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত হ'লেও বর্তমানে আমাদের কাছে ইহা সুবিদিত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র খাজনা-ট্যাক্সে তাল-সাম্‌লানো দায় হ'য়ে পড়ে। রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ সমাজের উপরেও চাহিদা চালাতে শিখে। রাষ্ট্র এখন হামেশাই ধার-কর্জের জন্যে চুক্তি করে, সরকারী ঋণ গ্রহণ করে। প্রাচীন ইউরোপ এদিকে দিয়েও সকলের গুরু।

সরকারী শক্তি ও কর ধার্য করার অধিকার বলে সরকারী কর্মচারীরা সমাজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসাবে নিজেদের জাহির ক'রে সমাজের মাথার উপরে উঠে বসে। গোষ্ঠী-নায়কেরা যেরূপ জনগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করে, তা এদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর তা পেলেও এরা তাতে খুশি থাকতে পারে না। সমাজ-অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে ডিক্রি বলে এরা নতুন মান-মর্যাদার অভিলাষী। এই মর্যাদা তাদেরকে লোকচক্ষুর নিকট বিশেষ ধরনের অলঙ্ঘনীয় এবং পবিত্রতার ইজ্জতও দান করে। সভ্যরাষ্ট্রের নিম্নতর পুলিসের লোকেরাও গোষ্ঠী-শাসিত সমাজের সমগ্র কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার তুলনায় অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সর্ব-নিম্ন গোষ্ঠীপতিরাও সমাজের যে অবাধ ও আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করে তা সভ্যতার আমলের প্রবল-প্রতাপান্বিত বাদশাহ্‌, সুমহান রাষ্ট্র ধুরন্ধর ও সমাজপতিদের নিকট বাস্তবিকই ঈর্ষার বস্তু হ'তে পারে। কারণ গোষ্ঠী-নায়ক সমাজের আপনার লোক, আর রাষ্ট্রের কর্মচারীরা বাইরে থেকে আগত উপর-ওয়ালা বিশেষ।

শ্রেণী-সংঘাতকে দাবিয়ে রাখা আর শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতার মধ্যেই-রাষ্ট্রের জন্ম। রাষ্ট্র সেইজন্য সাধারণত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অর্থনীতিক্ষেত্রের শাসক-শ্রেণীর করায়ত্ত। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রভুত্ব স্থাপনের ফলে এরা রাজনৈতিক শাসক-শ্রেণীতেও পরিণত হয়। এইভাবে নিগৃহীত শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখা ও তাদের উপর শোষণ চালাবার নতুন নতুন কৌশলও তাদের আয়ত্ত হয়। গোলামদের পদানত রাখবার জন্য গোলাম-মালিকদের রাষ্ট্ররূপেই প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র রূপ পরিগ্রহ করে। ভূমি-গোলাম ও পরাধীন ছোটখাটো কিষাণদের দাবিয়ে রাখবার জন্য অভিজাতদের ক্রীড়নক হিসেবেই ফিউডল রাষ্ট্র গড়ে উঠে। আধুনিক

যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র তেমনি শ্রমিকদের উপর বণিকদের শোষণ চালাবার যন্ত্রেই পরিণত হয়। তবে সময় সময় খাপছাড়াভাবে এমন অবস্থাও ঘটে, যখন যুধ্যমান শ্রেণী দু'টোর শক্তি প্রায় সমান দাঁড়ায়; ফলে রাষ্ট্রশক্তি মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুধ্যমান শ্রেণী দুটো থেকে অনেকটা নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হ'য়ে পড়ে। খৃস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যথেচ্ছ রাজতন্ত্রের আমলে অবস্থা অনেকটা এই রকমই দাঁড়ায়। রাজারা অভিজাত ও বুর্জোয়াদের পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে রাষ্ট্রের ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রথম, বিশেষত, দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের বোনাপার্ট-শাসনও বুর্জোয়া এবং মজুরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি ক'রে বেশ সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে। এদিক দিয়ে সবচেয়ে হাসির উদ্রেক করে নতুন জার্মান-সাম্রাজ্য ও বিসমার্কানুগ জার্মান জাতি। এখানে ক্ষীয়মান পরগাছা প্রুশিয়ান্ "জুঙ্কার" জমিদারদের ভুঁড়ি মোটা করবার জন্য পুঁজিওয়ালা ও শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কেই শোষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

লক্ষ্য করার মত আরো একটা বিষয় এই যে, ঐতিহাসিক অধিকাংশ রাষ্ট্রে সম্পত্তির ভিত্তিতে মানের ক্রম অনুসারে নাগরিকদের নানা প্রকার অধিকার প্রদত্ত হয়। এতে খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয় যে, সম্পত্তিহীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সম্পত্তিযুক্ত শ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্যই রাষ্ট্র নামধেয় প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভূত হয়েছে। এথেনীয় ও রোমান সম্পত্তিওয়ালা শ্রেণীগুলোর অবস্থা এই রকমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় ফিউডল রাষ্ট্রের অবস্থা একই ধরনের। এখানে জমি-জমার মালিকানার দৌড় অনুসারে রাজনৈতিক অধিকারের মাপ স্থির করা হয়। আধুনিক যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রগুলোতেও ভোটাধিকারের যোগ্যতা একই ধরনে নির্ধারিত হয়। সম্পত্তিগত পার্থক্যের এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি কোন-মতেই আসল বস্তু নয়; পক্ষান্তরে, ইহা রাষ্ট্রের অবনত অবস্থারই পরিচায়ক। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরিণতি গণতান্ত্রিক রিপাবলিক আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্রমশ অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। শ্রমজীবী ও বুর্জোয়াদের শেষ চরম সংগ্রাম এই ধরনের রাষ্ট্রেই ঘট্‌বে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারীভাবে সম্পত্তিগত পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। ধন-সম্পত্তি প্রভাব বিস্তার করে পরোক্ষে; কাজেই, অধিকতর সুনিশ্চিন্তভাবেও বটে। ইহা দুইভাবে পরিণতি লাভ করে: প্রথমত, সোজাসুজি সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়া হয়। আমেরিকা এর জলন্ত ও পুরাতন দৃষ্টান্তরূপেই দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় উপায় প্রযুক্ত

হয় গবর্ণমেণ্ট ও স্টক্-এক্সচেঞ্জের মধ্যে মৈত্রী ও সমঝোতার আকারে। সরকারী দেনার বহর যতই বাড়তে থাকে, যৌথ-কোম্পানীগুলোর হাতে কেবলমাত্র মাল চলাচলের ব্যবস্থা নয়, খোদ ধন উৎপাদন যতই কেন্দ্রীভূত আর স্টকের বাজারে তাদের কেন্দ্র স্থাপিত হ'তে থাকে, ততই এই মৈত্রীর বাঁধন শক্ত হয়ে উঠে। আমেরিকা ছাড়া আধুনিকতম ফরাসী রিপাবলিকেও এই অবস্থার জলন্ত দৃষ্টান্ত মিলে। প্রাচীন সাদাসিধে সুইজারল্যাণ্ডও এ-সম্বন্ধে রীতিমত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। গবর্ণমেণ্ট ও স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে এই সৌভ্রাত্র যে গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের পক্ষে আসল বস্তু নয়, কেবলমাত্র ইংলণ্ডে নয়, নবীন জার্মান সাম্রাজ্যেও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বজনীন ভোটাধিকার এখানে বিসমার্ক্ না ব্লীখ্রোডারকে বেশি উঁচুতে তুলেছে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। মোটের উপর, সর্বজনীন ভোটাধিকারের আওতায় সম্পত্তিওয়ালা শ্রেণীই প্রত্যক্ষ শাসন বিস্তার করে। নিগৃহীত শ্রেণী, আমাদের বেলায় মজুরশ্রেণী, যতদিন আত্ম-মুক্তির যোগ্যতা লাভ না করে ততদিন এদের অধিকাংশই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে একমাত্র সম্ভাব্য ব্যবস্থারূপে মেনে নিয়ে ধনিকশ্রেণীর লেজুড় ও উহার চরম-পন্থী বামপন্থী দলরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চল্‌বে। মজুরদল আত্মমুক্তির জন্য যে পরিমাণে যোগ্যতা লাভ করতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই তারা নিজস্বদল কায়েম করে ধনিকশ্রেণীর পরিবর্তে নিজস্ব প্রতিনিধিদের পক্ষে ভোট দিতে থাক্‌বে। কাজেই সর্বজনীন ভোটাধিকারই শ্রমিকশ্রেণীর যোগ্যতা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি। আধুনিক রাষ্ট্রে এর অতিরিক্ত কিছু হ'বে না, হতেও পারে না। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট। সর্বজনীন ভোটাধিকারের তাপমান-যন্ত্র যে দিন শ্রমিকদের মধ্যে স্ফুটস্ত-সীমায় উপনীত হ'বে, সেদিন শ্রমিক, তথা, ধনিক উভয়েই আপন আপন অবস্থান-স্থল যে কোথায় তা রীতিমত উপলব্ধি করবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র নামক বস্তুটা শাশ্বত বা সনাতনী পদার্থ নয়। রাষ্ট্র-শক্তির ভাব-ধারা হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বহু প্রাচীন সমাজ রাষ্ট্রের সাহায্য না নিয়ে আপন আপন কাজকর্ম নির্বাহ করে। অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দিষ্ট স্তরে যখন সমাজকে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হ'তে হয়, তখন এই শ্রেণীভেদের জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ধন-দৌলত উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে এমন একটা স্তরের নিকটস্থ হ'তে চলেছি, যেখানে এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবেনা'ক মোটেই, উপরন্তু, ধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই

সমস্ত শ্রেণী রীতিমত বাধারও সৃষ্টি করবে। যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে এইগুলোর উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি অবশ্যম্ভাবীরূপে এইগুলোর পতনও ঘটবে। এই সঙ্গে রাষ্ট্রের পতনও অনিবার্য। স্বাধীন ও সাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ধন-উৎপাদনকারীদের সমিতি ও সমঝোতা-সমূহের উপর ভিত্তি ক'রে যে-সমাজ ধন-সম্পদ উৎপাদনের নতুন বিধি-ব্যবস্থা করবে, সেই সমাজ সমগ্র রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে তার যথাযোগ্য স্থানে—প্রত্নতত্ত্বের মিউজিয়ামে, সুতাকাটার চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ালের পাশেই স্থাপন করবে।

* * * *

উপরে যে সমস্ত বিশ্লেষণ করা গেল, তা থেকে দেখা যায় যে, সমাজের ক্রমবিকাশের এমন এক স্তর সভ্যতা নাম ধারণ করে, যেখানে শ্রম-বিভাগ, শ্রমবিভাগের দরুণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় আর এতদুভয়ের সংমিশ্রণ বিষয়ক পণ্য-উৎপাদন চরম পরিণতি লাভ করে ও পূর্ববর্তী সমগ্র সমাজে ঘোরতর বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

সমাজের পূর্ববর্তী অপর সমস্ত স্তরে উৎপাদন ছিল মূলত যৌথ-প্রচেষ্টা। উৎপন্নদ্রব্যসমূহ ছোট-বড় সমস্ত যৌথ সম্প্রদায়ের মধ্যে সরাসরি ভাগ-বাঁটোয়ারার পর ঐ সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হ'তো। এই যৌথ-উৎপাদন ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর ভেতর উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য-সমূহের উপর উৎপাদকদের ষোল আনা প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল। উৎপন্ন-দ্রব্য নিয়ে কি করা হবে না-হবে, তা তারা রীতিমত অবগত ছিল। উৎপন্ন-দ্রব্য তারা নিজেই ব্যবহার করতো, ইহা তাদের হস্তচ্যুত হ'তো না মোটেই। উৎপাদন যতদিন এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল, ততদিন ইহা উৎপাদকদের মাথার উপর চড়ে বসতে পারেনি বা অশরীরী কোন অপরিচিত শক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতেও সক্ষম হয়নি। সভ্যতার আমলে কিন্তু ইহা অবশ্যম্ভাবী ও চিরন্তনী নীতি।

শ্রমবিভাগ কিন্তু আস্তে আস্তে ও বেমালুমভাবে এই পরিণতি লাভ করে। ইহা যৌথ-উৎপাদন ও ভোগ-দখলের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে ব্যক্তিগত-মালিকানা ও ভোগ-দখলের রেওয়াজকে সর্বজনীন রীতিতে উন্নীত করে। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়-প্রথার সৃষ্টি হয়—কেমন ক'রে, তা আমরা ইতিপূর্বেই পরীক্ষা করে দেখেছি। পণ্য উৎপাদন ক্রমশ সর্ব-প্রধান স্থান দখল করে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, অর্থাৎ উৎপাদকদের ভোগ-দখল সম্বন্ধে কোনরূপ তোয়াক্কা না রেখে কেবলমাত্র বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন-দ্রব্যসমূহের

হাত-বদল না ঘটেই পারে না। বিনিময়ের সময় উৎপাদক সোজাসুজি অসহায় হ'য়ে তার পণ্য সমর্পণ করে দেয়। উৎপন্ন-দ্রব্যের যে কি ঘটবে তা তার কাছে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতই থেকে যায়। যখন মুদ্রা আর মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বণিক উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থরূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, তখন বিনিময়ের ধারা হয়ে পড়ে আরো বেশি জটিল, উৎপন্ন-দ্রব্যের শেষ ভাগ্য আরো বেশি অনিশ্চিত। বণিকদের সংখ্যাও অনেক; একজন বণিক যে কি করছে, অপরে তার কোন খোঁজ-খবরই পায় না। পণ্যদ্রব্যগুলোর কেবলমাত্র হাতবদলই ঘটে না, বাজার থেকে বাজারান্তরে ঐগুলো চলাফেরাও করে। উৎপাদকরা তাদের তরফ থেকে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সকল রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়; বণিকরাও তা করায়ত্ত করতে পারে না। উৎপন্ন-দ্রব্য ও উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে দৈবের অধীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু লেনদেন সম্পর্কের ক্ষেত্রে "দৈব" যদি একটা প্রান্ত, তা'হলে তার অপর একটা প্রান্ত হচ্ছে "প্রয়োজন।" প্রকৃতির রাজ্যে দৈবের আধিপত্য আছে বলে মনে হলেও এই দৈবের পেছনে যে, কোন অন্তর্নিহিত প্রয়োজন এবং নিয়ম-কানুন কাজ করে তা আমরা অনেক আগেই প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে হাতে-কলমে দেখিয়েছি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যা সত্য, মানব-সমাজের বেলাতেও তা সত্য বটে। কোন সামাজিক প্রচেষ্টা বা সমাজ-জীবনের কার্য-পরম্পরা মানুষের পক্ষে সজ্ঞানে আনার পক্ষে যতই কঠিন বিবেচিত হয়, এবং ইহা যতই নিছক দৈব-চালিত বলে মনে হয়, তার চেয়েও অনেক বেশি নিশ্চিত-রূপে এই দৈবের নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত নিয়ম-কানুনগুলো প্রাকৃতিক বিধানরূপেই নিজেদের জাহির করে থাকে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন তথা বিনিময় সম্পর্কিত দৈব ঘটনাগুলোও এই ধরনের নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদনকারী ও বিনিময়-কারী ব্যক্তিদের নিকট এই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রকৃতি-বিরোধী এবং প্রথমত প্রায়ই অজ্ঞাত শক্তিরূপে কাজ করলেও রীতিমত মেহনৎ করে অনুসন্ধান-গবেষণা দ্বারা এইগুলোর স্বরূপ নির্ণয় করার প্রয়োজন। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের এই সমস্ত অর্থ নৈতিক আইন-কানুন উৎপাদনের এই নতুন ধারার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সংশোধিত হয়; কিন্তু মোটের উপর সভ্যতার গোটা আমলটা এই সমস্ত নিয়ম-কানুনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে উৎপন্নদ্রব্য উৎপাদকদের উপর মোড়লী করে; বর্তমানে যৌথভাবে উদ্ভাবিত পরিকল্পনার পরিবর্তে অন্ধ নিয়মাবলী দ্বারাই সমাজে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতিসুলভ জোর-জবরদস্তির

মধ্যেই এইগুলো আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যে মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্যোগ বা সংকটের আকারে এইগুলোর চরম অবস্থা প্রকাশ পায়। আমরা উল্লিখিত বিবরণীতে স্পষ্ট দেখতে পাই যে, উৎপাদনের প্রায় শৈশব অবস্থাতেই মানুষের শ্রমশক্তি উৎপাদকদের ভরণ-পোষণের জন্য যেটুকুর প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদনে সক্ষম হয়। উৎপাদন-বাড়তির এই স্তরটা তথা শ্রমবিভাগ ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের রেওয়াজ যে সম-সাময়িক তাও আমরা অবগত হয়েছি। এর প্রায় পরে পরেই, মানুষও যে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হ'তে পারে, মানুষকে গোলামে পরিণত ক'রে মানুষের কার্য-ক্ষমতারও বিনিময় আর তা ইচ্ছামত প্রয়োগ করা যেতে পারে—এই মহান সত্যটা আবিষ্কৃত হয়। মানুষ যেই বিনিময়ের কারবার আরম্ভ করে, অমনি তারা নিজেরাও বিনিময়ের চিজে পরিণত হয়। মানুষ ইচ্ছা করুক আর নাই করুক সক্রিয় বস্তু নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়।

সভ্যতার আমলেই গোলামি পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করে। গোলামির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শোষণকারী ও শোষিত, এই দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সভ্যতার সমগ্র আমলে এই ভাগাভাগি অব্যাহত থাকে। গোলামিই শোষণের প্রথম মূর্তি; এই মূর্তিকে প্রাচীন যুগের বিশেষত্বরূপেই গণ্য করা যেতে পারে। মধ্যযুগে ভূমি-গোলামি দাসত্বের স্থান দখল করে। আধুনিক যুগে পারিশ্রমিক-যুক্ত মজুরি-প্রথা সেই স্থান অধিকার করেছে। সভ্যতার প্রধান তিনটে স্তরে গোলামি পর্যায়ক্রমে এই তিনটি প্রধান মূর্তি ধারণ করে। সেকালে এই গোলামি প্রকাশ্য আর বর্তমান যুগে ছদ্মবেশ ধারণ করলেও গোলামি অব্যাহতই আছে।

সভ্যতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের যে স্তর বা পর্যায় উপস্থিত হয়, অর্থনীতির দিক থেকে তার পার্থক্যের সূচনা হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রবর্তন দ্বারা :—(১) ধাতুজ মুদ্রা, মুদ্রাগত পুঁজি, সুদ ও তেজারতি; (২) উৎপাদনের মধ্যবর্তী দালাল বা মধ্যস্থরূপে ব্যবসাদারের দল; (৩) জমিজমার ব্যক্তিগত-মালিকানা ও বন্ধকী প্রথা; (৪) উৎপাদনের প্রধান উপায় রূপে গোলামের শ্রমশক্তি। সভ্যতার আমলে একনিষ্ঠবিবাহ ও পারিবারিক প্রথাই প্রাধান্য লাভ করে, নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এক-একটা পরিবার সমাজের অর্থনৈতিক কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়। রাষ্ট্রই সভ্য-সমাজের কেন্দ্রীয় বাঁধন। যুগে যুগে ইহা শাসকসম্প্রদায়েরই রাষ্ট্র; পদে পদে ইহা মূলত নিগৃহীত ও শোষিতশ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার যন্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হয়ে আসে। সভ্যতার নিম্নলিখিত রূপের আরো কতকগুলো লক্ষণ আছে, যথা—একদিকে শ্রম-

শক্তির সামাজিক বিভাগটি জিয়িয়ে রাখার জন্য নগর ও পল্লির মধ্যে বিরোধটা অটুট রাখা এবং আর এক দিকে উইল প্রথা প্রবর্তন। এতদ্বারা সম্পত্তির মালিক মৃত্যুর পরেও সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করতে পারে। প্রাচীন গোষ্ঠী-কাঠামোর উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হননকারী এই প্রথা সোলনের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত এথেন্সে অজ্ঞাত ছিল। রোমে অবশ্য খুব গোড়ার দিকেই ইহা প্রবর্তিত হয়। তবে তারিখটা (১) আমাদের জানা নেই। ধর্ম-ভীরু জার্মানরা যাতে গির্জার নিকট আপন সম্পত্তি দান করতে অপারগ না হয়, তজ্জন্য পুরোহিতরা জার্মানদের মধ্যে উইল-প্রথা প্রবর্তন করে।

এই ধরনের গঠন-কাঠামো ভিত্তিমূল রূপ নিয়ে সভ্যতা এমন সব কাণ্ড করে বসে, গোষ্ঠী-শাসিত সমাজের মধ্যে যার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানব মনের জঘন্যতম প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রামগুলোকে উস্কানি দিয়েই সভ্যতা এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অন্যান্য বৃত্তিগুলোকে দাবিয়ে রাখা হয়। প্রথম উষা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নগ্ন ধন-লিপ্সাই সভ্যতার গতিবেগ বা গতিশক্তিতে পরিণত। ধন-দৌলত, আবার ধনদৌলত, আরো ধন-দৌলত নয়, নোংরা অধমাধম একজন মাত্র ব্যক্তির ধন-দৌলত—ইহাই সভ্যতার চরম ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধন করতে গিয়ে, সভ্যতার অদৃষ্টে যদি বিজ্ঞানের ক্রম-বর্ধমান উন্নতি এবং মধ্যে মধ্যে কলাশিল্পের চরম বিকাশ লাভের পুনরাবৃত্তি যদি ঘটে থাকে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে বর্তমান যুগে ধন-সঞ্চয়ের অতিমাত্রায় কৃতিত্ব এ-ছাড়া কখনই ঘটতে পারতো না।

---

(১) জার্মাণ সমাজ-তত্ত্ববিদ্ লাসালের "System of Acquried Rights" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড মোটামুটি রোমানদের উইল-প্রথা নিয়ে লিখিত। লাসালের মতে, রোমের আদিম যুগ থেকে উইলপ্রথা চলে আসে। রোমান ইতিহাসে এমন কোন সময়ই ছিল না যে সময় উইল-প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। পক্ষান্তরে, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রথারূপে প্রাগ্-রোমান যুগেই উইলের সৃষ্টি হয়। লাসাল প্রাচীনপন্থী হেগেলভক্ত দার্শনিক। তিনি রোমানদের সামাজিক লেন-দেন সম্পর্কের উপর ভিত্তি না করে উইল-প্রথার "দার্শনিক ভিত্তি" থেকে রোমান আইনের নিদান আবিষ্কার করেন। কাজেই তাঁর মতবাদটা খাঁটি অনৈতিহাসিক। রোমান উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি হস্তান্তর গৌণ ব্যাপার মাত্র। একই দার্শনিক ভিত্তি থেকে তিনি এই অদ্ভুত মতও প্রকাশ করেন। কাজেই এ-রকম গ্রন্থে রোমান উইল-প্রথা সম্বন্ধে এই ধরনের মতবাদ যে দাঁড় করানো হ'বে তাতে আর আশ্চর্য কি? রোমান আইনবিদ, বিশেষত, আদিযুগের রোমান আইনজ্ঞদের ভ্রান্ত ধারণা লাসালে কেবলমাত্র বিশ্বাসই করেন নি, তিনি তাদেরকেও অতিক্রম করেছেন।—এঙ্গেলস্।

এক শ্রেণী কর্তৃক আরেক শ্রেণীর শোষণের উপরেই সভ্যতার ভিত্তিমূল দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই, এর ক্রমবিকাশ, চিরন্তনী অসামঞ্জস্যের ভেতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। উৎপাদনের একধারা অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চলে নিগৃহীত শ্রেণীর অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশ মানুষের একধাপ পশ্চাদ্গতি। যাতে কারো কারো উপকার হয়, তাই আবার অপর কতকগুলো মানুষের অপকার করে। এক শ্রেণীর নতুন স্বাধীনতার অর্থ অপর এক শ্রেণীর নতুন নিগ্রহ ও দাসত্ব-শৃঙ্খল। এর সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রমাণ পাওয়া যায় যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে। যন্ত্রের প্রভাব আজ সমগ্র জগতে সুবিদিত। বর্বরদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভেদরেখা টানা ছিল দুষ্কর, কিন্তু সভ্যতা একশ্রেণীর তাঁবে বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত অধিকার ও আরেক শ্রেণীকে কেবলমাত্র কর্তব্য সাধনেরই দায়িত্ব প্রদান ক'রে অধিকার ও কর্তব্যের এমনি পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি করেছে যে, নিতান্ত বোকা মানুষও তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

এই অবস্থা কিন্তু কখনই স্বীকার করা যায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে যা মঙ্গলকর, সমগ্র সমাজের পক্ষে তা মঙ্গলজনক, বুর্জোয়া-শ্রেণীই সমাজের প্রাণ স্বরূপ—এই রকমই ধরে নেয়া হয়েছে। এইজন্য সভ্যতা যতই এগিয়ে চলে, ততই এর সঙ্গে সঙ্গে যে সব অমঙ্গলের সৃষ্টি হয় তা প্রেম ও বদান্যতার ছদ্ম আবরণে ঢেকে ফেলতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ অমঙ্গলগুলোকে হয় অস্বীকার করে, অথবা মিথ্যা অজুহাতের সৃষ্টি করে। এক কথায়, সভ্যতা এমন কপটাচারের সৃষ্টি করে যে, প্রাচীন সমাজে এমনকি, সভ্যতার প্রথম স্তরেও তা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। এই কপটাচরণ চরমে পৌঁছে সভ্যতার নিম্নরূপ বাণীর ভেতরে: শোষকশ্রেণী কেবলমাত্র শোষিতদের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশেই নিগৃহীত শ্রেণীকে শোষণ করে। নিগৃহীত শ্রেণী যদি তা বুঝতে না পারে বা বিদ্রোহী হয়ে উঠে, তা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শোষকদের কাছে ঘৃণ্যতম কৃতঘ্নতা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? (১)

---

(১) মর্গ্যান্ ও আমার নিজের ছাড়া ফুরিয়ের লেখার নানাস্থানে সভ্যতার যে জ্বলন্ত সমালোচনা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলো সন্নিবেশিত করারও ইচ্ছা ছিল। সময়াভাব বশত তা করা সম্ভব হ'ল না। মাত্র এইটুকু বলতে চাই যে, ফুরিয়ের একনিষ্ঠ বিয়ে ও ভূ-সম্পত্তিকে সভ্যতার লক্ষণ বলেছেন। সভ্যতাকে ইনি গরিবদের বিরুদ্ধে ধনিকদের সংগ্রাম বলেও উল্লেখ করেছেন। বিরোধেভরা অসম্পূর্ণ সমস্ত সমাজে এক একটা পরিবারই আর্থিক কেন্দ্ররূপে গণ্য—এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটাও যে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর গ্রন্থে আমরা তারই রীতিমত পরিচয় পাই—এঙ্গেলস্।

সভ্যতা সম্পর্কে মর্গ্যান্ যে রায় দিয়েছেন তা উল্লেখ ক'রে আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করতে চাই। মর্গ্যান বলেন :—"সভ্যতার আবির্ভাবের পর থেকে সম্পত্তির বৃদ্ধি এতদূর বিরাট আকার ধারণ করে আর এর প্রকারভেদ এতদূর নানামুখী, ব্যবহার এত দূরপ্রসারী এবং মালিকদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে ইহা এতদূর বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে পরিচালিত হয় যে **জনসাধারণ এর চাপে অভিভূত হয়ে পড়ে। মানুষের মন তার নিজের সৃষ্ট পদার্থের কাছে হতভম্ব হয়ে যায়!** তা-সত্ত্বেও এমন সময় আসবে যখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ধন-সম্পত্তিকে স্ববশে আনতে সক্ষম হয়ে সম্পত্তি ও সম্পত্তি-রক্ষাকারী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়, তথা মালিকদের দায়িত্ব ও তাদের অধিকারের সীমারেখা নির্ধারণে সক্ষম হবে। সামাজিক স্বার্থের স্থান ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বেই অবস্থিত ; দুটোর মধ্যে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও সমাঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'বে। সম্পত্তি ভোগের জীবন-লীলাই মানবজীবনের সারকথা নয়। প্রগতিকে যদি অতীতের মত ভবিষ্যতেরও নিয়ম কানুনরূপে গণ্য করতে হয়, তাহ'লে ইহা স্বীকার করতে হবেই। সভ্যতার আবির্ভাবের পর যে সময় অতীত হয়েছে, তা মানব-সমাজের অতীত জীবনের অতীত শতাব্দীগুলোর সামান্য অংশ মাত্র। ইহা ভাবী যুগেরও সামান্য এক অংশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তাতে সম্পত্তি-ভোগমূলক জীবন-লীলার অবসানেরই সূচনা দেখা যায় ; কারণ এইরূপ জীবন-ধর্মের মধ্যে আত্মহত্যার' ধারাসমূহই লুকিয়ে রয়েছে। শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, সমাজে ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে ভোগের সম অধিকার, সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদিতে সমাজের পরবর্তী উচ্চতর স্তরেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞা আজ এইদিকে দৃঢ় পাদবিক্ষেপেই অগ্রসর হয়েছে। **প্রাচীন যুগের গোষ্ঠীসুলভ স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব তখন উন্নততর আকারেই দেখা যাবে।"**

পরিশিষ্ট

হালে আবিষ্কৃত দলগত-বিয়ের নতুন দৃষ্টান্ত (১)—এফ্. এঙ্গেল্‌স্ প্রণীত

সম্প্রতি দলগত বিয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কয়েক শ্রেণী, তথাকথিত যুক্তিবাদী জাতিতত্ত্ববিদের ফ্যেন দস্তরে পরিণত হয়েছে। সেইজন্ত নিম্নলিখিত বিবরণীটি বেশ কাজে লাগতে পারে। বিবরণীটি বেরিয়েছিল মস্কোর "রুস্‌কিজা ভেডোমস্তি" পত্রিকায় ১৮৯২ সনের ১৪ই অক্টোবর (পুরাতন পর্যায়—old style) সংখ্যায়। আমি বিবরণীটির অনুবাদ দিলাম।

হাওয়াইয়ান সমাজের পুনালুয়া বিবাহ সর্বাপেক্ষা বিকাশপ্রাপ্ত প্রাচীন দলগত বিয়ের দৃষ্টান্তরূপেই গণ্য। কেবলমাত্র দলগত বিয়ে অর্থাৎ কতকগুলো পুরুষ ও কতকগুলো নারীর পারস্পরিক যৌন-সম্ভোগের অধিকারমাত্র নয়; হাওয়াইয়ান সমাজে প্রচলিত পুনালুয়া বিয়ের জুড়িদার দলগত বিবাহ-প্রথাই এখানে চোখে পড়ে। পুনালুয়া পরিবারের দস্তর এই যে, কয়েকজন ভাই (সহোদর ও জ্ঞাতিভ্রাতা) কয়েকজন এক মাতৃগর্ভজাত বোন ও তাদের জ্ঞাতিবোনদের বিয়ে করে। কিন্তু সাথালিন দ্বীপে আমরা দেখি যে-কোন পুরুষ তার সমস্ত ভ্রাতৃবধূ ও তার স্ত্রীর সমস্ত বোনদের সঙ্গেও পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। নারীর তরফ থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পূর্বোক্ত বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী স্বামীর সমস্ত ভাই আর তার বোনদের স্বামীদের সঙ্গেও যথেচ্ছ সহবাসসুখ অনুভব করতে পারে। কাজেই পুরাদস্তুর পুনালুয়া বিয়ের সঙ্গে এর এইমাত্র পার্থক্য যে, স্বামীর ভাইরা আর বোনদের স্বামীরা একই ব্যক্তিবর্গ নয়।

চতুর্থ সংস্করণ"পরিবারের উৎপত্তি" গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় আমি বলেছি: বেশ্যালয়ের ভুক্তে-পাওয়া রুচিবাগীশরা যেরূপ কল্পনা করে, দলগত বিয়ে আসলে তেমন বস্তু নয়। দলগত বিয়ের স্বামী ও স্ত্রী প্রকাশ্যেই গুপ্তপিরিতি-সুলভ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে না। অন্ততপক্ষে, যে-সমস্ত ক্ষেত্রে দলগত বিয়ের রেওয়াজ এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অসংযত জোড় বিয়ে বা বহু-পত্নিত্ব-প্রথা থেকে বাস্তবিক পক্ষে দলগত বিয়ের এই পার্থক্য দেখা যায় যে, প্রচলিত রীতি-

(১) ১৮৯২ সনে "ডাই নিউয়ে জেইট্" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড ৭৭৩-৫ পৃ;)।

নীতি অনুসারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যৌন-সংসর্গ চলতে পারে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে নরনারীর উভয়কেই কঠোর শাস্তিভোগ করতে হয়। লক্ষ্য করার মত আরও একটি বিষয় এই যে, দলগত বিয়ের অধিকারগুলো ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই ধরণের বিয়ে বিলুপ্ত হ'তে বাধ্য। এইরূপ বিয়ে যে কম ঘটছে তা-থেকেও একই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত বিবরণী দ্বারা 'পরিবারের উৎপত্তি' গ্রন্থে প্রচারিত আমার মতবাদটা যে নির্ভুল আলোচ্য প্রবন্ধে তার আর এক দফা প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমগ্র বিবরণীটি আর এক দিক থেকেও বিশেষরূপে প্রণিধানের যোগ্য। বিকাশ বা প্রগতিধারায় একই প্রকার স্তরে অবস্থিত আদিম জাতি-গুলোর সামাজিক প্রথাগুলির প্রধান লক্ষণ বা বিশেষত্বের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য, এমন কি, হুবহু একই ধরণের প্রথা দেখা যায়। এই বিবরণীতে এই সত্যটারও বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাখালীন দ্বীপবাসী এই সমস্ত মোঙ্গল জাতীয়দের যে সমস্ত রীতি-নীতি এই বিবরণী পাঠে জানতে পারা যায়, ভারতবর্ষের দ্রাবিড় জাতীয় উপজাতিদের মধ্যে, প্রথম আবিষ্কারের সময় দক্ষিণসাগরীয় দ্বীপবাসীদের মধ্যে এবং আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদের ভেতরেও সেইরূপ রীতিনীতির পরিচয় মিলে। রিপোর্ট বা বিবরণীটা নিম্নরূপ ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে :

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বান্ধব-সমিতির (The Society of the Friends of Natural Science) নৃতত্ত্ব-বিষয়ক শাখার ১০ই অক্টোবর তারিখের (প্রাচীন পর্যায়, নবপর্যায়ের ২২শে অক্টোঃ) অধিবেশনে এন.এ. জান্টসচুক গিলিয়াকদের সম্পর্কে মিঃ স্টার্নবার্গ কর্তৃক লিখিত একখানা গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাঠ করেন। কৃষ্টি স্তরের অ-সভ্য অবস্থায় অবস্থিত সাখালীন দ্বীপের এই উপজাতি সম্পর্কে কেউই বড় একটা খোঁজ খবর রাখেন না। কৃষিকাজ বা মৃন্ময়পাত্র তৈরি গিলিয়াকদের নিকট অজ্ঞাত। মাছ ও শিকার-লব্ধ প্রাণী এদের একমাত্র আহার্য-দ্রব্য। কাঠের পাত্রে তপ্ত পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ ক'রে এরা জল গরম করে। এদের পরিবার ও গোষ্ঠীসংক্রান্ত ধরণ-ধারণগুলো সবচেয়ে চমকপ্রদ। গিলিয়াক কেবলমাত্র তার জন্মদাতাকে বাবা ব'লে ডাকে না; পিতার ভাইদেরকেও সে পিতৃ সম্বোধন করে। এই সমস্ত ভাইদের স্ত্রী ও মায়ের বোনদেরও সে মা বলে ডাকে। এই "সমস্ত বাপ" ও "মায়েদের" ছেলেমেয়েদেরকেও সে ভাই-বোন সম্বোধনে অভ্যস্ত। এই ধরনের সম্বোধন প্রথা যে উত্তর-আমেরিকার ইরোকোয়া ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে, তথা ভারতের কতকগুলি উপজাতির মধ্যে প্রচলিত

আছে তা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। তবে উত্তর-আমেরিকা ও ভারতবর্ষে বহুদিন আগেই এই রীতির পরিবর্তন ঘটলেও গিলিয়াকদের মধ্যে ইহা বাস্তব অবস্থার পরিচায়ক। বর্তমানেও প্রত্যেক গিলিয়াক ভ্রাতৃবধূদের উপর ও শ্যালিকাদের উপর স্বামিত্ব ফলাবার অধিকারী। অন্ততপক্ষে এইরূপ অধিকার ফলানো দোষাবহ নয় মোটেই। গোষ্ঠীপ্রথার ভিত্তিতে দলগত বিয়ের এই রেওয়াজ সুপরিচিত পুনালুয়া বিবাহ-প্রথাই স্মৃতিপথে টেনে আনে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধেও স্যাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সমগ্র গিলিয়াক সমাজ ও তাদের গোষ্ঠী-কাঠামোটা এই ধরনের পরিবার ও গোষ্ঠী-সম্পর্কের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

ঘনিষ্ঠতর বা দূর সম্পর্কের, খাঁটি বা নামমাত্র বাপের ভ্রাতৃবর্গ, তাদের পিতৃ-মাতৃবর্গ, ভাইদের ছেলেমেয়ের দল, নিজের ছেলে মেয়ে—এই সমস্ত নিয়ে গিলিয়াকদের গোষ্ঠী সংগঠিত। বহুসংখ্যক লোকজন নিয়ে যে গোষ্ঠী গঠিত, এ-থেকে তা বেশ বোঝা যায়। গোষ্ঠীর জীবন যাত্রা নির্বাহ হয় নিম্নলিখিত নিয়ম কানুনগুলো পালন ক'রে : গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে সাদী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কোন গিলিয়াক মৃত্যুমুখে পতিত হলে গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকৃত বা নামমাত্র সম্পর্কযুক্ত একজন ভাই তার স্ত্রীকে গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তির পোষ্যদের মধ্যে যারা কাজের অনুপযুক্ত গোষ্ঠী তাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করে। লেখককে একজন গিলিয়াক বলে, "আমাদের মধ্যে গরিব কেউই নাই ; গোটা গোষ্ঠী অভাবগ্রস্ত লোকের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে।" সর্বজনীন পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞ ও উৎসব, সর্বজনীন সমাধিস্থান ইত্যাদিও গোষ্ঠীর সংহতি ও ঐক্যবিধানে সহায়তা করে।

"গোষ্ঠী-বহির্ভূত লোকজনের আক্রমণ থেকে সদস্যদের রক্ষা ও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও গোষ্ঠীর ধান্ধা বা কর্তব্য কার্যে পরিণত। প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় রক্তপাত ক'রে। তবে রুশ শাসনের আমলে এই প্রথা অনেকাংশে হ্রাস পায়। নারীকে গোষ্ঠীর রক্তগত প্রতিহিংসা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া হয়। একটি গোষ্ঠীতে ভিন্ গোষ্ঠীর লোককে পোষ্যরূপে গ্রহণ কদাচিৎ ঘটতে দেখা যায়। মৃতব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তি গোষ্ঠীর বেষ্টনীর মধ্যেই আটকিয়ে রাখা রীতিমত দস্তুরে পরিণত। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত দ্বাদশ নীতির বিধানই গিলিয়াকদের মধ্যে প্রচলিত, যথা Si suos heredes non habet, gentiles familiam habento—অর্থাৎ, যদি নিজের উত্তরাধিকারী না থাকে

গোষ্ঠী-সদস্যরাই ভোগদখল করবে। মোটের উপর, গোষ্ঠীতে যোগদান ছাড়া গিলিয়াকের জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘট্‌তে পারে না।

"খুব বেশি দিনের কথা নয়, দুই এক পুরুষ আগেও গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সদস্য উপজাতীয় সর্দার বা গোষ্ঠীর স্টারোস্টা (Starosta) রূপে গণ্য হ'ত। বর্তমানে গোষ্ঠীনায়কের অধিকার কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসবাদির কর্তৃত্বেই সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠীগুলো বর্তমানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যেপে বসবাস করে। দূর-দূরান্তরে বাস করা সত্ত্বেও গোষ্ঠী-সদস্যরা পরস্পরকে মনে রাখে। পরস্পরকে আতিথ্য দ্বারা আপ্যায়িত করে, পরস্পরকে সাহায্য করে, রক্ষা করে ইত্যাদি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গিলিয়াক কখনও গোষ্ঠী সদস্যদের বা গোষ্ঠীর সমাধি-ক্ষেত্র ত্যাগ করেনা। গোষ্ঠী-শাসিত সমাজ গিলিয়াকদের চিন্তাধারা, তাদের চরিত্র, তাদের রীতিনীতি, আচার ইত্যাদির উপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে। সমস্ত বিষয়ে একত্রে আলোচনার অভ্যাস, গোষ্ঠীসদস্যদের সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধানে সকল সময়েই সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজন ও রক্ত-প্রতিশোধের সংহতি, বড়বড় ইয়ুর্তে (Yurtus) নিজের মত দশ বা ততোধিক লোকের একত্রে বসবাস, অল্পকথায়, সকল সময়েই অপর লোকজনের সহিত অবস্থান—এই সমস্ত গিলিয়াককে সামাজিক ও দিলখোলা মানুষে পরিণত করে। গিলিয়াক জাতি অনন্যসাধারণ অতিথি-বৎসল। অতিথির অভ্যর্থনা ও নিজে আতিথ্য স্বীকার করা তাহার প্রিয় ব্যসনে পরিণত। দুঃখ-দুর্দশার সময়ে এই প্রশংসনীয় আতিথ্য-পরায়ণতা খুব বেশি মাত্রায় আত্ম-প্রকাশ করে। অন্নকষ্টের বছরে গিলিয়াকের যখন নিজের আর তার কুকুরগুলোর পেট ভরাবার কোন উপায় থাকেনা, তখন সে ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত না ক'রে আস্থাপূর্ণ হৃদয়েই অপরের দ্বারস্থ হয়। বস্তুত, প্রায়ই সে অনেকদিন ধরে পরের বাড়িতে আস্তানা গেড়ে আরামে দিন যাপন করে।

"সাখালিন-বাসী গিলিয়াকদের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের আশায় কোনরকম অপরাধজনক কাজ আদৌ ঘট্‌তে দেখা যায় না। গিলিয়াক যে ভাঁড়ার ঘরে মূল্যবান জিনিসপত্র রাখে, তাতে কখনও তালা-চাবি লাগায় না। তার লজ্জাবোধ এত বেশি যে, কোন অপযশকর কাজের জন্য দণ্ডিত হ'লে সে সঙ্গে সঙ্গে বনের মধ্যে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। খুন ঘটেনা বললেই চলে। যদিও কেউ খুন করে তা রাগের মাথায়, টাকাকড়ির লোভে

মানুষ খুন করা গিলিয়াকের স্বভাব-বিরুদ্ধ। অন্য লোকের সহিত আচার ব্যবহারে গিলিয়াককে সাধু, বিশ্বাসযোগ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধিযুক্ত দেখা যায়।

"মাঞ্চুরিয়ানদের শাসনাধীনে দীর্ঘ সময় যাপন, আর বর্তমানে চীনা ব'নে যাওয়া এবং আমুর জেলার উপনিবেশের অপরাধ-মূলক আবহাওয়ার প্রভাব সত্ত্বেও গিলিয়াকদের নৈতিক চরিত্রের মধ্যে আদিম জাতিসুলভ বহু গুণ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দুর্দৈব এসে সমাজকে গ্রাস করবার জন্যে হা করে বসে আছে তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই দেখা যায় না। দুই-এক পুরুষ অতীত হ'লেই মূল মহাদেশস্থ গিলিয়াকরা পুরাপুরি রুশিয়ান ব'নে যাবে। রুশদের কৃষ্টি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দোষ ত্রুটিগুলোও গিলিয়াকদের মধ্যে সংক্রমিত হ'বে। রুশ উপনিবেশের কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে অবস্থানের জন্য সাখালিনবাসী গিলিয়াক কিছু অধিকতর সময় যাবৎ তাদের জাতীয় বৈশিষ্টগুলো অনাবিল অবস্থায় রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু এদের মধ্যেও রুশ প্রতিবাসীদের প্রতাপ বেশ মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে। গিলিয়াকরা গাঁয়ে গাঁয়ে ব্যবসা করতে আসে; কাজের অন্বেষণে তারা নিকোলেভ্‌স্ক শহরে যায়। রুশ মজুররা শহর থেকে বাড়ি ফিরবার সময় যে সব শহুরে আবহাওয়া নিয়ে হাজির হয়, গিলিয়াক শ্রমিকরাও তেমনি ধারা প্রভাব ও আবহাওয়া নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। আর শহরে কাজ করার ফলে আর্থিক বরাতও ফিরে যায় আর তার পরিবর্তন ও ঘটে। এতে, আদিম জাতি-সুলভ সাম্য অবস্থাতে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত জাতির সাদাসিদে ও অকপট আর্থিক জীবনের বিশেষত্বও এইভাবে লোপ পেতে বসেছে।"

"Ethnographical Review পত্রিকায় মিঃ স্টার্ণবার্গের প্রবন্ধটা পুরাপুরি প্রকাশিত হয়েছে। এতে গিলিয়াকদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও বিচার-প্রণালীর বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে।"

সমাপ্ত

ফুটনোট : ……বংশ রক্ষা প্রণালী দ্বারাও ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়। (পৃঃ /০-৶০)

বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের উপায়সমূহ উৎপাদনকে সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রম-বিকাশের অপরিহার্য কারণরূপে উল্লেখ করে এঙ্গেলস এখানে ভুল করে বসেছেন। এঙ্গেলস তাঁর মূল গ্রন্থে নিজেই বাস্তব নজিরের বিশ্লেষণ করে ঘোষণা করেছেন যে, বাস্তব জিনিসপত্রের উৎপাদন-প্রণালীই সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রম-বিকাশের প্রধান উপকরণ বা হাল-হাতিয়ারে পরিণত। —সম্পাদক

নির্ঘণ্ট পত্র

ইংরেজী পারিভাষিক শব্দগুলোর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

Savagery—অ-সভ্য অবস্থা
Barbarism—বর্বর যুগ, বর্বরতা
Civilisation—সভ্যতা
Pastoral—পশুপালক
Cultural stage—কৃষ্টিস্তর
Art—কলাবিদ্যা
Pairing family—জোড় পরিবার
Cousin—সম্পর্কের ভাইবোন
Race—রক্তগত জাতি
Polyandry—বহুস্বামিত্ব
Tribe—উপজাতি
Group-marriage—দলগত বিবাহ
Promiscuity—অবাধ যৌন-সঙ্গম,
Incest—নিষিদ্ধ যোনি-সংসর্গ, অগম্যাগমন
Philistine—নীতি-বাগীশ,
Consanguinity—জ্ঞাতিত্ব-প্রথা
Gens, Gentes—গোষ্ঠী
Monogamy—এক-পত্নি মূলক বিবাহ, একনিষ্ঠবিবাহ, একবিবাহ
Polygamy—বহুপত্নিত্বপ্রথা, বহুবিবাহ
Anthropoid—মানবাকৃতি জীব
Communistic-যৌথ, আদিম-সাম্যবাদী
Marriage group—বিবাহ দল
Mother-right—জননী-বিধি
System of Consanguinity—সগোত্র সম্পর্ক
Matriarchal gens—মাতৃগত গোষ্ঠী
Ties of love—যৌন সম্পর্কযুক্ত দল বা শ্রেণী

Peoples—জাত
Blood-relative—সগোত্র
Molecule—জীবাণুকেন্দ্র
Patriarch—গৃহস্বামী
Male line of descent / Father-right } জনক-বিধি
Patriarchal—পুরুষ-শাসিত
Serf—ভূমি গোলাম
Heroic age—পৌরাণিক যুগ, বীরযুগ
Stallion—জননাশ্ব
Chivalry—বীরত্ব-প্রথা
Bourgeoisie—বুর্জোয়াশ্রেণী
Proletariat—শ্রমজীবী শ্রেণী
Monogamous—একপত্নিত্বমূলক
Endogamous—অন্তর্বিবাহী, সগোত্র বিবাহী
Endogamy—অন্তর্বিবাহ,
Phratry—ভ্রাতৃমণ্ডলী
Polytheism—বহুদেবত্ব
Nation—জাতি
Gentile constitution—গোষ্ঠীজীবন
People—জাতি
Lineage—বংশতালিকা
Confederacy—উপজাতি সমবায়
Kinship group—রক্তগত দল
Hero—মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
Unit—জীবনকেন্দ্র
Patriarchal family—পিতৃপুরুষ শাসিত পরিবার
Sex love—যৌন প্রেম